RB
B
378.0052
ZAS
C.2

শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল

X 3510
Photo Copy
Dhaka University Library

জিনাত জামান
এম, এ (ডবল), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
বি-এড, ঢাকা।
ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন, ইউ এস এ
ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন, লন্ডন
সহযোগী অধ্যাপিকা, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Library
X3510

শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল
জিনাত জামান প্রণীত

প্রথম প্রকাশ ঃ
বৈশাখ, ১৩৯৪
এপ্রিল, ১৯৮৭
প্রকাশক ঃ
আমিরুজ্জামান খান
৬৪, খাজে দেওয়ান,
ঢাকা।

গ্রন্থকার কর্তৃক
সর্বসত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণে ঃ
শিল্পতরু
১৫, ঢাকেশ্বরী গভঃ মার্কেট,
ঢাকেশ্বরী রোড,
ঢাকা।

প্রচ্ছদ ও অন্যান্য অলংকরণ ঃ
এডমুভ লিমিটেড
ডিআইটি এনেক্স বিল্ডিং (৩য় তলা)
[illegible]
[illegible]

X 3510
Photo Copy
Dhaka University Library

Shikhkha Gobeshana Padhati O koushal
(METHODS AND TECHNIQUES OF EDUCATIONAL RESEARCH)
by : Zinat Zaman.
First Edition :
Baishakh 1394
[illegible]
[illegible] only.

DHAKA METROPOLITON TEACHERS TRAINING COLLEGE
DATE.........

উৎসর্গ ঃ
জান্নাতবাসী
পিতা সুলতান আহমেদ
ও মাতা বেগম সায়েরা খাতুন-এর
স্মৃতির উদ্দেশে

X 3510
Photo Copy
Dhaka University Library

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি ও কলা কৌশল বিষয়ে বাংলা পাঠ্য পুস্তকের অভাব এবং এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এই পুস্তক রচনায় উৎসাহিত হই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে এই বিষয়টির উপর এম, এড পর্যায়ে দীর্ঘদিনের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা এই পুস্তক রচনার উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া লিটল এনজেলস্ স্কুল, আজিমপুর এবং মনোয়ারা কিন্ডার গার্টেন স্কুল, (বর্তমানে মনোয়ারা শিশুবাগ) কাকরাইল এই দুইটি স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলাম কি প্রকারে স্কুলের নানাবিধ সমস্যার সমাধান ও সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করা যায়। এই পর্যায়ের অভিজ্ঞতা এবং বদরুন্নেছা গভর্ণমেন্ট গার্লস্ কলেজের (বকশি বাজার) প্রভাষক হিসাবে অনুধাবন করি যে, শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণা প্রয়োগ করে শিক্ষার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভবপর।

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে গবেষণা পদ্ধতি ও কলা কৌশল একটি আবশ্যিক বিষয়। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এই বিষয়টির গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শিক্ষার এই স্তরে প্রায় সব বিষয়ে গবেষণা করা সম্প্রতিকালে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত হয়েছে। প্রতি শিক্ষাবর্ষে খন্ডকালীন এম, এড সহ প্রায় সাতটি ব্যাচকে এই বিষয়ে শিক্ষাদান করতে গিয়ে উপলব্ধি করি যে, শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষার পাঠ্য পুস্তকের অভাব সংক্রান্ত নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হয়। প্রধানতঃ ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজী ভাষায় বিদেশী গ্রন্থের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। ফলে স্বল্পমেয়াদী একটিমাত্র টার্মে এই ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইপ্সিত জ্ঞান অর্জন করা সহজ সাধ্য নয়। বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের পক্ষে শুধুমাত্র ইংরেজী ভাষায় লিখিত পুস্তকের উপর নির্ভরশীল হয়ে জ্ঞানার্জন করা একটি কঠিন কাজ বলে মনে হয়। ১৯৮৪ সালে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে খন্ডকালীন সান্ধ্যকোর্স চালু হবার পর বাংলা ভাষায় এই বিষয়ের উপর লিখিত পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা [illegible] করি। এই বিষয়টির প্রতি শিক্ষার্থীদের [illegible] এবং বাংলা ভাষায় এই বিষয়টির উপর পুস্তক রচনা করার জন্য তাদের গভীর অনুরোধ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। শিক্ষার্থীদের চাহিদা মিটানো এবং বাংলা ভাষায় লিখিত পাঠ্য পুস্তকের অভাব দূরীকরণের লক্ষ্যে এই পুস্তক রচনায় সচেষ্ট হই।

পুস্তকটি এম, ফিল, এম, এড, বি, এড পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে। প্রয়োজন বোধে দূর শিক্ষণে বি-এড এর ছাত্রছাত্রীদের জন্যও এই পুস্তক সহায়ক হবে। এতে শিক্ষা গবেষণার প্রকার, বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন পদ্ধতি, নকশা, তথ্য সংগ্রাহক উপকরণ, নমুনায়ন পদ্ধতি, পরিসংখ্যান এবং থিসিস লেখার পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। একটি গবেষণা কার্য সূচারুরূপে পরিচালনা করার জন্য গবেষণা পদ্ধতির বিভিন্ন দিক, বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের প্রয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদি যে সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন, সেসবই এই পুস্তকে সংযোজন করার চেষ্টা করা হয়েছে। কাজেই আশা করা যায় শিক্ষা গবেষণা ছাড়া অন্যান্য বিভাগের বিভিন্ন ধরনের গবেষণার ক্ষেত্রেও এই পুস্তকটি সহায়ক হবে।

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষা গবেষণা বিভাগে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করার পর পুরো একটি টার্ম শ্রদ্ধেয় বিভাগীয় প্রধান প্রফেসার মজহারুল হকের এম, এড ক্লাশে এই বিষয়ে শিক্ষাদান কালে তাঁর প্রতিটি ক্লাশে উপস্থিত থেকে এই বিষয়ে এই স্তরের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় পাঠ্যসূচী এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করি, যা পরবর্তীকালে এই পুস্তক রচনায় অত্যন্ত সহায়ক হয়। এজন্য আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। আমার সহকর্মীদের উৎসাহ, প্রেরণাও আমাকে সদাসর্বদা উৎসাহিত করেছে। পরিসংখ্যানবিদ অজিত কান্তি ভট্টাচার্য্য পরিসংখ্যান বিষয়ে যে সহায়তা দান করেছেন সেজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা নবীন গবেষকদের গবেষণা কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে আশা করি। পরিশেষে, যাদের জন্য পুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হলে আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও শ্রম সার্থক হয়েছে বলে আশা করব।

গ্রন্থকার

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় সূচী

বিষয়— পৃষ্ঠা

১. প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা ১—৭

ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি/বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি/পরীক্ষণমূলক গবেষণা পদ্ধতি।

২. দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ গবেষণার পটভূমি ৮—২৪

শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণার ভূমিকা/বাংলাদেশে শিক্ষা গবেষণার প্রয়োজনীয়তা।

৩. তৃতীয় অধ্যায় ঃ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ২৫—৫৫

শিক্ষা গবেষণার আধুনিক ধারা/গবেষণার প্রকৃতি ও লক্ষ্য/বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও গবেষণার সম্পর্ক/সামাজিক অগ্রগতি ও গবেষণা/সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা/গবেষণার আনুষ্ঠানিক প্রকার ভেদ/গবেষণার বৈশিষ্ট্য/অনুমিত সিদ্ধান্ত/অনুমিত সিদ্ধান্তের পরীক্ষা/তাৎপর্য পরিমাপক দন্ড/তথ্য/তথ্য সঞ্চালন শৃঙ্খল/সার্বিকীকরন/তত্ত্বের ভূমিকা/শিক্ষা গবেষণার প্রকার ভেদ।

৪. চতুর্থ অধ্যায় ঃ গবেষণার সমস্যা চিহ্নিত করণঃ ৫৬—৭০

প্রথম গবেষণা পরিকল্পনা/বিষয়বস্তু নির্বাচনের উৎস/বিষয়বস্তু নির্বাচন সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন/গবেষণার পরিকল্পনা বা প্রস্তাবপত্র/অগ্রগতির প্রতিবেদন/গ্রন্থপঞ্জী।

৫. পঞ্চম অধ্যায়ঃ গ্রন্থাগার ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদির ব্যবহার ৭১—৪৭

কার্ড ক্যাটলগ/লেখক ক্যাটলগ/বিষয় কার্ড/বিশ্লেষণ ভিত্তিক কার্ড/গ্রন্থাগারে পুস্তকের শ্রেণী বিন্যাস/শ্রেণী বিন্যাসের উদ্দেশ্য/তথ্যের প্রচার/প্রকাশনার প্রকার ভেদ/মনোগ্রাফ/সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলীর উত্তর দান/টোকা বা নোট প্রস্তুতকরণ/গ্রন্থপঞ্জী।

৬. ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ঐতিহাসিক গবেষণা ৪৮—১০৩

ঐতিহাসিক গবেষণা কাকে বলে/তথ্যের উৎস/প্রাথমিক উৎস/মাধ্যমিক উৎস/ঐতিহাসিক সমালোচনা/বাহ্যিক সমালোচনা/আভ্যন্তরীণ সমালোচনা/সংযোগ সাধন বা সংশ্লেষণ/কার্ডের বিশালাকৃতির দানব।

৭. সপ্তম অধ্যায় ঃ বর্ণনামূলক গবেষণা ১০৪—১২০

বর্ণনামূলক গবেষণার প্রকার ভেদ/জরীপ গবেষণা পদ্ধতি/সামাজিক জরীপ/জনমত জরীপ/স্কুল জরীপ/বাজার জরীপ/কেস্ স্টাডি/লোক-গোষ্ঠি বিশ্লেষণ/কারণ সমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ/সময় ও গতি বিশ্লেষণ/কার্যকলাপ বিশ্লেষণ/অনুসরণমূলক বিশ্লেষণ/ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণ/দলিল বা বিষয়বস্তু ভিত্তিক বিশ্লেষণ/মনোভাব নির্ধারণ ঘটিত গবেষণা/বর্ণনামূলক গবেষণার তথ্য-সংগ্রহের পদ্ধতি।

৮. অষ্টম অধ্যায় ঃ পরীক্ষণমূলক গবেষণা ১২১—১৪৫

পরীক্ষণমূলক গবেষণার সূত্রাবলী/ঐক্যের পদ্ধতি/পার্থক্যের পদ্ধতি/যুক্ত পদ্ধতি/অবশিষ্টাংশ পদ্ধতি/সহগামী বিভিন্নতার পদ্ধতি/শ্রেণীকক্ষ গবেষণা পদ্ধতি/শ্রেণীকক্ষ গবেষণার প্রকার ভেদ/একক ব্যক্তি বা একদলীয় নক্শা/দুই বা ততোধিক সমকক্ষ দল বা দুই দলীয় নক্শা/আবর্তনমূলক পদ্ধতি/উপাদানমূলক নক্শা/মাধ্যমিক স্কুলের শ্রেণী[illegible] শর্তযুক্ত ব্যবহারিক পরীক্ষণ কলা-কৌশল/[illegible]ক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগের সুবিধা ও অসুবিধা।

৯. নবম অধ্যায়ঃ নমুনায়ন তত্ত্ব ও পদ্ধতি ঃ ১৪৬—১৫৪

নমুনার বৈশিষ্ট্য/নমুনায়নের প্রকার ভেদ/সম্ভাবনা নমুনায়ন/নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন/আকস্মিক নমুনায়ন/উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন/নমুনাদলের আকৃতি নির্ধারণ/দৈবচয়িত নমুনায়ন/স্তরিত নমুনায়ন/নিয়ম [illegible] নমুনায়ন/[illegible] নমুনায়ন/বহু পর্যায়ী নমুনায়ন/[illegible] পর্যায়ী নমুনায়ন।

Dhaka University Institutional Repository

১০. দশম অধ্যায় তথ্য সংগ্রাহক উপকরণ ১৫৫—১৯১

তালিকা/ইনভেনটরী বা বিশেষ প্রকারের তালিকা/প্রশ্নমালা/উন্মুক্ত প্রশ্নমালা/নির্ধারিত প্রশ্নমালা/মিশ্র প্রশ্নমালা/প্রশ্নমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগ প্রণালী/মতামত সংগ্রহকারী পত্র/থার্স্টোন পদ্ধতি/লিকার্ট মনোভাবমাপকবা পদ্ধতি/পর্যবেক্ষণ/সংগঠিত পর্যবেক্ষণ/অসংগঠিত পর্যবেক্ষণ/নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ/অনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ/সাক্ষাৎকার/সাক্ষাৎকারের সুবিধা ও অসুবিধা/সমাজমিতিমূলক পদ্ধতি/মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা/মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার প্রকার ভেদ/বুদ্ধির অভীক্ষা/কৃতিত্বের বা সফলতার অভীক্ষা/দক্ষতা বা প্রবণতার অভীক্ষা/ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তি সত্তার অভীক্ষা/আগ্রহের অভীক্ষা/মনোভাবের অভীক্ষা।

১১. একাদশ অধ্যায়ঃ পরিসংখ্যান, পরিমাপ ও মূল্যায়ণ ১৯২—২২৮

গবেষণায় পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা/পরিমাপ ও মূল্যায়ণ/সাধারণ মূল্যায়ণ/পূরণবাচক স্কেল/বিরাম স্কেল/অনুপাত সূচক স্কেল।

১২. দ্বাদশ অধ্যায়ঃ গবেষণার গঠন ও আকৃতি ২২৯—২৪৮

প্রাথমিক পর্যায়/গবেষণার পুস্তক/সহায়ক উপকরণ সমূহ/গবেষণা পত্রের ক্রমিক সংখ্যা/গবেষণার প্রারম্ভিক পর্যায়/অনুমোদিত পত্র/সূচনা ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার/বিষয়সূচী/তালিক সূচী/চিত্রসূচী/গবেষণার মূল বচন/সূচনা অধ্যায়/গবেষণার বিবরণ/চূড়ান্ত অধ্যায়/সাধারণ উদ্দেশ্য/নির্দেশিত উপকরণ সমূহ/গ্রন্থপঞ্জী/পরিশিষ্ট/সূচক/টার্ম পেপার বা সেমিনার রিপোর্ট পদ্ধতি/সারণী/সারণীর শিরোনাম/সারণীর পাদটীকা/রুলিং/স্থানকরণ/পাদটীকা/গ্রন্থপঞ্জী/গ্রন্থপঞ্জীর নমুনা/থিসিস লেখার পদ্ধতি।

গ্রন্থপঞ্জী ২৪৯—২৫১

পরিশিষ্ট-ক, পরিশিষ্ট-খ, পরিশিষ্ট-গ ২৫২—২৬২

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

শিক্ষা গবেষণার আবশ্যকতা ব্যাপক। সমাজ ও সভ্যতা সম্মুখের দিকে ধাবমান। অতীতের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ এবং তার সত্যতা যাচাই করা, বর্তমানকে উদ্‌ঘাটন করা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা করা এবং অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র স্থাপন করার জন্য গবেষণার প্রয়োজন। শুধু প্রয়োজনই নয়, গবেষণালব্ধ জ্ঞান যুক্তিবাদী, মননশীল ও বিজ্ঞান ভিত্তিক হয়ে থাকে। প্রকৃত জ্ঞান অজানাকে জানার জন্য উৎসাহী করে। এই জ্ঞান সর্বদাই বাস্তব ক্রিয়ার পথ নির্দেশক। কোন প্রকৃত জ্ঞানই প্রয়োগহীন হতে পারে না। একমাত্র বাস্তবতার নিরীখে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে জ্ঞানকে পরীক্ষা করা এবং সমৃদ্ধ করা যায়। সমাজের অগ্রগতি সাধন এবং মানুষের উন্নত মানসিকতা ও নৈতিকতা অর্জনে এই জ্ঞান ক্রিয়াশীল। এই জ্ঞান হচ্ছে গবেষণা ভিত্তিক সাধনার ফসল। অতএব, বর্তমান সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষা গবেষণার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সুদূর অতীত থেকে মানুষ তার অস্তিত্বকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য প্রকৃতির প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সমাজের অভ্যন্তরে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন করতে থাকে। বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে মানব সমাজের সামগ্রিক প্রগতিকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে মানুষেরই সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে শিক্ষা গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। শিক্ষা ও শিক্ষা-গবেষণা মানুষকে পারিপার্শ্বিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব অনুধাবনে সক্ষম করে তোলে এবং এই দ্বন্দ্বের অভ্যন্তরে তার অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করার মধ্য দিয়ে সত্য অনুসন্ধানে ব্রতী হয়। গবেষণালব্ধ জ্ঞান সর্বদাই বাস্তব ক্রিয়ার পথ নির্দেশক ও সমাজের অগ্রগতি এবং উন্নত মানসিক ও নৈতিক মান অর্জনে ক্রিয়াশীল।

মানুষের শিক্ষার যাত্রা শুরু হয় জন্মের পর থেকেই। শিক্ষার জন্মলগ্ন থেকেই মানুষ বিভিন্ন আংগিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তা করেছে কি ভাবে, কেমন করে শিক্ষার উন্নতি করা যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষ অন্বেষণ করেছে নতুন পদ্ধতির ও নতুন হাতিয়ারের, যার দ্বারা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভবপর। প্রাচীনকালের গ্রীক পন্ডিত এ্যারিস্টোটল থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর জন ডিউই পর্যন্ত বহু মনীষী শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে বহু চিন্তা ভাবনা করেছেন এবং উন্নতির সোপান সমূহ আবিষ্কারও করেছেন। সুদূর অতীতে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য মানুষ যে পদ্ধতির অনুসন্ধান করেছিল, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে আজ তা আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়েছে। এই পদ্ধতির নাম-ই হচ্ছে শিক্ষা গবেষণা।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও সমাজ চিন্তাবিদদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গবেষণাকে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে শিক্ষাকে বাস্তবমুখী ও যুগোপযোগী করার প্রয়াস চালানো হয়। শিক্ষা গবেষণার ব্যবহার অতি সম্প্রতিকালে বিকাশ লাভ করে। ১৯৩০ সালের শেষের দিকে সামাজিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণার প্রচলন ঘটে। শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর বহুবিধ প্রয়োগ প্রমাণ করেছে যে এই গবেষণা শিক্ষার যে কোন ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম। বিভিন্ন দেশে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে যেসব শিক্ষা বিষয়ক সমস্যার সূত্রপাত হয় সেগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে শিক্ষা গবেষণাকে ব্যবহার করা হয়। যেমন, ৬০ এর দশকে সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রথম মহাকাশে ভূ-উপগ্রহ প্রেরণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন এব্যাপারে যথেষ্ট পিছিয়ে ছিল। পরবর্তীকালে এই পিছিয়ে থাকার কারণ অনুসন্ধান করার লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে এক গবেষণা শুরু করা হয়। এই গবেষণার ফলে প্রচলিত বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থাকে সেই ব্যর্থতার কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়। এই গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে স্কুল পর্যায় পর্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের পরিবর্তন করা হয় এবং উন্নততর পদ্ধতি, উপস্থাপনা এবং উপকরণের প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার সকল স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করা হয়। অতি অল্পদিনের মধ্যেই মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চরম উন্নতি পরিলক্ষিত হয় এবং তারা সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে এগিয়ে যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণা মানুষের জ্ঞান উন্নয়ন তথা সমাজ ও

জাতীয় জীবনের ক্রমবিকাশের মূল্যায়নে [illegible]।
এর মাধ্যমে সমগ্র মানব গোষ্ঠীর সভ্যতার [illegible]-
ষণা বলতে কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির রীতি[illegible]
পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষাকেই বুঝায় [illegible]-
করণ, প্রকল্প বা অনুমান-বিধি স্থিরকরণ, [illegible]-
ষণ এবং সিদ্ধান্তে পৌছান, ইত্যাদি প্রক্রিয়া[illegible]

গবেষণার মাধ্যমে আমরা যেমন নতুন [illegible]
পারি, তেমনি আবার এর মাধ্যমে প্রচলিত [illegible]-
ত্রুটির সমাধান দেওয়া যায়। কাজেই, গবে[illegible]
ব্যুৎপত্তিশীল ব্যক্তি হতে হয় এবং গবেষণা[illegible]
যথেষ্ট জ্ঞান রাখতে হয়। এজন্য তাকে [illegible]
নিয়ে সত্য ও অসত্যের তুলনামূলক বি[illegible]
মানসিক সৎসাহস রাখতে হয়। প্রচলিত [illegible]
এগিয়ে নেওয়াই তার উদ্দেশ্য নয়। বস্তু[illegible]
উন্নয়ন সাধনই তার লক্ষ্য।

শিক্ষাই জাতির উন্নয়নের একমাত্র [illegible]
তথা উন্নততর বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া
সম্ভব নয়। উন্নততর শিক্ষা ও প্রযুক্তি
কার যুগ থেকে বর্তমান সভ্যতার যুগ
যাতে ভবিষ্যতে গ্রহ-গ্রহান্তরে বিচর[illegible]
যাত্রার মান আরও উন্নতি লাভ কর[illegible]
জাতিতে যাতে অধিকতর সম[illegible]
সম্ভব হতে পারে তার জন্য [illegible]
পৃথিবীতে যে জাতি যত [illegible]
গুণগতভাবে শিক্ষার উন[illegible]
গুলোর উন্নয়ন করতে হলে [illegible]
প্রয়োজন। এর জন্য [illegible]

শিক্ষা গবেষণা[illegible]

১। ঐতিহাসিক [illegible]
২। [illegible]
৩। [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তা করেছে কি ভাবে, কেমন করে শিক্ষার উন্নতি করা যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষ অন্বেষণ করেছে নতুন পদ্ধতির ও নতুন হাতিয়ারের, যার দ্বারা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভবপর। প্রাচীনকালের গ্রীক পন্ডিত এ্যারিস্টোটল থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর জন ডিউই পর্যন্ত বহু মনীষী শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে বহু চিন্তা ভাবনা করেছেন এবং উন্নতির সোপান সমূহ আবিষ্কারও করেছেন। সুদূর অতীতে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য মানুষ যে পদ্ধতির অনুসন্ধান করেছিল, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে আজ তা আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়েছে। এই পদ্ধতির নাম-ই হচ্ছে শিক্ষা গবেষণা।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও সমাজ চিন্তাবিদদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গাবষণাকে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে শিক্ষাকে বাস্তবমুখী ও যুগোপযোগী করার প্রয়াস চালানো হয়। শিক্ষা গবেষণার ব্যবহার অতি সম্প্রতিকালে বিকাশ লাভ করে। ১৯৩০ সালের শেষের দিকে সামাজিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণার প্রচলন ঘটে। শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেতে এর বহুবিধ প্রয়োগ প্রমাণ করেছে যে এই গবেষণা শিক্ষার যে কোন ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম। বিভিন্ন দেশে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে যেসব শিক্ষা বিষয়ক সমস্যার সূত্রপাত হয় সেগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে শিক্ষা গবেষণাকে ব্যবহার করা হয়। যেমন, ৫০ এর দশকে সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রথম মহাকাশে ভূ-উপগ্রহ প্রেরণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন এব্যাপারে যথেষ্ট পিছিয়ে ছিল। পরবর্তীকাল এই পিছিয়ে থাকার কারণ অনুসন্ধান করার লক্ষ্যে নিশেষজ্ঞ পর্যায়ে এক গবেষণা শুরু করা হয়। এই গবেষণার ফলে প্রচলিত বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থাকে সেই ব্যর্থতার কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়। এই গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে স্কুল পর্যায় পর্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের পরিবর্তন করা হয় এবং উন্নততর পদ্ধতি, উপস্থাপনা এবং উপকরণের প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার সকল স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করা হয়। অতি অল্পদিনের মধ্যেই মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চরম উন্নতি পরিলক্ষিত হয় এবং তারা সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে এগিয়ে যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণা মানুষের জ্ঞান উন্নয়ন তথা সমাজ ও

জাতীয় জীবনের ক্রমবিকাশের মূল্যায়ণের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। এর মাধ্যমে সমগ্র মানব গোষ্ঠীর সভ্যতার বিকাশ সম্ভব। গবেষণা বলতে কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির রীতিসিদ্ধ নিয়ন্ত্রতান্ত্রিক এবং পুংখানুপুংখ পরীক্ষা-নিরীক্ষাকেই বুঝায়। এর জন্য সমস্যা সনাক্তকরণ, প্রকল্প বা অনুমান-বিধি স্থিরকরণ, পর্যবেক্ষণ, তথ্য বিশ্লেষন এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছান, ইত্যাদি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়।

গবেষণার মাধ্যমে আমরা যেমন নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারি, তেমনি আবার এর মাধ্যমে প্রচলিত বিধিব্যবস্থার ও দোষত্রুটির সমাধান দেওয়া যায়। কাজেই, গবেষককে অবশ্যই একজন ব্যুৎপত্তিশীল ব্যক্তি হতে হয় এবং গবেষণার বিষয়ে তাকে পূর্বাপর যথেষ্ট জ্ঞান রাখতে হয়। এজন্য তাকে দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সত্য ও অসত্যের তুলনামূলক বিচারে সত্য প্রকাশ করবার মানসিক সৎসাহস রাখতে হয়। প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থাকে সম্মুখে এগিয়ে নেওয়াই তার উদ্দেশ্য নয়। বস্তুত, প্রচলিত নিয়ম ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনই তার লক্ষ্য।

শিক্ষাই জাতির উন্নয়নের একমাত্র চাবিকাঠি। কাজেই, শিক্ষা তথা উন্নততর বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া কোন জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। উন্নততর শিক্ষা ও প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষকে আদিম অন্ধকার যুগ থেকে বর্তমান সভ্যতার যুগে নিয়ে এসেছে এবং মানুষ যাতে ভবিষ্যতে গ্রহ-গ্রহান্তরে বিচরণ করতে পারে, মানুষের জীবন যাত্রার মান আরও উন্নতি লাভ করতে পারে, মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে যাতে অধিকতর সমঝোতার মাধ্যমে শান্তিতে সহ অবস্থান সম্ভব হতে পারে তার জন্য গবেষণা চলছে। বলতে গেলে, এই পৃথিবীতে যে জাতি যত বেশী উন্নত সে জাতি ততবেশী মান ও গুণগতভাবে শিক্ষায় উন্নত। কাজেই আমাদের মত অনুন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন করতে হলে জাতীয় শিক্ষার মান ও গুণগত উন্নয়ন প্রয়োজন। এর জন্য পর্যাপ্ত এবং সুষ্ঠ গবেষণা অপরিহার্য।

শিক্ষা গবেষণাকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

১। ঐতিহাসিক গবেষণা
২। বর্ণনামূলক গবেষণা
৩। পরীক্ষণমূলক গবেষণা

Dhaka University Institutional Repository

১। ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী যাতে মানুষ, ঘটনাস্থান ও কালের সমাবেশ ঘটেছে তার ধারাবাহিক লিপিবদ্ধকরণকেই ইতিহাস বলে। মানুষ ইতিহাস থেকে অতীতকে জানতে পারে এবং সেই জানার আলোকে বর্তমানকে জানবার ও বুঝবার প্রয়াস পায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে অতীত ঘটনাবলীর বর্ণনা ও বিচার বিশ্লেষণ করাকে ঐতিহাসিক গবেষণা বলা হয়। অতীত ঘটনাবলীর সত্যতা যাচাই করা এবং অতীত থেকে জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে বর্তমানে সংঘটিত ঘটনাবলীর কার্যকারণ নির্ণয় করা এই গবেষণার উদ্দেশ্য। এই পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপের প্রয়োজন—

ক) গবেষণার বিষয় বা সমস্যা নির্ধারণ। সমস্যা-নির্ধারণ সব সময়ই কঠিন ব্যাপার। প্রয়োজনীয়তা ও তার গুরুত্বের উপরই বিষয় বা সমস্যা নির্ধারণ করা হয়। এজন্য শিক্ষা গবেষণার উপর সমালোচনামূলক পুস্তক, পত্রিকা, সাময়িকী, প্রবন্ধ প্রভৃতি বিশেষ সহায়ক হতে পারে। এ ছাড়া শিক্ষার সঙ্গে জড়িত উপদেষ্টা, শিক্ষক ও সমাজসেবীদের সঙ্গে আলোচনা ও তাদের পরামর্শ সমস্যা নির্বাচনে [illegible] সম্পন্ন হতে পারে।

[illegible] ক গবেষণা [illegible] বা [illegible]
[illegible] মধ্যে গঠন [illegible]
হয় না। [illegible]
[illegible] বক সাক্ষ্য-প্রমাণ [illegible] এবং [illegible]
[illegible] সত্যতা যাচাই করে দেখেন। সাক্ষ্যপ্রমাণ যদি ফলাফলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে ঐ অনুমান গৃহীত হয় আর অসামঞ্জস্য [illegible] হলে অনুমানটি নাকচ করা হয়। সাক্ষ্যপ্রমাণ শিক্ষাপদ্ধতি, [illegible] নীতি, আন্দোলন বা ব্যক্তি বিশেষ সম্পর্কে হতে পারে।

[illegible] গবেষণা [illegible] ভাগ করা যেতে

[illegible]

কেউ দেখেছে কিংবা অংশগ্রহণ করেছে এমন লোকের সাক্ষ্য-প্রমাণ, কোন প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র, আইন-আদালতের রায়, আলোচনা সভার কার্যবিবরণী, আত্মজীবনী, চিঠিপত্র, চুক্তি, দলিলপত্র, খবরের কাগজ, সাময়িকী, ফিল্ম, রেকর্ডকৃত সুর, গবেষণা প্রতিবেদন এবং সর্বোপরি প্রস্তরীভূত অস্থি, কঙ্কাল, মুদ্রা, তৈজসপত্র, চিত্রাবলী, অস্ত্রাদি ইত্যাদিও মৌলিকতথ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

অমৌলিক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য ঃ- এক্ষেত্রে কোন ঘটনার সাক্ষ্য প্রমাণ যার কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয় সে ব্যক্তিগতভাবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না। সে হয়ত অন্য কারো কাছ থেকে শুনেছে বা কোন পত্র-পত্রিকায় বা পুস্তকে পড়ে থাকবে। মৌলিক উৎস থেকে কোন তথ্য পাওয়া না গেলে অমৌলিক উৎসের তথ্য ব্যবহার করা হয়।

ঘ) উপস্থাপিত বা সংগৃহীত তথ্যের মূল্যায়ন ঃ মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত তথ্য নানা ভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়। বিচার বিশ্লেষণ করার পর নির্ভুল বলে গৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং প্রতিবেদন লেখা হয়।

২। বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি

এই পদ্ধতির নামকরণ [illegible] বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতান্তর [illegible] সাধারণ [illegible] অবস্থা বা [illegible] নিয়ম কানুন, [illegible] সম্পর্কে [illegible] পদ্ধতির [illegible] সম্পর্কযুক্ত অতীত ও বর্তমান ঘটনাবলীর উপরও গবেষণা করা হয়ে থাকে।

বর্ণনামূলক গবেষণায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হলো সমস্যা সনাক্তকরণ ও সমস্যার [illegible], সংকলন, বিশ্লেষণ, বাছাইকৃত [illegible] অর্থ ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা, সত্যতা যাচাই এবং সিদ্ধান্ত [illegible] এই পদ্ধতিতে গবেষক তথ্য নিয়ন্ত্রণ করেন না। [illegible] বর্ণনা [illegible] উপরই নির্ভরশীল [illegible] পারে। [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

পারে।

ক) বর্তমান অবস্থার উপর ভিত্তি করে সমস্যার সাথে জড়িত সমস্ত তথ্য সংগ্রহ এর অন্তর্ভুক্ত।

খ) ভবিষ্যতের প্রেক্ষিতে সমস্যার সমাধান কল্পে যেসব তথ্যর প্রয়োজন তা সংগ্রহ করা এর অন্তর্ভুক্ত। এই তথ্যসমূহে অনুরূপ সমস্যার সমাধানের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান বা ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মতামতের উপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

গ) কিভাবে ঈপ্সিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছান যায়, এই তথ্যসমূহেও অনুরূপ সমস্যার সমাধানের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য ও জ্ঞান ব্যবহার করাই শ্রেয়, বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ বিশেষ প্রয়োজন।

শিক্ষার বহুবিধ সমস্যা এই পদ্ধতিতে জরীপ ও কেস-ষ্টাডির মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়।

৩। পরীক্ষণমূলক গবেষণা পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে গবেষক নিয়ন্ত্রিত শর্তাধীনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করেন এবং তার ফলে গবেষণার বিষয়বস্তু কিভাবে প্রভাবিত হয় তা লক্ষ্য করেন। এই নিয়ন্ত্রণ ইচ্ছাকৃত এবং রীতিসিদ্ধ। এতে অন্যান্য বিষয় বা উপাদান (factor) যা গবেষণার ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন এবং অনভিপ্রেত বিষয়ের বা উপাদানের (factor) প্রভাব গবেষণা কর্ম থেকে সম্পূর্ণ অপসারণ করা হয় কিম্বা তার প্রভাব যাতে পরিমাপ করা যায় তার ব্যবস্থা করা হয়।

গবেষণার সমস্যা স্থির করার পর গবেষক অনুমান বা 'hypothesis' স্থির করেন। নিয়ন্ত্রিত বিষয় সমূহের (controlled factor) প্রভাব লক্ষ্য এবং পরিমাপ করার পর তিনি অনুমান গ্রহণ কিংবা বর্জন করেন। এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নির্ভুল হিসাবে গণনা না করে সম্ভাবনা শাস্ত্রের দৃষ্টিভংগি থেকে গ্রহণ করা হয়।

এই পদ্ধতি একাধারে যেমন গবেষণাগারে প্রয়োগ করা হয় তেমনি অন্যান্য ক্ষেত্রেও, যেমন—শ্রেণীকক্ষে বা কৃষিজমির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। পরিসংখ্যান বিজ্ঞানী R. A. Fisher প্রবর্তিত Factorial Design এই পদ্ধতির গবেষণার জন্য বিশেষ সহায়ক, পরীক্ষার পূর্বেই গবেষকের বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। এবং তারই ভিত্তিতে ছক তৈরী, সম্পূর্ণ নির্বিচারে (random) সংযোজন, অন্তস্তর এবং বহিস্তর উপাদানসমূহের সম্যক নিয়ন্ত্রণ, প্রয়োগ এবং পরিলক্ষিত ফলাফলের সম্যক পরিমাপ প্রয়োজন। এই ভাবে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ analysis of Variance, analysis of co-variance এর সাহায্যে এবং অন্যান্য উপায়ে বিশ্লেষণ করা হয়। সম্ভাবনা তত্ত্বের (Theory of Probability) সাহায্যে অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা বর্জন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এই পদ্ধতি নানাভাবে শিক্ষা গবেষণায় প্রয়োগ করা যেতে পারে। শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষার উপকরণ, শিক্ষায় উৎসাহ বা অনুৎসাহ ইত্যাদির ফলে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফল, ভুলের মাত্রা কিংবা কোন কাজ দ্রুত ও সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করা কিভাবে প্রভাবিত হয় সে সবের সম্যক ধারণা করা সম্ভব।

গবেষণার কাজে গবেষককে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ঐ সকল সমস্যার সুষ্ঠ সমাধানের উপর গবেষণার ফলাফল বহুলাংশে নির্ভরশীল। গবেষককে প্রচলিত আইন, ধর্মীয় বিধান, সামাজিক বা ব্যক্তিগত সংস্কার ইত্যাদি বিষয় সামনে রেখে গবেষণা কর্মে এগিয়ে যেতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
গবেষণার পটভূমি

গবেষণা বিবর্তন প্রক্রিয়ার একটি সংশোধিত রূপ। মানুষের আত্মজিজ্ঞাসার একটি সুনিশ্চিত রূপই হচ্ছে গবেষণা। আজকে আমরা যাকে গবেষণা বলি, যার মাধ্যমে সত্যের সন্ধান করি,—সমস্যা সমাধানের সুষ্ঠ পন্থা উদ্ভাবন করি তার বর্তমান রূপ অর্জনে বহু বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন ঘটেছে। মানব মনের অসংখ্য জিজ্ঞাসা থেকেই বর্তমান পর্যায়ের গবেষণার উৎপত্তি।

যুগে যুগে মানুষের জিজ্ঞাসু মন জীবন ও জগতের অপার রহস্যের আবরণ উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছে। জীবন ও জগতের মূল উৎসের পরম সত্যের সন্ধান করে ফিরেছে। মাথার উপরে নক্ষত্র খচিত অনন্ত আকাশ, জগত পরিবেষ্টিত অগাধ জলধি, অচল--অটল হিমাদ্রি, রহস্যঘেরা গভীর অরণ্যানী, স্নিগ্ধশ্যামল প্রান্তর, সীমাহীন ধূসর মরুভূমি মানুষকে বিমুগ্ধ করেছে। বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে জীবনের বৈচিত্র, অপরিসীম রহস্য মানুষের বিস্ময় মুগ্ধ মনে বারম্বার গভীর জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছে। এই জিজ্ঞাসা থেকেই মানুষের মধ্যে জন্ম নিয়েছে যুক্তি-চিন্তার। পৃথিবীর বুকে মানুষের আবির্ভাবের কাল থেকেই গবেষণার সূত্রপাত।

জন্মের পর থেকেই মানুষ তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে জানার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী বা উৎসুক ছিল। মানুষের জানার প্রথম আগ্রহ ছিল পৃথিবী সম্পর্কে। পৃথিবী আসলে কি ভাবে আছে? কেমন করে চলছে? প্রকৃতির বিভিন্ন কর্মকান্ড কেমন করে সাধিত হচ্ছে এমনি হাজারো প্রশ্ন মানুষের মনে অহরহ দোলা দিত। অত্যাধিক কৌতুহলী মন,—আকার ইঙ্গিত উপলব্ধি ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তাকে বিশ্বের কর্ম সম্বন্ধে চিন্তা করার প্রেরণা যোগায়। সে মনে করল তার নিয়ন্ত্রনের বাইরে একটি বৃহৎ শক্তি আছে। এইভাবে শত শত বৎসর পর মানুষের মনে বিশ্বব্রহ্মান্ড সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যার ধারণা জন্মগ্রহণ করে। ধীরে ধীরে মানুষের জানার প্রচেষ্টা ধর্মীয় মতবাদে রূপ নেয়। প্রকৃতির রহস্যময়ী শক্তি এক অলৌকিক শক্তিতে পরিণত হয়। এই অলৌকিক শক্তির নির্দ্দেশে চন্দ্র, সূর্য, বৃষ্টি, আলো প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। এসময় কালে এমন ধারণাও উদ্ভূত হয় যে, তখনকার মানুষের মধ্য থেকে কিছু কিছু লোক এই অলৌকিক শক্তি পরিচালনা করত আর যারা ধর্মপরায়ণ এবং অলৌকিক শক্তির উত্তম ব্যাখ্যাদানকারী, তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি অন্য মানুষকে বিভিন্ন কাজে উপদেশ দিত। ধীরে ধীরে এইসব ব্যক্তি সমাজের উপর স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করল। কালক্রমে এরা ধর্মীয় গুরু বা দেবতা হিসাবে আবির্ভূত হ'লো। ধর্মীয় গুরুদের কৌশলগত আলাপ-আলোচনার স্বরূপ দর্শনে মানুষ তাদেরকে সাধারণ মানুষ থেকে অনেক উর্দ্ধে স্থান দিত। তারা মনে করত স্রষ্টার সংগে এইসব দেবতার, শক্তি ও কর্তৃত্বের দিক থেকে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। সমাজের সমস্ত কর্তৃত্ব ধর্মীয় গুরুদের উপর ন্যস্ত ছিল।

ধর্মীয় গুরুদের ধ্যান, ধারণা, মতামত পর্যায়ক্রমে ধর্মীয় মতবাদে রূপ নিল। ধর্মীয় গুরুরা অনেক সময় বিভিন্ন রোগের ঔষধ হিসাবে-বিভিন্ন গাছের পাতা, বাকল, ফল ইত্যাদি ব্যবহার করে রোগ নিরাময়ে সাহায্য করত। তাই তাঁরা 'মেডিসিন ম্যান' বা ওঝা কিংবা কবিরাজ হিসাবেও চিহ্নিত হ'তো। বর্তমান আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে এখনও এই 'মেডিসিন ম্যান'দের কথা কিছু কিছু শোনা যায়। ধীরে ধীরে মানুষ 'প্রসেস অব লাইফ' বা জীবন-প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা ধর্মীয় মতবাদে খুঁজে পেল। ধর্মীয় শাস্ত্রে ছিল অনেক সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান। এই রূপে ধর্ম বংশানুক্রমে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু অহেতুক গোঁড়ামি, অলৌকিকতায় অন্ধ বিশ্বাস, গবেষণার সাবলীলতা ও অগ্রযাত্রায় বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়।

প্রকৃতির অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী মানুষ ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করল যে, প্রকৃতির কোন ক্রিয়া-কর্মই নেহায়েত খাম-খেয়ালীর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়না। সমস্ত কিছুই একটা বিশেষ নিয়মে-রীতিতে সংঘটিত হয়ে থাকে। ক্ষুদ্র, তুচ্ছ বালুকণা থেকে শুরু করে বিশাল সূর্য-চন্দ্রও নক্ষত্রাদি সবই এই অমোঘ নিয়মের অধীন। প্রকৃতির প্রতিটি কাজের মধ্যেই একটা গ্রন্থিবদ্ধ নিয়ম-শৃংখলা রয়েছে। প্রতিটি ঘটনার কারণ ও ফলাফলের (cause and effect relations-

Dhaka University Institutional Repository

hip) সমন্বিত অস্তিত্ব বিদ্যমান। কোন একটি বিশেষ অবস্থা পরবর্তী পর্যায়ে কি রূপ নিতে পারে কার্যকারণ পরম্পরার এই স্বরূপ তত্ত্ব মানুষ অনুধাবন করতে শুরু করল। এধরণের ধ্যান ধারণা যদি ধর্মীয় মতবাদের সংগে বিরোধ সৃষ্টি করত তাহলেসেসব ধ্যান ধারণা বর্জিত হত। শুধু তাই নয়, এ-ধরণের মতবাদ পোষণকারীদের শাস্তি দেওয়া হতো। এ শাস্তি কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত প্রসারিত হতো। উদাহরণ স্বরূপ এস্থলে (১৪৭৩-১৫৪৩ খৃঃ) কোপারনিকাসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইনি পোল্যান্ডের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে সৌর জগতের কেন্দ্র পৃথিবী নয়, সূর্য। তাঁর মতবাদের নাম হচ্ছে "সূর্য-কেন্দ্রিক" মতবাদ। এর অর্থ: সূর্য-স্থির হয়ে রয়েছে আর গ্রহ-উপগ্রহসমূহ সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। কোপারনিকাসের মতবাদ পুস্তক আকারে প্রকাশিত হবার পর থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা হয়। তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। ধর্মীয় মতবাদের বিরোধিতা করার অভিযোগে তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল।

কৌতুহল-দীপ্ত মানুষ ধীরে ধীরে তার সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোকে এক শ্রেণীর সংকীর্ণ ও বিভ্রান্তিকর ধর্মীয় মতবাদের সংগে বিরোধিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে শুরু করল। ক্রমান্বয়ে সে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিকে এগিয়ে চললো। এভাবে বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে অনুসন্ধান কাজে একধাপ অগ্রসর হলো। এই ধরণের প্রয়োগ-পর্যবেক্ষণ অবশ্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ছিল প্রকৃত অর্থে অনিয়মতান্ত্রিক। অনুসন্ধানের ধারাবাহিক এবং উদ্দেশ্য পূর্ণ কোন পদ্ধতি ছিল না। ফলে অনুসন্ধান কার্য অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো, বিশেষ কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারত না। অনেক ক্ষেত্রে জটিল সমস্যা [illegible] হতো। আবার কখনও বা ছোট সমস্যাই জটিল সমস্যার আকার ধারণ করত।

যখন থেকে মানুষ ধারাবাহিকভাবে এবং যুক্তির মাধ্যমে চিন্তা করতে শুরু করল তখন থেকে যুক্তির যুগের (era of logic) সূচনা হয়। গবেষণার বৈজ্ঞানিক অর্থটি মানুষ হৃদয়ঙ্গম করতে পারল। গ্রীকরা সর্বপ্রথম পর্যায়ক্রমে যুক্তির মাধ্যমে অনুসন্ধান কর্ম চালিয়েছিলেন। গ্রীকদের যুক্তি প্রয়োগ করে চিন্তা করার মাধ্যম ছিল—'syllogism'। দুটি বাক্য বা ক্ষেত্র থেকে একটি বাক্যে বা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে বলা হয়'syllogism'। এব্যাপারে গ্রীকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন এ্যারিষ্টোটল (খৃঃ-পূর্ব ৩৮৪)। তিনি যে পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন তার নাম অবরোহ পদ্ধতি (Deductive Method)। যুক্তির মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে অনুসন্ধানই হলো অবরোহ পদ্ধতি। বিষয়টি মূলতঃ তিনটি অংশে বিভক্ত-(১) প্রধান ক্ষেত্র (major premise) (২) ছোট ক্ষেত্র (minor premise) (৩) সিদ্ধান্ত (conclusion)।

মূল কথা হলো--এই তিনটি অংশের মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে। প্রমাণিত সত্যের উপর ভিত্তি করে যুক্তি প্রয়োগ ও ধারাবাহিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রধান অংশটি প্রমাণিত সত্যের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এর গতি সাধারণ থেকে বিশেষে (general to particular) [illegible]

উদাহরণস্বরূপ--

মানুষের বুদ্ধি ও বিচার করার ক্ষমতা আছে। রহিম একজন মানুষ কাজেই রহিমেরও বুদ্ধি এবং বিচার করার ক্ষমতা আছে।

প্রথম বাক্যটি বড় ক্ষেত্র। বড় ক্ষেত্রটি প্রমাণিত সত্যের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, যে সত্য [illegible] দ্বারা পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যটি ছোট ক্ষেত্র এবং বড় ক্ষেত্রের অংশ বিশেষ। এই দুই ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তিনটি অংশের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। অবরোহ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল—সাধারণ থেকে বিশেষে আসা, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত থেকে মূল তথ্যে বা কোন সাধারণ পূর্ব-স্বীকৃত তত্ত্ব থেকে একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং যুক্তি প্রয়োগ করে অনুসন্ধান কর্ম চালান। গবেষণার বৈজ্ঞানিক অর্থটি মানুষ হৃদয়ঙ্গম করতে পারল। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উন্নয়নে এবং সমস্যার সমাধানে অবরোহ পদ্ধতির বিশেষ অবদান আছে—। গবেষণার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির মাধ্যমে ধারাবাহিক ও আনুষ্ঠানিক চিন্তাধারার প্রথম সূচনা হয়। গ্রীক দার্শনিকদের অনুসন্ধান করার এই প্রক্রিয়াকে চিন্তাধারার নকশা বা 'model of thinking' বলা হত।

অবরোহ পদ্ধতিতে পূর্ব-নির্ধারিত কোন তত্ত্বকে স্বয়ং সম্পূর্ণ

DHAKA METROPOLITON TEACHERS' TRAINING COLLEGE
DATE.........

Dhaka University Institutional Repository

বলে বিবেচনা করার ফলে অনেক সময় নতুন নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করা যেত না।

শতাব্দীকাল পরে ফ্রান্সিস্ বেকন (১৫৬১-১৬২৬ খৃঃ) প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সূচনা করেন। এই পদ্ধতি আরোহ পদ্ধতি বা (Inductive Method) নামে পরিচিত। এইপদ্ধতির প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়। অবরোহ চিন্তা এবং দৈবাৎ ঘটনার যুক্তি থেকে মুক্ত। বিশেষ থেকে সাধারণের দিকে ধাবিত হয় এবং অবরোহ পদ্ধতি বিপরীত, নতুন তথ্য বা সিদ্ধান্তে আসা যায়, সামান্যী করণ সম্ভবপর, প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে অনুসন্ধান কার্য চালান হয় এবং অধিকতর বিজ্ঞান সম্মত। উদাহরণ স্বরূপ আম গাছের পাতার রং সবুজ, গোলাপ গাছের পাতার রং সবুজ, জাম গাছের পাতার রং সবুজ সুতরাং গাছের পাতার রং সবুজ। আরোহ পদ্ধতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমস্ত গাছের পাতা সবুজ হওয়ার কথা। কিন্তু বিভিন্ন স্থান থেকে নমুনা সংগ্রহ করে দেখা যায় অনেক উদ্ভিদের পাতা লাল হলুদ ইত্যাদিও হতে পারে। অনেক সময় বিস্তৃত বা ব্যাপক এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা না হলে ভুল তথ্য সংগৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং প্রাপ্ত সত্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। গবেষণায় আরোহ যুক্তি পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে পর্যবেক্ষণ লব্ধ তথ্য থেকে নতুন তত্ত্ব বা জ্ঞান উদ্ঘাটন করা যায়। কখনও কখনও অনুসন্ধান কর্ম পরিচালনায় কোন একটি প্রতিপাদ্যকে উদ্দিষ্ট হিসাবে গ্রহণের অভাবে পর্যবেক্ষণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

(শুধুমাত্র যুক্তি ও অনুমানের ভিত্তিতে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এরিস্টোটল ও ফ্রান্সিস্ বেকন গবেষণা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। কিন্তু তাঁদের গবেষণা বা যুক্তির ফলশ্রুতি সার্বজনীন ভাবে গৃহীত না হওয়ায় এবং অবরোহ ও আরোহ পদ্ধতির ত্রুটি দূর করার লক্ষ্যে পরবর্তী কালে চার্লস ডারউইন এক নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। তিনি এরিস্টোটলের অবরোহ পদ্ধতি এবং ফ্রান্সিস্ বেকনের আরোহ পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। এই সমন্বয় সাধনকৃত পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সারবস্তু বা 'essence of scientific method' বলা হয়। অবরোহ পদ্ধতির প্রধান ক্ষেত্র বা 'major premise' কে অনুমিত সিদ্ধান্ত বা 'hypothesis' হিসাবে ধরা হয়। এই সমন্বিত পদ্ধতি প্রয়োগ করে চার্লস ডারউইন বিভিন্ন গাছপালা এবং পশু পাখী থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে বিবর্তনের তত্ত্ব বা (Theory of Evolution) প্রবর্তিত হয়।)

গ্রীক দার্শনিকগণ সর্বপ্রথম যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অনুসন্ধান কর্ম পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু ভেবে দেখা দরকার আধুনিক গবেষণার সত্যিকার পথিকৃত কারা। নিরপেক্ষ সমালোচক ও ঐতিহাসিকদের মতে মুসলমানরা যদি তাঁদের অগাধ জ্ঞান ভান্ডারের চাবি পাশ্চাত্যের পন্ডিত ও গবেষকদের হাতে তুলে না দিতেন তবে মানব সমাজকে আধুনিক সভ্যতায় উত্তীর্ণ হতে আরও কয়েক শতাব্দী বিলম্ব করতে হতো। বিস্ময়কর অনেক গবেষণা তাঁদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। তারাই ভূগোল চর্চা ও গবেষণায় একান্তভাবে মনোনিবেশ করেন। পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমারেখা, আয়তন, সূর্য-গ্রহণ, চন্দ্র গ্রহণ, আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি, বিভিন্ন বাণিজ্য-পথ, প্রভৃতি আবিষ্কারের ক্ষেত্রে গবেষণা চালিয়ে সফলতা লাভ করেন।

টেলিস্কোপকে মানুষের ব্যবহারে আনা, ইউরোপকে শূন্যের ব্যবহার ও সংখ্যা গণনা শিক্ষাদান, দশমিক প্রথার প্রচলন, জ্যামিতির জটিল সম্পাদ্যগুলোর সমাধান, জ্যোতিষ চিকিৎসা ও রসায়ন বিজ্ঞানের উদ্ভাবন ও উৎকর্ষ সাধনে তাঁদেরই অক্লান্ত গবেষণার ফসল রয়েছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছি আমরা কিন্তু পেয়েছি কি ভূ-মন্ডল ও নভোমন্ডলের সকল গুপ্তরহস্যের সন্ধান? কেবল জাগতিক শিল্প ও অপরাপর বস্তুগত উন্নয়নের চিন্তা নয়, মানুষের অনুভূত চাহিদা সমূহ (নৈতিক ও বৈষয়িক কল্যাণ সাধন কারী) পূরণের ক্ষেত্রেও উপযুক্ত গবেষণা আবশ্যক। নতুবা সমস্যাগুলো ব্যক্তি ও তার আত্মা থেকে [illegible] তথা ভূ-আলোড়নকারী ধ্বংসলীলায় পরিণত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণার ভূমিকা

শিক্ষাজীবন আমাদের সামাজিক জীবনেরই এক বৃহত্তর ক্ষেত্র। এখানেও রয়েছে বিভিন্ন সমস্যা, প্রতিকূল পরিবেশ। শিক্ষা প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি প্রধান বিভাগ দেখা যায় প্রথম ভাগের কাজ হল শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করা। শিক্ষার লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য দ্বিতীয় বিভাগের কাজ হল শিক্ষার উপযুক্ত বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতি নির্ধারণ করা। সর্বশেষ এবং তৃতীয় বিভাগটির কাজ হল শিক্ষা প্রচেষ্টার ফলাফল বিচার করা।

মানুষ গুহার জীবনকে পরিত্যাগ করে সুরম্য ও সুউচ্চ অট্টালিকায় বাস করতে শিখেছে। চেষ্টা চলছে আরও উঁচুতে বসবাস করার জন্য। সমাজ আর গুহার জগতে থাকতে পারে না। শিক্ষা পদ্ধতি বা ব্যবস্থাও মানুষের সেই নগ্ন যুগের শিক্ষা ব্যবস্থায় থাকতে পারে না। তাই শিক্ষাকে যত ভাগেই ভাগ করা হোক না কেন সব ভাগেরই প্রধান উদ্দেশ্য হল এই পরিবর্তনশীল সমাজের কাঙ্খিত পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে নতুন প্রয়োজন মিটান এবং শিক্ষার্থীকে সেই পরিবর্তিত সমাজের সংগে সামঞ্জস্য বিধান করার যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করা। সুতরাং, সমাজের চাহিদা মিটানোর জন্য শিক্ষাকে গতিশীল এবং পরিবর্তনশীল করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন রাতারাতি সম্ভবপর নয় এবং সব পরিবর্তন সব সময়ে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত করার পূর্বে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যাচাই করে এবং ছোট আকারে প্রয়োগ করে দেখা দরকার পরিবর্তনের বা শিক্ষার নতুন দিগন্তের কতটুকু প্রযোজ্য এবং গ্রহণযোগ্য হবে।

যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন শিক্ষা বিজ্ঞানী এবং চিন্তাবিদগণ শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন মূল্যবান তথ্য রেখে গেছেন। যেমন, প্লেটো তিন ধরনের শিক্ষাক্রমের কথা বলেছেন, তিন ধরনের স্কুলের কথা বলেছেন। রুশো প্রকৃতিবাদী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পেস্তালৎসী বলেছেন মনোবিজ্ঞান সম্মত শিক্ষাদান পদ্ধতি। হকিট শিক্ষাদান ক্ষেত্রে উত্থাপন করেছেন তার পঞ্চ-সোপান পদ্ধতি। একইভাবে ফ্রোয়েবেল মন্টেসরী, জন ডিউই, হোয়াইট হেড, রবীন্দ্রনাথ

প্রমুখ মনিষীগণ শিক্ষা সম্পর্কে এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব দর্শন, মতামত ও মূল্যবান বক্তব্য রেখে গেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের এসব মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্যসমূহকে বিশ্লেষণ ও গবেষণার মাধ্যমে সঠিক মূল্যায়ণ করে আমরা বাস্তব জীবনে শিক্ষাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আমাদের প্রচলিত শিক্ষার বিভিন্ন দিককে আরও উন্নত ও সমৃদ্ধশালী করে তুলতে পারি।

মানব ইতিহাসে শিক্ষা সমৃদ্ধ নির্ভরযোগ্য জ্ঞান আহরণ করার প্রয়োজনীয়তা বর্তমানের মতো অতীতে এত গভীরভাবে অনুভূত হয়নি। একসময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজের উঁচুস্তরের লোকদের শিক্ষাদানের জন্য ব্যবহৃত হত। বর্তমানে শিক্ষানীতি, শিক্ষাক্রম, শিক্ষার চাহিদা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চমানের শিক্ষাব্যবস্থার চাহিদা মিটানো ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটেছে। বিগত অর্ধশতাব্দীতে শিক্ষাজগতে যে পরিবর্তন ঘটেছে সেসবের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে শিক্ষাবিদদের পূর্ব ধারণা ছিল না। মূলতঃ বিশেষ কোন শিক্ষা-বিশারদের শিক্ষা-সংস্কারের উপর এইসব পরিবর্তন নির্ভরশীল ছিল না, শিক্ষা সমস্যা সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সুষ্ঠ কোন পদ্ধতিও ছিল না। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পর্যন্ত শিক্ষাবিদদের ধারণা ছিল না যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে শিক্ষা সমস্যার সমাধানে প্রয়োগ করা যেতে পারে। পদার্থ বিজ্ঞানের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে গবেষণার একটি নতুন দিগন্ত উদ্ঘাটিত হল। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সমাজ চিন্তাবিদগণ ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গবেষণাকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করে শিক্ষাকে বাস্তবমুখী ও মূল্যোপযোগী করতে সচেষ্ট হন।

শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আধুনিক শিক্ষা কর্মের তত্ত্ব সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন পদ্ধতির আবিষ্কার হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণালব্ধ জ্ঞানের বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, মনোচিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ও তার ফলাফল থেকে আমরা মানুষের সমস্যার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি এবং এসব সমস্যার সমাধান কল্পে নতুন নতুন পদ্ধতির আবিষ্কার হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও শিক্ষা সমস্যা, শিক্ষার কার্যকারণ সম্পর্ক এবং শিক্ষার্থীর উপর শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। ঠিক ভাবে

Dhaka University Institutional Repository

এসব জানার একমাত্র উপায় হচ্ছে শিক্ষা গবেষণা।

শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা পরিবর্তনশীল, শিক্ষার পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার নিয়ম কানুন, মূল্যবোধ, ধ্যান ধারণা ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটে। একমাত্র গবেষণালব্ধ জ্ঞানই শিক্ষাকর্মীকে শিক্ষা পরিবর্তন, শিক্ষার গতি ও ধারা সম্বন্ধে সচেতন রাখতে, উপযুক্ত কল্যাণ মূলক কর্মসূচী গ্রহণে ও সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে।

ব্যক্তিগত বা দলীয় শিক্ষার্থীর অর্থনৈতিক বা সামাজিক সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যেমনঃ—ছাত্র-কেন্দ্রিক পদ্ধতি, শিক্ষক-কেন্দ্রিক পদ্ধতি, পরীক্ষামূলক পদ্ধতি, পরিকল্পনা-মূলক পদ্ধতি, প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি, বক্তৃতামূলক পদ্ধতি, প্রদর্শন পদ্ধতি, আবৃত্তিমূলক পদ্ধতি, আলোচনামূলক পদ্ধতি ইত্যাদি। শ্রেণীকক্ষে পাঠ দানের জন্য কোন পদ্ধতিটি অধিকতর উপযুক্ত তা গবেষণার মাধ্যমে জানা যায়। এছাড়া শিক্ষাকে বাস্তব মুখী, বিজ্ঞান মুখী, শিক্ষার্থীর গ্রহণোপযোগী, মানব কল্যাণোপযোগী, শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষা পাঠ্যক্রম প্রণয়নের জন্য গবেষণার প্রয়োজন। কেবলমাত্র গবেষণার মাধ্যমে সুষ্ঠু প্রবর্তন করা সম্ভবপর।

শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণার ফলে শিক্ষা শিক্ষণ (Teaching Learning) পদ্ধতির মধ্যে একটি সমঝোতার সৃষ্টি হয় এবং কোন অবস্থায় শিক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ হবে ও দীর্ঘস্থায়ী হবে তা জানা যায়।

প্রতিটি শিক্ষাক্ষেত্রের একটি পৃথক সত্তা ও বৈশিষ্ট্য আছে। এর নিয়ম ধারা ভিন্ন তাই শিক্ষার নিয়ম কানুন এবং মূল্যবোধও ভিন্ন হয়। অর্থনৈতিক অবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থার ভিন্নতার দরুণ শিক্ষার সমস্যাবলীও ভিন্ন ভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। যেমন, পাশ্চাত্যের কোন উন্নত দেশের শিক্ষা কর্মীরা যে সমস্ত সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত আমাদের দেশের সমস্যা তা থেকে অনেকাংশেই পৃথক। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোতে পারস্পরিক সম্পর্ক জনিত, অসামঞ্জস্যপূর্ণ সমস্যাবলী ও অন্যান্য মানসিক সমস্যা অধিকতর প্রকট। আর আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষার মৌলিক চাহিদা পূরণের অভাব জনিত সমস্যাই অধিকতর তীব্র ও ব্যাপক। এখানে শিক্ষা কর্মী দারিদ্র্য, অসুস্থতা, অপুষ্টি, শিক্ষা উপকরণের অভাব জনিত সমস্যাবলী নিয়ে

অধিকতর ব্যাপৃত। শিক্ষা কল্যাণের প্রয়োজনে তাই শিক্ষাকর্মীকে শিক্ষার্থীদের বিশেষ বিশেষ সংস্কার, মূল্যবোধ, নিয়মকানুন ও তাদের বিশেষ বিশেষ সমস্যার প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে সেসবের সমাধানে সচেষ্ট হতে হয়। বিশেষ শিক্ষার্থীর উপযুক্ত বিশেষ শিক্ষা পরিস্থিতিকে জানবার জন্য তাই গবেষণার প্রয়োজন।

সামগ্রিকভাবে এও বলা যায় যে, শিক্ষা গবেষণার মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থাকে এগিয়ে নেওয়া যায়। কারণ, জ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রেই গবেষণা কর্ম একটি উল্লেখযোগ্য আসন অধিকার করে আছে। জাতীয় বুদ্ধি বৃত্তি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গবেষণা চাবিকাঠি স্বরূপ। বর্তমানকালে শিল্প, চিকিৎসা, ভৌত ও রসায়ন বিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞানের উন্নয়নের জন্য গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে শিক্ষা গবেষণার প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নকামী ও নতুন দেশ। অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতো এদেশে শিক্ষার বিভিন্ন দিকেও অনগ্রসরতা রয়েছে। শিক্ষার প্রশাসনিক অবস্থা, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষা উপকরণ, বই পুস্তক প্রণয়ন, শিক্ষার্থীর মান নির্ণয়, শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে মান নিম্ন হওয়ার কারণ ইত্যাদি প্রশ্নে আরও গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে পরিবর্তনশীল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে সময়, শক্তি, অর্থ, মেধা ইত্যাদির অযথা অপচয় না ঘটে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, আমাদের দেশে গৃহীত জনশিক্ষা পরিকল্পনা যা গবেষণা ছাড়া, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া, যাচাই করা ছাড়া, কোন নমুনা দর্শনের উপর প্রয়োগ করা ছাড়াই অবৈজ্ঞানিক পন্থায় আমাদের দেশের নিরীহ শিক্ষার্থীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল যার ফলে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হওয়া সত্বেও, অনেক মেধা শক্তির অপচয় হওয়ার পরে তা বিফলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

METROPOLITAN TEACHERS TRAINING COLLEGE DATE........

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাব্যবস্থা সুষ্ঠ ভিত্তির উপর গড়ে ওঠা অত্যাবশ্যক। তাই প্রচলিত ও স্বীকৃত সত্যের উপর ভিত্তি করেই আধুনিক বিশ্বে শিক্ষা-নীতি ও শিক্ষা-পদ্ধতি গড়ে উঠে। স্বীকৃত সমস্যাও অনেক সময় গবেষণার মাধ্যমে এবং সময়ের ব্যবধানে অসত্য হয়ে যায়। শিক্ষা যুগোপযোগী ও গতিশীল, কখনও স্থবির নয়। দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে অহরহ নতুন নতুন জ্ঞানের সাথে মানুষের পরিচয় হচ্ছে। প্রতিনিয়ত দৃষ্টিভংগিও পাল্টে যাচ্ছে। তাই ব্যক্তির প্রয়োজনে, সমাজের প্রয়োজনে, রাষ্ট্রের প্রয়োজনে তথা মানব কল্যাণের প্রয়োজনে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তনশীলতা ও গতিশীলতার গুণাবলী থাকা প্রয়োজন। সেকারণেই শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষানীতি ও শিক্ষা পদ্ধতি বিষয়ের উপর অবিরত গবেষণার প্রয়োজন।

দুঃখের বিষয়, আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশ সমূহে গবেষণার তেমন ব্যবস্থা নেই। উন্নত দেশসমূহ থেকে আমদানী করা জ্ঞান ও তথ্যের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। বিভিন্ন দেশের সাথে ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ভিন্নতার কারণে এসব পদ্ধতি আমাদের দেশের জন্য প্রয়োজনীয় নাও হতে পারে। তাই সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে আমরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে পারিনা। অবশ্য কিছু কিছু সত্য আছে যা সর্বত্রই সব সময়ে-সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই সময়ের প্রয়োজনেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তনশীল ও গতিশীল করা দরকার। সে পরিবর্তনকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করতে হলে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গবেষণা দরকার। কেননা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্যও প্রয়োজন শিক্ষা গবেষণা।

যুগের দাবী পূরণ করতে আমাদের শিক্ষা বিশেষীকরণ ব্যবস্থা অনেকাংশেই অক্ষম। সৃষ্টিধর্মী চিন্তার প্রকাশক্ষেত্রে ও গবেষণার ক্ষেত্রে শিক্ষাও বিশেষীকরণ চলছে। কাজেই ব্যক্তি সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে পারেনা। সময়ের প্রয়োজনে ব্যক্তিকে স্বীয় কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হতে হয়।

এসব বিশেষজ্ঞ তৈরী করেন শিক্ষক। তাই শিক্ষককে বিশেষজ্ঞ হতে হয়। শিক্ষককে বিশেষজ্ঞ হতে হলে সমাজ ব্যবস্থা ও শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর ভাল দখল থাকতে হবে। এজন্য একজন বিশেষজ্ঞ

শিক্ষক হবেন গভীর মেধা সম্পন্ন ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন। তাঁর আবিষ্কারের প্রয়োজনে তিনি হবেন সচেষ্ট। তাঁর মস্তিষ্কের চিন্তা শক্তির উন্নতি ও নবনব সত্য আবিষ্কারের প্রয়োজনে তিনি হবেন সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক ও গবেষক। শিক্ষা ক্ষেত্রে এ গবেষণা সারাজীবনও চলতে পারে, তাই এ গবেষণা একটা অবিরত প্রক্রিয়া।

শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণার অবদান প্রধানতঃ দ্বিবিধ ঃ

১, শিক্ষা ব্যবস্থাকে সামগ্রিক ভাবে উন্নত করা,

২, শিক্ষা দান ও শিক্ষা প্রশাসন সংক্রান্ত সমস্যাবলীর নির্ভুল সমাধানের সন্ধান দেওয়া।

বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা অত্যুক্তি হবেনা যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের উন্নত দেশগুলির শিক্ষা ব্যবস্থা যতখানি অগ্রসর বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ততখানি অগ্রসর নয়। একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, এসব উন্নত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অনুকরণ করে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করা আদৌ সম্ভবপর নয়। কেননা, আমাদের দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অথবা ভৌগোলিক অবস্থান কোনটাই ওসব দেশের সমপর্যায়ভুক্ত নয়। কাজেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কিরকম হওয়া উচিত তা শুধুমাত্র অনুমান করে বললেই চলবে না। এর জন্য প্রয়োজন একটি ব্যাপক গবেষণা কর্মসূচী।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দেশগুলো গবেষণার মাধ্যমেই তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে উন্নততর করতে সক্ষম হয়েছে। যেহেতু এসব দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সমস্যাবলীর অধিকাংশ একান্তভাবে ঐসব দেশেরই সমস্যা এদের সমাধানকল্পে কৃত গবেষণার ফলাফল আমাদের দেশে সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারেনা। আমাদের দেশের শিক্ষাবিদদের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে হবে।

আমাদের সমস্যাগুলো কেবল সংখ্যায় বিপুল বা স্বাতন্ত্র্যে ভিন্নতর নয়। আমাদের সমস্যাগুলো এমন যে এদের দ্বারা শুধু যে আমাদের শিক্ষার অগ্রগতি ব্যহত হচ্ছে তা নয় এরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পশ্চাতের দিকে টানছে। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা দিন দিন পংগু থেকে পংগুতর হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন নিরূপন, জনগণের মতামত যাচাই ও তাদের সুপারিশ গ্রহণ সম্পর্কিত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত আবশ্যক।

শিক্ষায় উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য শিক্ষার পরিবেশ, মানুষের আচার-আচরণ, ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা অনুসন্ধানের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দেশে শিক্ষা গবেষণা সবেমাত্র শুরু হয়েছে। পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রনয়নের জন্য আবশ্যকীয় গবেষণালব্ধ তথ্যের বিশেষ অভাব রয়েছে। অর্থনৈতিক কারণে প্রয়োজনীয় বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করাও অসুবিধাজনক, এদেশে শিক্ষা গবেষণার অতীত ঐতিহ্য না থাকায় গবেষণা কর্মে প্রায়ই জনগণের অসহযোগিতা লক্ষ্য করা যায়।

শিক্ষা গবেষণা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. সামাজিক অবস্থা ঃ

একটি নির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থার বৈষয়িক উৎপাদনের প্রকৃতির অনুকূলেই সেই সমাজের উপরিকাঠামোর অংগ হিসাবে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠে। আমাদের সমাজ শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ। সমাজের যে শ্রেণী বৈষয়িক উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে সেই শ্রেণীর স্বার্থানুসারেই গড়ে উঠবে শিক্ষা ব্যবস্থা। যে সমাজের আর্থ-সামাজিক কাঠামো বিকাশমান, সে সমাজের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মান ততই উন্নত। যখন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বিকাশ রুদ্ধ ও সংকটাপন্ন হয় তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা বিঘ্নিত হয়। আর এর প্রভাব শিক্ষা গবেষণার ক্ষেত্রে পড়ে থাকে। কাজেই সামাজিক অবস্থার উন্নয়নই শিক্ষা গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত আবশ্যক।

২. অর্থনৈতিক সমস্যা ঃ

অর্থনৈতিক সমস্যা শিক্ষা গবেষণার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধক। সেই জন্য গবেষক ও গবেষক বিশেষজ্ঞরা সুষ্ঠ ভাবে তাদের গবেষণার কাজকে তরান্বিত করতে পারে না।

৩. গবেষণাগারের অভাব ঃ

উন্নত মানসিকতা ও মননশীলতার বিকাশ গবেষণার মাধ্যমে প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু অর্থনৈতিক দৈন্যের কারণে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ব্যক্তি কেন্দ্রিক চিন্তার কারণে উন্নত গবেষণার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা গড়ে উঠছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক। আধুনিক এবং অত্যাধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণাগার আমাদের দেশে নেই বললেই চলে।

৪. দক্ষ গবেষক বিশেষজ্ঞের অভাব ঃ

বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলোর অন্যতম। এদেশের শিক্ষার হার ২২'৩ শতাংশ। ব্যাপক জনগোষ্ঠী শিক্ষার আলো হতে বঞ্চিত। শিক্ষা ক্ষেত্রে জড়িত নিবেদিত প্রাণ প্রকৃত জ্ঞান তাপসের সংখ্যাও অত্যন্ত নগন্য। সামাজিক অবক্ষয় ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণে দক্ষ গবেষক বিশেষজ্ঞ এদেশে জীবিকা নির্বাহ করতে অনীহা প্রকাশ করছে। ফলে বিশেষজ্ঞের অভাব দেখা দিচ্ছে।

৫. গবেষণার ক্ষেত্রে আধুনিক তথ্যাদির অভাব ঃ

বিশ্বব্যাপী উন্নত গবেষণার বিকাশের পাশাপাশি নতুন নতুন তথ্যাদি সংযোজিত হচ্ছে। এবং এইসব নব সংযোজিত তথ্যের উপর পুনঃসংযোজনের গবেষণা চলছে। কিন্তু আমাদের দেশে গবেষণার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আধুনিক তথ্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

৬. প্রকাশনা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ঃ

আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রকাশনালয়ের অভাব গবেষণার ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। গবেষক বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ

Dhaka University Institutional Repository

সাপেক্ষে যে সিদ্ধান্তে বা নূতন নূতন অনুসন্ধিৎসু তথ্যাদি শিক্ষার ক্ষেত্রে যুক্ত করেন তা প্রকাশনা ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে বা প্রকাশনা ব্যয়বহুল হওয়াতে শিক্ষা গবেষণার কাজ ব্যহত হচ্ছে। গবেষণালব্ধ পুস্তক প্রকাশনার জন্য উন্নত প্রকাশনালয় অত্যাবশ্যক। যা গবেষক ও গবেষণার কাজে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হল সত্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে যুক্তি, অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, তথ্য ও প্রমাণ নির্ভর একটা সুষ্ঠ ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

এ্যারিস্টোটলের অবরোহ পদ্ধতি এবং ফ্রান্সিস বেকনের আরোহ পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ দূর করার লক্ষ্যে চার্লস ডারউইন এই উভয় পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। এই সমন্বিত পদ্ধতি প্রয়োগ করে চার্লস ডারউইন বিভিন্ন গাছপালা, পশুপক্ষী, জীবজন্তু থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বিখ্যাত বিবর্তনের তত্ত্ব (Theory of Evolution) প্রবর্তন করেন। এই সমন্বিত পদ্ধতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সারবস্তু রয়েছে। বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধান করার ভিত্তি হচ্ছে এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। সাধারণভাবে বলা যায় গবেষণার জন্য যে পদ্ধতি অনুসন্ধান করা হয় তার নাম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। প্রত্যেক বিজ্ঞানী একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে কাজ করেন। এই পদ্ধতি সব বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে এক না হলেও এর সাধারণ নাম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে অনুসন্ধান কার্য চালান যায়, কিন্তু এটাই অনুসন্ধানের একমাত্র পদ্ধতি নয়। সমস্যা সমাধানের জন্য নানা উপায়ে যুক্তি এবং পর্যবেক্ষণ প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে গবেষণা করা হলে গবেষণা কার্য অধিকতর ধারাবাহিক, সুষ্ঠ এবং নির্ভুল হয়। এই পদ্ধতির আনুষ্ঠানিক এবং সফল প্রয়োগে কোন সমস্যার রীতিসিদ্ধ ও যুক্তি সঙ্গত সমাধান পাওয়া যেতে পারে এবং অবরোহ ও আরোহ পদ্ধতিদ্বয়ের অসুবিধাসমূহ দূরীভূত হয়।

বৈজ্ঞানিকরা পরবর্তীকালে চালর্স ডারউইন প্রবর্তিত পদ্ধতির আরও ধারাবাহিক এবং পদ্ধতিগত রূপান্তর প্রদান করেন। এইসব বিজ্ঞানীদের মধ্যে জন ডিউই (John Dewey) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধারাবাহিক ভাবে, সুষ্ঠ ভাবে এবং পদ্ধতিগত ভাবে

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যার সমাধান করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গেলে নিম্নবর্ণিত কতকগুলো সোপান অনুসরণ করতে হয়।

১। সমস্যা চিহ্নিত করণ ও সংজ্ঞা প্রদান বা সমস্যার নামকরণ
২। আনুমানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ
৩। তথ্য সংগ্রহ, বিন্যাস ও বিশ্লেষণ
৪। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে আনুমানিক সিদ্ধান্ত যাচাই করণ
৫। আনুমানিক সিদ্ধান্ত যাচাই করনের ভিত্তিতে
   ক) আনুমানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা
   খ) আনুমানিক সিদ্ধান্ত বর্জন বা
   গ) আনুমানিক সিদ্ধান্ত সংশোধন করা
৬। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ফলাফল প্রকাশ

গবেষক প্রথমেই গবেষণার উপযুক্ত একটি সমস্যা বেছে নেবেন। সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান বা উত্তর আনুমানিক ভাবে গ্রহণ করেন। একেই বলা হয় আনুমানিক সিদ্ধান্ত। আনুমানিক সিদ্ধান্ত হল গবেষকের পথ নির্দেশক। এর সাহায্যে গবেষক নির্দেশনা পাবেন কোথা থেকে, কি ধরনের এবং কি উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন, সংগৃহীত তথ্যের পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে আনুমানিক সিদ্ধান্ত যাচাই করা হয়। পরীক্ষালব্ধ তথ্যের দ্বারা আনুমানিক সিদ্ধান্ত যদি প্রমাণিত হয় তাহলে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যদি প্রমাণিত না হয় তাহলে নতুন আনুমানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আর যদি আংশিক ভাবে প্রমাণিত হয় তাহলে পূর্ব সিদ্ধান্ত সংশোধন করা হয়। এরপর গবেষক গবেষণার ফলাফল ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন।

তাহলে দেখা গেল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ৬টি সোপান বা ধারা রয়েছে। এই ধারাগুলোর মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। অনেক সময় কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করা না হলে আনুমানিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভবপর হয় না। এক্ষেত্রে সমস্যা সনাক্ত করার পর কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ ও বিশেষণ করার পর আনুমানিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায়।

গবেষণা পদ্ধতি

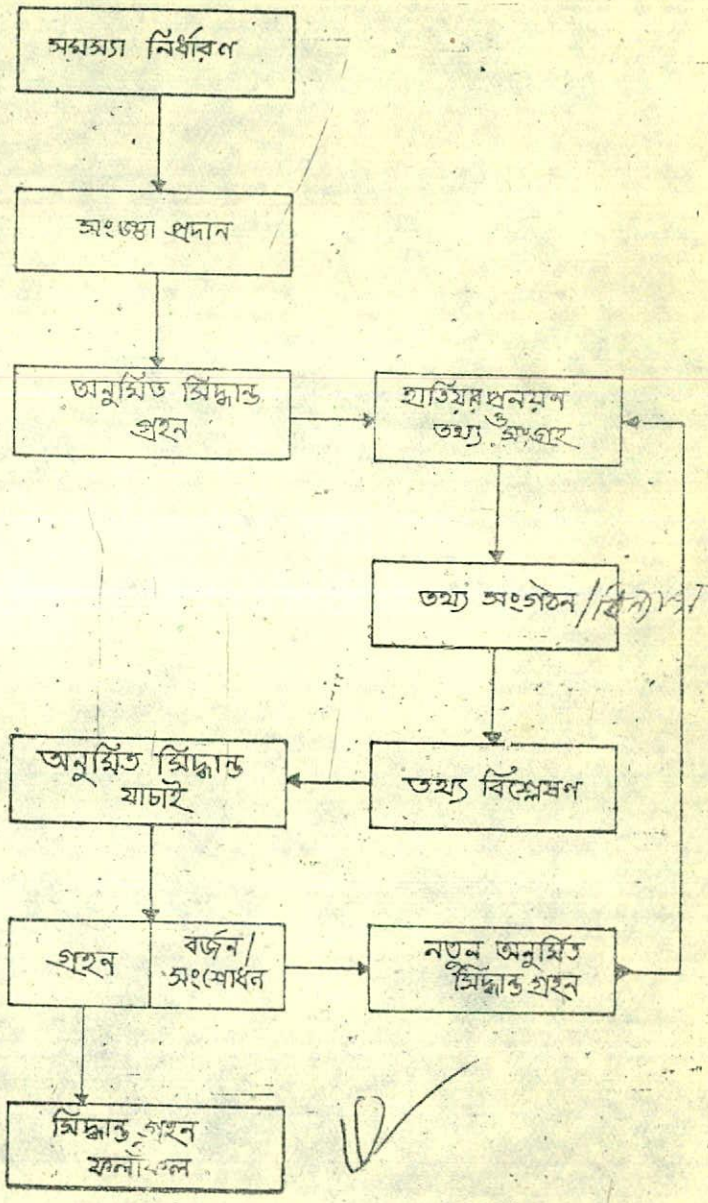

চিত্র নং-১

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা গবেষণার আধুনিক ধারা

১। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গি (The Scientific Approach):—

অতীতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণা করার তেমন কোন প্রয়াস ছিল না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং কর্তৃপক্ষের প্রণীত নিয়মাবলী ছিল সমস্যা সমাধানের এবং উন্নয়নের চাবি কাঠি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সমাজ বিজ্ঞানীরা শিক্ষাকে তাদের গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির ফলে সরকার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এক সাথে সংযুক্ত হতে বাধ্য হয়। সরকার গবেষণার গুণগত মান থেকে পরিমাণগত মানের উপর জোরারোপ করেন এবং শিক্ষাবিদরাও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর অধিক প্রাধান্য আরোপ করেন।

২। প্রয়োগবাদী বা কর্মবাদীদের দৃষ্টি-ভঙ্গি (The Functionalist Perspective):—

এদের মতামত অনুযায়ী ১৯৫০ সাল পর্যন্ত বেশীর ভাগ শিক্ষা গবেষণা একটি বিশেষ কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হয়, যাকে শিক্ষা গবেষণা কাঠামো বলা যায়। এটা সমাজের সাধারণ কাঠামোকে সহায়তা করেছে বলে মনে করা হয়।

৩। দ্বন্দ্বপূর্ণ দৃষ্টি-ভঙ্গি (The Conflict Perspective):—

বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা সমাজের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় শিক্ষা গবেষণার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। দ্বন্দ্ব পূর্ণ দৃষ্টি ভঙ্গির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়, যাতে শিক্ষা সমাজে বিরাজমান দ্বন্দ্ব বা সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে পারে।

গবেষণার প্রকৃতি ও লক্ষ্য

ক) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন জ্ঞান, নতুন তথ্য এবং নতুন সত্যের সন্ধান করার প্রচেষ্টাকে গবেষণা বলে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির যে কোন প্রয়োগকে গবেষণা বলা যায় না।

কেবল মাত্র যে সব গবেষণা দ্বারা নতুন জ্ঞান, তথ্য ও সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় তাকে বলা হয় গবেষণা।

খ) সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য যে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয় তাকে গবেষণা বলে। সত্য-উদ্‌ঘাটনের জন্য কয়েকটি বিজ্ঞান সম্মত প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রক্রিয়ার সাহায্যে যে ব্যাপকতর, ধারাবাহিক, গভীরতর এবং অধিকতর আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় তার নাম গবেষণা।

গ) "Research should always denote careful, critical and exhaustive investigation to discover new facts which will test a hypothesis, revise accepted conclusions, or contribute positive values to society in general."[1]

(গবেষণা হল সযত্ন, পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কোন নতুন সত্য আবিষ্কার, যা একটি অনুমিত সিদ্ধান্তকে যাচাই করে পুণর্বিচার করে বা পরিবর্তন করে গ্রহণ করে, যা সমাজকে ভাল মূল্যবোধ দান করতে সক্ষম।)

গবেষণা দ্বারা লব্ধ জ্ঞান দুই প্রকার, যেমন:

১) ব্যবহারিক (Practical)

২) তাত্ত্বিক (Theoretical)

সাধারণ অর্থে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, তথ্য অনুসন্ধান, পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ এই সব এক একটি প্রক্রিয়ার সঙ্গে গবেষণার কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকলেও, এদের কোনটাই গবেষণা শব্দের অর্থবহ নয় বা এর প্রতিশব্দও নয়। মূলতঃ গবেষণার জন্যই পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা, সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, তথ্য অনুসন্ধান ইত্যাদি প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়ে থাকে। এই অর্থে গবেষণা হল কতগুলো বিজ্ঞান সম্মত প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষ প্রক্রিয়া।

[1] Hildreth Hoke McAsham, Elements of Educational Research (New York: McGraw-Hill Book Company. Inc. San Francisco, 1963)' p. 4.

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ধারাবাহিক, জ্ঞান সম্পন্ন অনুসন্ধান পদ্ধতিকে সমাজের প্রয়োজনে মানব সমস্যার সমাধানে প্রয়োগ করাকে সামাজিক গবেষণা বলে।/ আর শিক্ষা গবেষণা বলতে বুঝায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে শিক্ষা-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ করে শিক্ষার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমস্যাবলী উদ্‌ঘাটন ও সুষ্ঠভাবে তার সমাধানের প্রচেষ্টা করা।

গবেষণা সব সময়ই বিজ্ঞান সম্মত নিছক ধ্যান বা কল্যাণ আশ্রয়ী নয়। গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রমাণিত না হলে সত্য বলে স্বীকৃত হয় না। তবে ধ্যান, কল্পনা, অনুমান ইত্যাদি গবেষণার প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করে থাকে।

সাধারণ মানুষ যা আপাতঃদৃষ্টিতে সত্য বলে মনে করে তাকেই চূড়ান্ত সত্য বলে ধরে নেয়। কিন্তু গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। আপাতঃদৃষ্টিতে সত্য এমন কোন তথ্যকে গবেষক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ-ইত্যাদি যুক্তি সম্মত প্রক্রিয়ার সাহায্যে নির্ভুলভাবে যাচাই করে থাকেন। উপযুক্ত প্রমাণ এবং পর্যাপ্ত তথ্য দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই সত্যের উপর গবেষক আস্থা প্রকাশ করেন না। এক্ষেত্রে মনে হয় গবেষকের কাজ এবং গুপ্ত রহস্যানুসন্ধানীর কাজ অনেকটা সমপর্যায়ের। একজন গুপ্তরহস্যানুসন্ধানী কখনও অপ্রতুল তথ্যের ভিত্তিতে এবং উপযুক্ত প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না।

গবেষণা বা গবেষকের কথা উল্লেখ-মাত্রই অনেকের মনে একটি ছবি ভেসে উঠে। মনে হয়, পৃথিবীর কারো সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে নির্জনে নিভৃতে বা বিজ্ঞান গবেষণাগারে নানারকম রাসায়নিক দ্রব্য পূর্ণ বড় বড় কাঁচের জার, বক যন্ত্র, অনুবীক্ষণ যন্ত্র ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি পরিবেষ্টিত হয়ে কাজ করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গবেষক বা গবেষণার ছবি এ ধরনের নয়। গবেষণার জন্য নিবিষ্ট চিত্তের প্রয়োজন, কিন্তু গবেষণা স্কুল, কলেজ, বিজ্ঞান গবেষণাগারে, কারখানা এবং অফিস আদালতেও চলতে পারে।

গবেষণার লক্ষ্য হল সত্যকে জানা। মানুষের জ্ঞান ভান্ডারকে

নতুন নতুন সম্ভারে সমৃদ্ধ করা। গবেষণা লব্ধ কোন জ্ঞান বা কোন সত্য চিরন্তন নয় এবং কখনই চূড়ান্ত সত্য নয়। এ গুলো সব সময়ই আপেক্ষিক এবং অস্থায়ী। একটি গবেষণার ফলাফলের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নতুন গবেষণা চলতে পারে। আরও নতুন নতুন সত্য বা পুরাতন প্রতিষ্ঠিত সত্যের নতুন দিক উদ্‌ঘাটিত এবং প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। পুরাতন সত্য বাতিল হয়ে যেতে পারে। আবার এমনও হতে পারে যে পুরাতন সত্য নতুন করে আরও দৃঢ়ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও গবেষণার সম্পর্ক

কোন কোন শিক্ষার আলোচনার ক্ষেত্রে গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এ'দুটি সমঅর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আপাতঃদৃষ্টিতে সমার্থক হলেও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। দু'টি বিষয়ের কাজই হল অনুসন্ধান করা এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার সাহায্যে সমস্যার সমাধান দেওয়া। তবে গবেষণার অর্থ ব্যাপকতর ও গভীরতর। গবেষণা এত বেশী ধারাবাহিক, আনুষ্ঠানিক এবং গভীরতর অনুসন্ধান পদ্ধতি যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একটা সিদ্ধান্তে উন্নীত হওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছাড়া সুষ্ঠ গবেষণা কার্য পরিচালনা করা যায় না তবে গবেষণা ছাড়াও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একটি (Specialized phase) বিশেষ দিক বলা যায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শুধু বৈজ্ঞানিকরা এবং গবেষকরাই ব্যবহার করেন না। অন্যান্যরাও এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন এবং বিজ্ঞান গবেষণাগার ছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ব্যবহার চলে। ঠিক তেমনি গবেষণাও শুধু ল্যাবরেটরীতে সীমাবদ্ধ থাকেনা। বর্তমানে গবেষণা কলকারখানায়, শিল্প প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ক্ষেত্র ও সামাজিক সমস্যাবলী সমাধানের ক্ষেত্রেও হয়।

গবেষণার ফলেই সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটেছে। আমরা অজ্ঞতাকে দূরে ঠেলে নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছি। সাংস্কৃতিক উন্নতির পিছনেও গবেষণার অবদান যথেষ্ট। গবেষণার ফলে আমরা উন্নততর জীবন যাপন করছি। মানুষের নানা ভোগ্য সামগ্রী, সভ্য-

DHAKA METROPOLITAN TEACHERS' TRAINING COLLEGE DATE

Dhaka University Institutional Repository

তার নানা উপাদান, জীবন ধারনের উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। উন্নত খাবার পাচ্ছি এবং দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পাচ্ছি। গবেষণার ফলাফল প্রয়োগ করে মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

মানুষ মানুষকে আরও ভাল ভাবে বুঝতে পারছে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও জাতিকে আরও ভাল ভাবে জানতে পারছে। শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণার অবদানের ফলে শিক্ষা-শিক্ষণ পদ্ধতি এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে সমঝোতার সৃষ্টি হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষা অধিকতর ফল প্রসূ ও কার্যকর এবং দীর্ঘস্থায়ী হবে তা আমরা বুঝতে পারছি। এক কথায় গবেষণার ফলেই মানব সভ্যতা আজ উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করেছে।

গবেষণা কর্মে প্রাথমিক স্তরে গবেষক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নিম্নের তিনটি স্তরের প্রতি সচেতন থাকবেন।

১। সমস্যা—গবেষকের একটি সুনির্দিষ্ট সমস্যা থাকবে যার সমাধানই হবে গবেষকের লক্ষ্য।

২। অনুমিত সিদ্ধান্ত—প্রাথমিক স্তরে লব্ধ তথ্যাদির ভিত্তিতে অথবা তথ্য সংগ্রহের পূর্বেই গবেষক একটি অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। যাতে এই অনুমিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নতুন তথ্য সংগ্রহ করা অনায়াস সাধ্য হয়।

৩। তথ্য—নির্বাচিত সমস্যা সম্পর্কীয় তথ্য যাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা একটি অনুমিত সিদ্ধান্তের সত্যতা যাচাই করা যায়।

গবেষকের কাজ হবে লব্ধ তথ্যাদির ভিত্তিতে বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্মত প্রক্রিয়া অবলম্বনে উক্ত অনুমিত সিদ্ধান্তের সত্যতা যাচাই করা। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে অনুমিত সিদ্ধান্ত সব সময় সত্য হবে এমন কোন কথা নেই। পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা তা অমূলক বা অসত্য বলেও প্রমাণিত হতে পারে।

সামাজিক অগ্রগতি ও গবেষণা

গবেষণা ও সামাজিক অগ্রগতি একে অপরের পরিপূরক। তাই সামাজিক অগ্রগতির সাথে গবেষণার অগ্রগতি অথবা গবেষণার অগ্রগতির সাথে সামাজিক উন্নয়নের সম্পর্ক রয়েছে। উন্নত সমাজের গবেষণা পদ্ধতিও উন্নত। আবার উন্নত গবেষণার ফলেই তারা সমৃদ্ধ হতে পেরেছে। তাই উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার বিকাশ হয়েছে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে। শিক্ষিত সমাজ গবেষণার চমকপ্রদ ফলাফল দেখে গবেষণার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয় এবং তারা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। এর ফলে তাদের সামগ্রিক উন্নয়ন আরও তরান্বিত হয়েছে। পক্ষান্তরে উন্নয়নশীল দেশগুলো গবেষনার মূল্য ততটা অনুধাবন করতে না পেরে এর উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করতে পারে নি। ফলে তৃতীয় বিশ্বের সামাজিক উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে কতিপয় শিক্ষাবিদের প্রচুর চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণার প্রয়োগ ঘটে। গবেষণার বিকাশ সাধনের জন্য যারা চেষ্টা চালান ও অক্লান্ত পরিশ্রম করেন তাদের মধ্যে Leipzig ও Wilhelm Wandt এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। এছাড়াও Francis Galton ও Karl Pearson রয়েছেন। Wilhelm wandt প্রথম ১৮৭৯ সালে মনোবিজ্ঞান-সম্মত গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে Francis Galton ও karl Pearson ইংল্যান্ডে পরিসংখ্যান-মূলক পদ্ধতি চালু করেন যা গবেষণার জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

গবেষণার জন্য পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাত্রদের গবেষণা ও গবেষণা কর্মে উৎসাহিত করার জন্য গবেষণাগার ও গ্রন্থাগার সমূহ ব্যবহার করতে দেন। ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফ্রান্সিস ওয়েল্যান্ড গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিকাশ-আন্দোলনের অগ্রদূত ছিলেন। আরো যারা ছিলেন তারা হলেন মিচিগান এর Henry P, Toppan ও James B, Angell. প্রাথমিক পর্যায়ে এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Charles W. Eliot, কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের Andrew Dickson White এবং কলম্বিয়ার A. P. Barnard গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিকাশে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৬৯ সালে Committee of the National Teachers' Association শুধুমাত্র গবেষণার

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন।

হারভারড, ইয়েল, কলম্বিয়া মিচিগান ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গবেষণার উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। ১৮৮৮ সালে ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৮৯০ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় যথাক্রমে G. Stanlay Hall ও William Harper এর নেতৃত্বে গবেষণার উৎকর্ষ সাধনের প্রাতিষ্ঠানিক আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। এছাড়াও Calell, Judd, Hall, Thorndike, pintuer, Terman প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয়-পন্ডিতবর্গ গবেষণার ক্ষেত্রে তাদের ছাত্রদের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, সাহায্য সহযোগিতা দান করেছেন। এভাবে বিভিন্ন জ্ঞান পিপাসু পন্ডিতদের সক্রিয় চেষ্টা ও সহযোগিতার ফলে গবেষণার বিকাশ সাধন হয়েছে এবং তা বর্তমানের উন্নত ও বৈজ্ঞানিক পর্যায়ে পৌঁছেছে।

সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা

সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে গবেষণা করা বেশ অসুবিধাজনক। পদার্থবিজ্ঞানের কঠোর নিয়ন্ত্রিত, ধারাবাহিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ফলে সামাজিক বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়। অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, সামাজিক মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সমাজ বিজ্ঞান। এসব বিষয়ের ভিত্তি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত কাজেই বিজ্ঞানের আওতাধীন। যে সব বিজ্ঞানী বিজ্ঞানকে একটি পদ্ধতি, মনোভাব, দৃষ্টি-ভঙ্গি ইত্যাদিরূপে ব্যাখ্যাদান করে থাকেন তারা সমাজ বিজ্ঞানের সব বিষয়কে বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। অনেক বিজ্ঞানী আছেন যারা এই মতের বিরোধিতা করেন এবং বিজ্ঞানের বিষয় ভিত্তিক ব্যাখ্যা দেন। তাদের যুক্তি হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সুচনাতেই পদার্থ বিজ্ঞানে বিভিন্ন শাখায় প্রয়োগ করে অনুসন্ধান কার্য চালান হয়, কাজেই

অতি প্রাচীন কাল থেকে বিজ্ঞান বলতে পদার্থ বিজ্ঞানকে বুঝাত। কেবলমাত্র বিগত শতাব্দী থেকে বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে মানব আচরণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে অনুসন্ধান করা শুরু হয়। অনুসন্ধানের এই ক্ষেত্রটি নতুন। কাজেই এর ফলাফল পদার্থ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনুসন্ধান করার ফলাফলের মতো সঠিক, গ্রহণযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য নয়। পদার্থ অপরিবর্তনশীল আর মানুষ পরিবর্তনশীল। আবার এক ব্যক্তি এবং অন্যব্যক্তির মধ্যেও আচরণে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। মানুষের পরিবর্তনশীলতার জন্যই সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা করার সঠিক ফলাফল এখনও পাওয়া সম্ভবপর হয়নি। অবাস্তব পদার্থের ক্ষেত্রে যতটা সঠিক ভাবে সার্বিকীকরণ সম্ভবপর সামাজিক জীবের ক্ষেত্রে ততটা নয়।

যদিও মানব আচরণের সুষ্ঠ নীতি প্রবর্তন করা কষ্ট সাধ্য কিন্তু অসম্ভব নয়। পদার্থ বিজ্ঞানীরা শতাব্দীর পর শতাব্দী পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে কঠোর পরিশ্রম করে গবেষণা চালিয়ে গেছেন, সমাজবিজ্ঞানীদেরও তদ্রূপ পরিশ্রম এবং সতর্কতার সংগে পরিশ্রম প্রয়োগ করে গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে। বিষয়গত এবং গুণগত তথ্যকে আরও সুষ্ঠভাবে পরিমানে প্রকাশ করতে হবে। এ বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে মানব আচরনের কারণ ও ফলাফলের অন্তর্নিহিত সম্পর্কের বিষয়ে আরও নির্ভুলভাবে জানা যাবে যা পদার্থ বিজ্ঞানের যথার্থতা এবং নির্ভুলতার মত হবে।

বর্তমানে আমরা পদার্থ বিজ্ঞানের এক অলৌকিক যুগে বাস করছি। অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মানুষ পরিত্রাণ পাচ্ছে। উল্লেখযোগ্য ভাবে মানুষের আয়ু বেড়ে গেছে। প্রকৃত পক্ষে বলা যায় বিগত শতাব্দীর মানুষের আয়ু থেকে তিন ভাগের দুই ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ এখন শব্দের চাইতে দ্রুত ভ্রমণ করছে, পুষ্টিকর এবং পর্যাপ্ত (adequate) খাবার খাচ্ছে, অতীতের মতো কায়িক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। অত্যধিক ঠান্ডা, অত্যধিক গরম বা আর্দ্রতার জন্য কষ্ট পেতে হয় না। বলতে গেলে আংগুলের ইশারায় আমোদ-প্রমোদ ভোগ করা যায়, অধিক আনন্দ

Dhaka University Institutional Repository

মুখর ও বিনোদন মুখর সময় কাটানো সম্ভবপর হচ্ছে যা মাত্র এক শতাব্দী পূর্বেও অচিন্তনীয় ছিল। পারমানবিক ক্ষেত্রে যে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তা মানুষের কল্পনাতীত ছিল। এসবই পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণার ফলশ্রুতি।

মানুষের অবাস্তব বা অপার্থিব (non-physical) ক্ষেত্রে উন্নয়ন সম্বন্ধে মানুষ সন্দিহান। পদার্থ বিজ্ঞানের অবদানের ফলে, এত সুযোগ সুবিধা-ভোগ করার পর প্রশ্ন জাগে মানুষ কি মাত্র এক শতাব্দী পূর্বের পূর্বপুরুষ থেকে অধিকতর সুখী? সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা যায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক (hot and cold war) স্নায়ুযুদ্ধ লেগেই আছে। নানা প্রকার ধ্বংসাত্মক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে দলগত কলহ-বিগ্রহ এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে।

মানুষের আচারণগত ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে অনুসন্ধান কর্ম চালানো দরকার। বিংশ শতাব্দীর মানুষের আচরণ-গত দিক উদ্‌ঘাটন করা খুবই জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনুষ্য আচরণের বিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে গবেষণা করাই একমাত্র সমাধানের পথ।

আনুষ্ঠানিক ভাবে গবেষণার প্রকারভেদ

আনুষ্ঠানিক ভাবে এবং গবেষণা কর্ম সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে গবেষণাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

১। মৌলিক গবেষণা (Fundamental Research) বা আত্বিক গবেষণা

২। ফলিত গবেষণা (Applied Research) বা কার্যকরী গবেষণা

৩। ব্যবহারিক গবেষণা (Action Research) বা প্রায়োগিক গবেষণা

১। মৌলিক গবেষণা (universal applicability and validity) ঃ

এই গবেষণার অবয়ব বা আকার পদার্থ বিজ্ঞানের ধরণ থেকে নেওয়া হয়েছে। এটা একটা কঠোর, নিয়ন্ত্রিত, ধারাবাহিক ও বিশ্লেষণ মূলক পদ্ধতি। এর সার্বজনীন প্রয়োগ ও সত্যতা যাচাই-য়ের ক্ষমতা রয়েছে। বেশীর ভাগ উন্নতমানের গবেষণা এই পদ্ধতির সাহায্যে করা হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধারাবাহিক এবং নিয়মা-নুযায়ী প্রয়োগ করে এই গবেষণা করা হয়। এর উদ্দেশ্য হল তত্ত্বের প্রসার ও বিস্তৃতি লাভ করা। সেজন্য এক্ষেত্রে নমুনায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে তথ্যবিশ্ব থেকে নমুনা দল গঠন করা হয়। এই নমুনা দল থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সার্বিকীকরণের মাধ্যমে তত্ত্বের প্রসার ঘটানো হয়। জ্ঞান আহরণই মৌলিক গবেষণার প্রধান লক্ষ্য। গবেষণা লব্ধ এই জ্ঞান বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় কিনা এবং কি প্রকারে প্রয়োগ করা যায় সে সম্পর্কে গবেষকগণ কদাচিৎ চিন্তা ভাবনা করেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান গবেষণাগারে এই গবেষণা করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতির গবেষণাকে 'Pure' বা 'Basic' গবেষণাও বলা হয়। এর ক্ষেত্র ব্যাপকতর।

উদাহরণ ঃ—নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব।

পরবর্তীকালে নতুন অনেক তত্ত্ব এই তত্ত্বের ভিত্তিতে আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন, সৌর চুল্লির ভবিষ্যৎ।

২। ফলিত গবেষণা বা প্রায়োগিক গবেষণাঃ

শিক্ষার বেশীর ভাগ গবেষণা ফলিত গবেষণা। এই গবেষণা বাস্তব কোন সমস্যা সমাধান বা কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। মৌলিক গবেষণার প্রায় সকল বৈশিষ্ট্য এতে বিদ্য-মান। তবে এর ক্ষেত্র মৌলিক গবেষণার মতো ব্যাপক নয়। মৌলিক গবেষণার মত এখানেও তথ্যবিশ্ব থেকে নমুনায়ন পদ্ধতির সাহায্যে নমুনা দল গঠন করে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে সার্বিকী করণ করা হয়। গবেষক শুধুমাত্র কোন একটি সমস্যাকে জানবার জন্যে এই গবেষণা পরিচালনা করেন না। সমস্যার আকৃতি, প্রভাব, গুরুত্ব, কার্য-কারণ সম্পর্ক ইত্যাদির বিশ্লেষণের মাধ্যমে উক্ত সম-স্যার সমাধান করে থাকেন। শিক্ষা গবেষণায় মূলতঃ শিক্ষা সংক্রান্ত

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের আচার-আচরণ মূলক তত্ত্বের উপর বিশেষ লক্ষ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণার মাধ্যমে লব্ধ ব্যবহারিক তত্ত্বের প্রসার সাধন এবং পরীক্ষা করা হয়। এই গবেষণার উদ্দেশ্য হল ঃ—

ক) কোন একটি পদ্ধতি বা পদার্থের উন্নতি সাধন করা।

খ) মৌলিক গবেষণার মাধ্যমে প্রবর্তিত তত্ত্বকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে পরীক্ষা করা ও সমস্যার সমাধান করা।

গ) শিক্ষা—শিক্ষণ পদ্ধতি এবং শিক্ষা উপকরণ সম্বন্ধে সাধারণত্বে আসার প্রচেষ্টা করা।

ঘ) সমস্যা বিশেষে বাস্তব ক্ষেত্রে তত্ত্ব প্রয়োগের কার্যকারিতা অনুধাবন করা।

ঙ) তাত্ত্বিক গবেষণার উপর ভিত্তি করে নতুন প্রযুক্তি ও দ্রব্য সৃষ্টি করা হয় যা সাধারণত বিজ্ঞান গবেষণাগারে পরিলক্ষিত হয়। যেমন— মৌলিক গবেষণার মাধ্যমে মাদাম কুরী রেডিয়াম এবং ফেরিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন। মাদাম কুরীর তেজস্ক্রীয় তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে আলফ্রেড নোবেল হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কার করেন।

৩। ব্যবহারিক গবেষণা ঃ

১৯৩০ সালের শেষের দিকে সমাজ মনোবিজ্ঞান এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহারিক গবেষণার প্রচলন ঘটে। স্টিফেন এম, কোরী এই পদ্ধতির উদ্দ্যোক্তা ছিলেন। স্কুলে, শ্রেণীকক্ষে, কমিনিউটিতে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যাবলীতে গবেষণা প্রয়োগ করে সমাধান করার ক্ষেত্রে শিক্ষক এবং গবেষক উভয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে থাকেন। এই পদ্ধতি প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষকদের দৈনন্দিন সমস্যাবলী গবেষণার মাধ্যমে সমাধান করার সুযোগ ছিল না। অন্যান্য পদ্ধতির গবেষণায় শিক্ষকরা শুধুমাত্র দর্শকের ভূমিকা পালন করতেন। শ্রেণী শিক্ষকদের শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন অবদান রাখতে হলে তা ব্যবহারিক গবেষণার মাধ্যমে সম্ভবপর।

ব্যবহারিক গবেষণার তাৎক্ষণিক, ব্যবহারিক এবং স্থানীয় প্রয়োগ ক্ষমতা রয়েছে এবং ফলাফল সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়। এই গবেষণা অধিকতর নমনীয়। প্রয়োজন অনুযায়ী এক্ষেত্রে গবেষণা পদ্ধতি এবং অনুমিত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা যায়। তত্ত্ব প্রবর্তনের ক্ষেত্রে এই গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ—

ক) স্কুলের প্রচলিত রীতিনীতির উন্নতি সাধন করা।

খ) শিক্ষকদের পেশাগত উন্নতি সাধন করা।

গ) শিক্ষকদের নানা প্রকার গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধন করা।

ঘ) চিন্তা শক্তির বিকাশ এবং দলবদ্ধ ভাবে কাজ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

ঙ) গবেষণা কার্যে দক্ষতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা বৃদ্ধি করা।

চ) শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষার নীতিমালা, শিক্ষার পদ্ধতি এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়তা করা।

ছ) একটি বিশেষ দলের উপর প্রয়োগ করা।

জ) শিক্ষার্থীদের প্রকৃত সমস্যা নির্ধারণ ও সমাধান করা।

ঝ) শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাবলী সমাধানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা।

শিক্ষকদের কেবলমাত্র ব্যবহারিক গবেষণা প্রয়োগ করে গবেষণা করলেই গবেষণা কর্ম ফলপ্রসূ হবে না। মৌলিক গবেষণা সম্বন্ধেও তাদের প্রচুর জ্ঞান থাকতে হবে। কারণ, মৌলিক গবেষণার ধারণা ব্যতীত অন্যকোন প্রকার গবেষণা করা সহজসাধ্য নয়। কোন ক্লানিগরী বিদ্যাকে পেশাগত বিদ্যা হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না, যদি সে বিদ্যা বা জ্ঞানের ভিত্তি সুষ্ঠ তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, যে তত্ত্ব মৌলিক গবেষণা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

উদাহরণ ঃ— মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিজ্ঞান শিক্ষাদানে 'আবিষ্কার পদ্ধতি' অবলম্বন ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর যৌক্তিকতা ও উপযোগিতা যাচাই।

আত্মিক, ফলিত ও ব্যবহারিক গবেষণার মধ্যে কোন মৌলিক বা পদ্ধতিগত পার্থক্য নেই। এই সব গবেষণার লক্ষ্য হচ্ছে সত্যের সন্ধান ও সমস্যার সমধান করা। পার্থক্য শুধু প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উন্নতমানের গবেষণার জন্য গবেষকের কতকগুলো বিশেষ গুণাবলী এবং গবেষণার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন।

১। নতুন জ্ঞানের সন্ধান দেওয়াই গবেষণার প্রধান বৈশিষ্ট্য। সাধারণতঃ এই নতুন জ্ঞান আহরণ করার জন্য যতদূর সম্ভব প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। গবেষণালব্ধ কোন তথ্য বা কোন লেখনীর পুনরাবৃত্তি হলে তাকে গবেষণা বলা যায় না। অর্থাৎ, একজন গবেষকের গবেষণালব্ধ কোন আবিষ্কার অন্য কারো দ্বারা পুনরায় আবিষ্কৃত বলে প্রকাশ করলে তা গবেষণা হবে না।

২। গবেষণা তত্ত্বের প্রসার ঘটায়। গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তার উপর ভিত্তি করে সার্বিকীকরণে আসা যায়। আবার কখনও কখনও সার্বিকীকরণের পরেও সিদ্ধান্তকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করলে তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। এ উদ্দেশ্যে নমুনায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমগ্র থেকে নমুনা দল বাছাই করা হয়। নমুনা দল থেকে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ ও ফলাফলের ভিত্তিতে সার্বিকীকরণ সম্ভবপর হয়। নমুনা হতে হবে প্রতিনিধিত্বমূলক যা নমুনা দলের বাইরে প্রযোজ্য হয়।

৩। গবেষণা একটি সুনিপুন, ধারাবাহিক ও সঠিক অনুসন্ধান পদ্ধতি। অতি সতর্কতার সাথে গবেষণা পদ্ধতির পরিকল্পনা করার পর গবেষককে কাজে অগ্রসর হতে হয়। গবেষকের নির্ধারিত গবেষণার কতদূর পর্যন্ত জানা হয়ে গেছে সেটা তাকে জানতে হবে। এ জানার পরবর্তী পর্যায় থেকে তার গবেষণা কার্য শুরু হবে। যাতে কোন প্রকার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। যতদূর সম্ভব সঠিকতার সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ, লিপিবদ্ধ ও বিশ্লেষণ করা হয়। প্রয়োজন বোধে তথ্য সংগ্রাহক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যেতে পারে। পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে মানবের ভুলত্রুটি এড়ানোর জন্য উন্নতমানের অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে।

৪। সংগৃহীত তথ্য এবং ব্যবহৃত পদ্ধতি যুক্তি প্রয়োগ করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর যাচাই করা প্রয়োজন। যাচাইয়ের পর প্রয়োগ

করা যেতে পারে। গবেষকের মধ্যে কোন প্রকার ভাব প্রবণতা বা পক্ষপাতিত্ব থাকলে চলবে না। তাঁকে একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি হতে হবে। গবেষককে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে গবেষণার কাজে অগ্রসর হতে হবে। যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গবেষণা কার্যে অগ্রসর হবেন সে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সর্বদা তাঁকে সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। আনুমানিক সিদ্ধান্তকে শুধুমাত্র প্রমাণ করার দিকে অবিচল না থেকে যুক্তির মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রমাণ করার দিকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

৫। গবেষণার সংগৃহীত তথ্যাদি যতদূর সম্ভব পরিমাণে বা সংখ্যায় প্রকাশ করা দরকার। অর্থাৎ গুণগত তথ্যকে যতদূর পারা যায় পরিমাণ গত ভাবে প্রকাশ করা হয়। পরিমাণ গত তথ্য অধিকতর বিশ্বাস যোগ্য, গ্রহণযোগ্য, নির্ভর যোগ্য ও সহজ বোধগম্য হয়। যেমন, ঢাকা ল্যাবরেটরী স্কুলের কোন এক বিশেষ শিক্ষাবছরে স্কুল মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল খুব সন্তোষ জনক।

এটা গুণগত তথ্য। এটাকে সংখ্যায় প্রকাশ করতে হবে। এজন্য গবেষককে জানতে হবে মোট কতজন পরীক্ষার্থী ছিল। তাদের মধ্যে কতজন প্রথম বিভাগে, কতজন দ্বিতীয় বিভাগে এবং কতজন তৃতীয় বিভাগে পাশ করেছে। এই ফলাফলকে শতকরা হিসেবে প্রকাশ করতে হবে। শতকরা ছাড়াও পরিমাণে প্রকাশ করার জন্য নানা প্রকার পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়েছে।

৬। গবেষণা সময়-সাপেক্ষ, শ্রমসাপেক্ষ ও কষ্টকর। গবেষণার জন্য অনেক সময় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন। গবেষককে ঘন্টার পর ঘন্টা অক্লান্ত পরিশ্রম করে সত্যের সন্ধান করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা জানি কোন মহৎ আবিষ্কার আকস্মিকভাবে, বিনা-শ্রমে হয় না। অনেক গবেষকের আবিষ্কারের পিছনে বহু বছরের সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার রয়েছে।

৭। গবেষণা ধৈর্য সাপেক্ষ। গবেষককে গবেষণা করার জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করতে হবে এবং অনেক কাজের গুরুদায়িত্ব বহন করতে হবে। তথ্য প্রদানকারীর কাছ থেকে কখনও কখনও সহযোগিতা লাভ করা যায় না কিম্বা এমনও হতে পারে যে উত্তর দাতা সঠিক

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর প্রদানে অনিচ্ছুক। এক্ষেত্রে গবেষককে অতি ধৈর্যসহকারে বিনয় সহকারে যতদূর পারা যায় উত্তরদাতার সহযোগিতা এবং সঠিক উত্তর লাভের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। সাধারণ মানুষের মত নয় প্রয়োজন বোধে অতি গভীর ভাবে অনুসন্ধান করে এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তথ্য সন্ধান করতে হবে।

৮। গবেষককে একজন সাহসী ব্যক্তি হতে হবে। কোন গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করতে গিয়ে বা কোন সত্যকে প্রচার করতে যদি গবেষককে অপ্রিয়, বা তাঁর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় বা মৃত্যু-বরণ করতে হয়, এই ধরনের অবস্থার মোকাবিলা করবার জন্য তাঁর প্রচুর সাহসের প্রয়োজন হবে। কোন অবস্থাতেই সত্য প্রচার থেকে বিরত থাকবেন না। প্রাচীন কালে সত্য প্রচার করতে গিয়ে কোপার-নিকাস ও সক্রেটিসের মতো অনেক গবেষককে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

৯। গবেষণার তথ্যাদি অতি সতর্কতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং প্রতিবেদন লিখতে হবে। সংগৃহীত তথ্যকে সতর্কতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করতে হবে। যে সকল শব্দ ভুল বিশ্লেষিত হতে পারে সেগুলোর ব্যাখ্যা, ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতির বিশদ ভাবে বর্ণনা, যে সমস্ত বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা থাকে সেগু-লোর এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উল্লেখ করে অতি সতর্কতার সঙ্গে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা এবং ভুল ভ্রান্তির দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন।

১০। গবেষককে কল্পনাশক্তি ও সৃজনীশক্তির অধিকারী এবং নিঃস্বার্থ হতে হবে। সৃজনশীল এবং কল্পনা শক্তির অধিকারী না হলে মার্জিত ভাষায় উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে গবেষণার প্রতিবেদন লেখা যায় না। গবেষক সর্বদা বৃহৎ জনগোষ্ঠি ও দেশের মঙ্গলের জন্য গবেষণা করে থাকেন, নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নয়।

১১। গবেষককে অবশ্যই একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হতে হবে। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিশেষ শাখায় যিনি বিশেষজ্ঞ এবং আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রে যার মোটামুটি দখল দখল আছে তিনিই জ্ঞানী, আর এই জ্ঞানী ব্যক্তি গবেষণা বা সাধনা করে যখন তার নিজের জ্ঞানের বিশেষ ক্ষেত্র বা পরিধিকে আরও বাড়িয়ে দেন তখনই তিনি হবেন গবেষক।

জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা

চিত্র নং-২

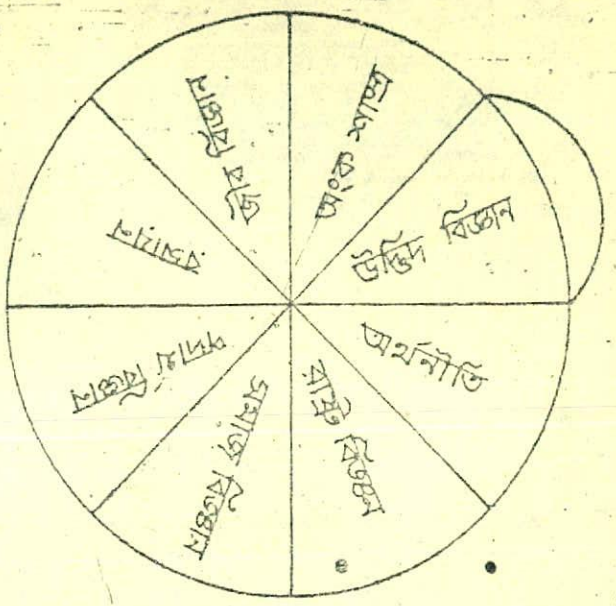

১২। গবেষণা সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান দেয়। যে কোন সমস্যার সুষ্ঠ সমাধানের জন্য গবেষণা করা দরকার। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি যে কোন প্রকার সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান কেবল-মাত্র ধারাবাহিকভাবে ও উদ্দেশ্য পূর্ণ ভাবে গবেষণার মাধ্যমে সম্ভব-পর। গবেষণার প্রধান লক্ষ্য জ্ঞানের পরিধি প্রসার করা। এই জ্ঞান বাস্তব সমস্যার সমাধানেও আহরণ করা যেতে পারে।

১৩। গবেষণার জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনার প্রয়োজন। পরিকল্পনা হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে গবেষণা করার ধারাবাহিক নকশা। পরিকল্পনাকে গবেষণার ভিত্তিও বলা চলে। গবেষক এবং উপদেষ্টা উভয়ের জন্য এই পরিকল্পনা অত্যন্ত সহায়ক। গবেষক

METROPOLITON TEACHERS' TRAINING COLLEGE, DHAKA DATE

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনা অনুযায়ী গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিন্যাস ও বিশ্লেষণ করে থাকেন এবং উপদেষ্টা পরিকল্পনা অনুযায়ী গবেষককে নির্দেশ ও পরামর্শ দান করেন।

১৪। গবেষণা ব্যয় বহুল। গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত অর্থের প্রয়োজন। একটি গবেষণা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং সুদক্ষ গবেষক দ্বারা পরিচালিত হলে গবেষণার আকাঙ্খিত ফলাফল লাভ করা যায়। এ ধরনের বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা এবং গবেষণার বিভিন্ন উপকরণ প্রয়োগের মাধ্যমে সুচারুরূপে ও ধারাবাহিক ভাবে গবেষণা কার্য পরিচালনা করা ব্যয় সাপেক্ষ। গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করার পর পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে গবেষণার প্রয়োগ বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় এবং এই ব্যয় বহুল কার্যটি সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন জাতীয়, বৈদেশিক, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহ আর্থিক সাহায্য দানের জন্য অগ্রসর হয়ে থাকে।

১৫। গবেষণা মানব কল্যাণে প্রভূত অবদান রাখে। গবেষণা কার্যদ্বারা অল্প অল্প করে জ্ঞান আহরণ করে মানব কল্যাণ সাধনে অবদান রাখে। এখানে গবেষককে পিপিলিকার সংঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ছোট্ট একটি পিপিলিকা মুখে করে অল্প অল্প খাদ্য আহরণ করে একটি ঢিবি তৈরী করে যেখানে পুরো শীতের জন্য সঞ্চয় করে রাখা হয়।

১৬। বেশীর ভাগ উন্নত মানের গবেষণা দলবদ্ধ ভাবে হয়ে থাকে। কোন একটি সমস্যাকে দলবদ্ধ ভাবে সমাধান করার প্রচেষ্টা চালালে এবং দলের প্রতিটি সদস্যের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সমস্যার সমাধানে প্রয়োগ করলে সে সমাধান অধিকতর ফলপ্রসূ হয়। বড় আবিষ্কার কখনও একাকী সম্ভবপর নয়। বহুব্যক্তির দীর্ঘদিনের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে এটি সম্ভবপর।

১৭। মহৎ আবিষ্কার কখনও আকস্মিক ভাবে হয় না। যে কোন আবিষ্কারের জন্য প্রচুর সাধনা, একাগ্রতা, ও প্রস্তুতির প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে Pastenr বলেছেন, 'chance favours the prepared mind' সুযোগ গ্রহণ করার জন্য যে ব্যক্তি মনকে প্রস্তুত করেছে তার কাছেই সুযোগ আসে।

১৮। গবেষককে একজন বিশেষজ্ঞ হতে হবে। যে বিষয়ে গবেষক

গবেষণা করবেন সে বিষয়ে তাঁর প্রচুর জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। একজন সাধারণ ব্যক্তি হলে তাঁকে চলবে না।

১৯। গবেষণার কাজ শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহ করা ও লিপিবদ্ধ করা নয়। চিহ্নিত সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে আনুমানিক সিদ্ধান্ত গঠন, সংগৃহীত তথ্যের বিন্যাস ও বিশ্লেষণ করার মতো কাজ রয়েছে। সমস্যার সমাধানে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে যুক্তি প্রয়োগ প্রয়োজন।

২০। গবেষককে একজন ব্যুৎপত্তিশীল ব্যক্তি হতে হবে। গবেষণার বিষয়ে তাঁকে পূর্বাপর যথেষ্ট জ্ঞান রাখতে হবে। গবেষণার মাধ্যমে যেমন নতুন জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায় তেমনি এর মাধ্যমে প্রচলিত বিধিব্যবস্থার উন্নয়ন ও পরিবর্তন সাধন করা যায়। এজন্য তাকে একজন দার্শনিকের দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে সত্য ও অসত্যের তুলনামূলক বিচারে সত্য প্রকাশ করবার মানসিক সৎসাহস রাখতে হবে। প্রচলিত নিয়ম-ব্যবস্থাকে সম্মুখে এগিয়ে নেওয়া এর উদ্দেশ্য নয়। বস্তুতঃ প্রচলিত নিয়ম ব্যবস্থার উন্নয়নই এর লক্ষ্য।

অনুমিত সিদ্ধান্ত (Hypothesis)

অনুমিত সিদ্ধান্ত বা 'হাইপোথিসিস' হল একটি আনুমানিক উক্তি, দুই বা তার অধিক চলের মধ্যে সম্পর্কের পরীক্ষা-মূলক প্রতিজ্ঞা। গবেষণার জন্য বিজ্ঞানীদের প্রধান যন্ত্র হল অনুমিত সিদ্ধান্ত। উদ্ভূত কোন সমস্যা সম্পর্কে প্রাথমিক ভাবে যে সুভাব্য বা পরীক্ষামূলক উত্তর বা সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় তাকে অনুমিত সিদ্ধান্ত বা 'hypothesis' বলা হয়। অথবা কোন গবেষণা কর্ম শুরু করার প্রাক্কালে গবেষণার বিষয়বস্তু বা সমস্যার ফলাফল সম্পর্কে বা কারণ সম্পর্কে যে অনুমিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাকে 'হাইপোথিসিস' বলা যায়। সাধারণ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে অনুমিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইংরেজীতে একটি কথা আছে, 'Believe in unseen is the precondition of seeking truth' অর্থাৎ সত্যানুসন্ধানের অত্যাবশ্যক পূর্বশর্ত হল অদৃশ্যে বিশ্বাস। তাই সাধারণ জ্ঞান বা অনুমানকে আশ্রয় করেই অনুমিত সিদ্ধান্ত

Dhaka University Institutional Repository

রূপলাভ করে। গবেষণার জন্য এটা অতি প্রয়োজনীয় এবং গবেষণাকে নিম্নলিখিত ভাবে সাহায্য করে থাকে :—

ক) সমস্যা ব্যাখ্যা করে, ফলে সমস্যার প্রকৃতি বুঝা যায়।

খ) সম্ভাব্য সমাধানের পথ পাওয়া যায়।

গ) অনুসন্ধান কার্যের অন্তঃর্নিহিত যুক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

ঘ) তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস সম্পর্কে দিক নির্দেশনা লাভ করা যায়।

ঙ) একটি নীতি সংঘটক হিসেবে কাজ করে।

চ) গবেষণার ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধতা দান করে।

একটি উপযুক্ত ও ভাল সিদ্ধান্তের কতিপয় বৈশিষ্ট আছে যার উপর নির্ভর করে অনুমিত সিদ্ধান্ত গঠন করা যেতে পারে।

১। যুক্তিসংগত হওয়া।

২। কোন একটি তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া।

৩। এমনভাবে গৃহীত হওয়া দরকার যাতে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রকৃত দিক নির্দেশনা লাভ করা যায়।

৪। প্রচলিত ঘটনাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ হওয়া।

৫। সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করা।

৬। বর্ণনা এমন হবে যাতে সহজেই এর সত্যতা যাচাই করা যায়।

৭। বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত এবং সুনির্দিষ্ট হওয়া।

অনুমিত সিদ্ধান্ত সাধারণতঃ দুই প্রকার হয়ে থাকে, যথা—

ক) হাঁ সূচক বা বর্ণনামূলক (Positive or Literary)

যেমন, "স্কুলে ক্রীড়াবিদদের শিক্ষা সফলতা, যারা ক্রীড়াবিদ নয় তাদের চেয়ে ভাল।"

খ) না সূচক বা নাস্তি (Null or Negative)

যেমন, "ক্রীড়াবিদ এবং যারা ক্রীড়াবিদ নয় তাদের মধ্যে স্কুলে শিক্ষাগত সফলতায় কোন বিশেষ পার্থক্য নেই।"

অনুমিত সিদ্ধান্তের পরীক্ষা (Hypothesis testing)

এই কল্পিত সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য বা যথার্থতা নির্ণয় করার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ, বিন্যাস ও বিশ্লেষণ করে ফলাফল প্রকাশ করার পর ফলাফলের সাথে অনুমিত সিদ্ধান্তের তুলনা করা হয়। অনুমিত সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করার দু'টো পদ্ধতি রয়েছে। একটি প্রত্যক্ষ পদ্ধতি এবং অপরটি পরোক্ষ পদ্ধতি।

মূর্ত ও প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণযোগ্য সমস্যার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। যেমন, ভূ-পৃষ্ঠের একই স্থানে কত ঘন্টা অন্তর জোয়ার-ভাটা হয় অথবা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া মহাদেশে মৌসুমী বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয় কেন? এসবের উত্তর খোঁজার জন্য সরাসরি পর্যবেক্ষণ সম্ভব। সুতরাং এখানে বিকল্প পদ্ধতির প্রয়োজন পড়ে না। আরো একটি উদাহরণস্বরূপ বলা যায় —একটি বৈদ্যুতিক বাতির সুইচ টিপে দেখা গেল বাতিটি জ্বলছে না, এর জন্য বিভিন্ন প্রকার অনুমিত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, যেমন—

ক, বিদ্যুৎ নেই।

খ, বিদ্যুৎ-তারের সাথে বাল্বের সংযোগ ঠিক হয়নি।

গ, বাল্বটি খারাপ বা জ্বলে গেছে।

ঘ, 'ফিউজ' জ্বলে গেছে।

এই অনুমিত সিদ্ধান্তগুলোর প্রত্যেকটিকে পর্যায়ক্রমে, যেমন অন্য বাতি জেলে, বিদ্যুৎ সংযোগ পরীক্ষা করে, বাল্ব পরিবর্তন করে বা ফিউজ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা সম্ভব। এখানেও দেখা গেল যে কোন কোন অনুমিত সিদ্ধান্ত সরাসরি প্রমাণ করা যায়।

অন্যদিকে বিমূর্ত (abstract) বিষয় সম্বলিত সমস্যার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। সুতরাং, এ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না বলে বিকল্প পদ্ধতির অনুসরণ করতে হয়। সমস্যার কারণ অনুধাবনের জন্য আনুষঙ্গিক ও নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বা পরিবেশ সৃষ্টি করে সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যায় এবং কল্পিত সিদ্ধান্তের যথার্থতা নিরূপণ করা যায়। যেমন, পুষ্টি ও বুদ্ধ্যাংকের মধ্যে ধণাত্মক সম্পর্ক আছে কিনা নির্ণয় করতে হবে। এখানে অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল—পুষ্টি ও বুদ্ধ্যাংকের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্ক আছে। এটি হল হাঁ সূচক অনুমান (Positive hypothesis)। অথবা পুষ্টি ও বুদ্ধাংকের মধ্যে সম্পর্ক নাই অর্থাৎ না সূচক বা নাস্তি অনুমান বা কল্পনা (Negative hypothesis)। বুদ্ধাংক প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণযোগ্য নয়। কাজেই সংশ্লিষ্ট সাক্ষ্য লাভের জন্য দুইজন অভিন্ন যমজ শিশুর একজনকে ধনাঢ্য পরিবেশে রাখা যায় এবং অন্যজনকে দরিদ্র পরিবেশে রাখা হল। পাঁচ-সাত বছর পরে এদের বুদ্ধাংকের পার্থক্য দেখা দিলে ফলাফলকে প্রথম অনুমিত সিদ্ধান্তের সাথে সংগতিপূর্ণ বলা যায়। আর পার্থক্য না থাকলে দ্বিতীয় অনুমিত সিদ্ধান্তের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে। সাধারণতঃ এভাবে অনুমিত সিদ্ধান্ত পরীক্ষিত হয়ে থাকে। সম্প্রতিকালে আমেরিকার কতিপয় মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানী দক্ষিণ কোরীয় শিশুদের নিয়ে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে পুষ্টির সাথে শিশুর বুদ্ধাংকের ধনাত্মক অনুবন্ধন রয়েছে। অর্থাৎ, পুষ্টি বুদ্ধাংক বাড়ায়, পুষ্টিহীনতা বুদ্ধাংকের হ্রাস ঘটায়।

আচরণগত গবেষণার ক্ষেত্রেও অনেক অনুমিত সিদ্ধান্তকে সরাসরি প্রমাণ করা সম্ভব নয়। যেহেতু এরা বহু নিরপেক্ষ বিষয় হতে পারে তাই এই অনুমিত সিদ্ধান্তগুলিকে বিকল্পভাবে পরীক্ষা করতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে গবেষককে অবশ্যই এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে যতদূর সম্ভব সরাসরি পরীক্ষার মত ফল পাওয়া যায়। এই ব্যবস্থা অনুমিত সিদ্ধান্তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে এবং এখান থেকে গবেষক যুক্তি নির্ভর ফল অনুমিত সিদ্ধান্তের জন্য নির্ণয় করতে পারেন। অর্থাৎ যদি ফল সত্য হয় গবেষক কোন একটি আচরণের সামঞ্জস্য ধরে নেবেন বা মিথ্যা হলে আচরণের অসামঞ্জস্য ধরে নেবেন।

সাধারণতঃ গবেষণার সমস্যা চিহ্নিত করার পর গবেষক অনুমিত সিদ্ধান্ত স্থির করেন। তবে কোন কোন সমস্যার অনুমিত সিদ্ধান্ত গঠন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ ধরণের সমস্যার জন্য অনুমিত সিদ্ধান্ত স্থির করার পূর্বেই কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এই সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণের পর যে ফলাফল পাওয়া যায় তার পরিপ্রেক্ষিতে অনুমিত সিদ্ধান্ত গঠন করা যেতে পারে। তবে পক্ষপাতিত্ব এবং ভাবপ্রবণতা এড়ানোর জন্য তথ্য সংগ্রহের পূর্বে অনু-

মিত সিদ্ধান্ত গঠন করা শ্রেয়।

কোন অবস্থা বা কোন উপাদানের বৈশিষ্ট্য যা গবেষক পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ, লক্ষ্য ও পরিমাপ করেন এবং নিয়ন্ত্রনাধীনে রাখেন তাকে চল বলা হয়। চল দুই প্রকার। যেমন, স্বাধীন, নিরপেক্ষ বা আত্মনির্ভরশীল চল ও নির্ভরশীল বা অপেক্ষ চল।

পরীক্ষক যে উপাদান, শর্ত বা অবস্থাকে নিজের প্রয়োজন অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করেন তাকে নিরপেক্ষ বা আত্মনির্ভরশীল চল বলা হয়। অর্থাৎ কোন পরিলক্ষিত ঘটনাবলী (Observed phenomena) উপাদান সমূহের অন্তর্নিহিত সম্পর্কাবলী নির্ধারণ করার জন্য গবেষক যে সব উপাদান বা শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করেন সেগুলো হল নিরপেক্ষ বা আত্মনির্ভরশীল চল। নিরপেক্ষ বা আত্মনির্ভরশীল চলের পরিবর্তনের ফলে অবস্থা বা আচরণের যে পরিবর্তন দেখা যায় তাকে অপেক্ষ বা নির্ভরশীল চল বলে। দুই বা ততোধিক চলের মধ্যকার সম্ভাব্য সম্পর্ক অনুমিত সিদ্ধান্তে বর্ণনা করা হয় এবং তা প্রমাণ সাপেক্ষ হওয়া দরকার।

শিক্ষা গবেষণার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ চল হল শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষা উপকরণ এবং কোন পুরস্কার। আর অপেক্ষ চল হল একটি পরীক্ষার নম্বর এবং ভুল ভ্রান্তির সংখ্যা ইত্যাদি। কাজেই নির্ভরশীল উপাদান হল শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানের উপর অনির্ভরশীল চলের বিস্তারিত প্রভাব। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে স্বাধীন চলের প্রভাবই বেশী।

তাৎপর্য পরিমাপক দন্ড (The level of significance)

'না' সূচক অনুমিত নিদ্ধান্ত (Null hypothesis) অর্থাৎ কোন অনুমিত সিদ্ধান্তের দুইটি চলের পরিবর্তনের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য একটি মানদন্ড বা নির্ণায়ক (criterion) রয়েছে। এটাকেই বলা হয় তাৎপর্য পরিমাপক দন্ড (level of significance)। মনোবিজ্ঞানে এবং শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণায় শতকরা ৫ ভুলের জন্য তাৎপর্য পরিমাপক দন্ড ধরা হয়

Dhaka University Institutional Repository

·০৫। অর্থাৎ পরীক্ষণীয় দল এবং নিয়ন্ত্রিত দলের পরীক্ষা চালানোর সময় বিভিন্ন কারণে শতকরা ৫ ভাগ ভুল হতে পারে। 'না' সূচক অনুমিত সিদ্ধান্তের 'level of significance' ·০৫ এর জন্য টেবিলে একটি মান দেওয়া থাকে। যদি নির্ণয়কৃত মান টেবিলে দেওয়া মানের সমান বা বড় হয় তাহলে 'না' সূচক অনুমিত সিদ্ধান্তকে বাতিল বলে গণ্য করা হয়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে দুইটি দলের মধ্যে চলের পার্থক্যের জন্য ক্রিয়াকলাপের পার্থক্য হয়।

তথ্য (Data)

কোন সমস্যার সমাধান করা, কোন প্রকার গবেষণা কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা এবং অনুমিত সিদ্ধান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। এই তথ্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা যায়। প্রাথমিক উৎস থেকে প্রত্যক্ষ বা সরাসরিভাবে অথবা মাধ্যমিক উৎস থেকে পরোক্ষভাবে বা বই পুস্তকের মাধ্যমে। অর্থাৎ যে সমস্ত তথ্যের ক্ষেত্রে প্রদানকারী সংস্থা নিজেরাই সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ও যে তথ্য সম্পূর্ণ মৌলিক তাকে মূল বা প্রাথমিক তথ্য বলা হয়, যথা- আদমশুমারী কর্তৃপক্ষ প্রকাশিত বিবরণী এবং যে সমস্ত তথ্য পূর্বে প্রকাশিত কোন মূল তথ্য থেকে সংগৃহীত হয় সেগুলোকে মূলজ বা মাধ্যমিক তথ্য বলা হয়। সাধারণতঃ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, পুস্তক ইত্যাদির মধ্যে এই ধরনের তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

সংগৃহীত তথ্য পরিমাণগত ও গুণগত এই দুই প্রকারের হতে পারে। পরিমাণগত তথ্য দ্বারা কোন কিছুর পরিমাণ বুঝায়। যেমন-- কোন একজন ছাত্রের বয়স ১৬ বছর, ছাত্রীর উচ্চতা ৫ ফুট ইত্যাদি। গুণগত তথ্য দ্বারা তথ্যের বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট বুঝায়, যেমন-- উন্নয়নশীল দেশ, শিক্ষিত জনগোষ্ঠী, উন্নত সমাজ--ইত্যাদি সংগৃহীত তথ্যকে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য পরিমাণে (quantification of data) প্রকাশ করা একান্ত প্রয়োজন। পরিসংখ্যান মূলক নানা পদ্ধতি প্রয়োগ করে পরিমাণে প্রকাশ করা যায়। সাধারণতঃ শতকরা, রেটিং স্কেল, স্কোর কার্ড, মেধা ভিত্তিক স্থান অনুযায়ী ও সংখ্যার সাহায্যে পরিমাণে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

তথ্য সঞ্চালন শৃংখল (Information transfer chain)

নতুন বিজ্ঞান-জ্ঞান সৃষ্টি; অন্যান্য বিজ্ঞানীদের কাছে এর প্রচার এবং এর ব্যবহার দ্বারা অতিরিক্ত জ্ঞানের সৃষ্টিকে একটি চক্রের (cycle) মাধ্যমে দেখানো যায়। এই চক্রটিকে বলা হয় তথ্য সঞ্চালন শৃংখল বা Information transfer chain। এর মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় তথ্যের চক্রিক চলা ফেরা ও ব্যাখ্যা করা হয়। এই শৃংখল এর সংযুক্ত স্তরগুলো নিম্নরূপ ঃ--

১। একজন বিজ্ঞানী বা একদল বিজ্ঞানী নতুন তথ্য সৃষ্টি করেন বা আবিষ্কার করেন।

২। নতুন তথ্য রেকর্ড করা হয় এবং বন্টিত হয় ছাপানো আকারে।

৩। তথ্যগুলো কোন প্রকাশনায় তালিকাভুক্ত হয়।

৪। তথ্যগুলো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় প্রকাশনায় গ্রন্থাগারের ন্যায় সংরক্ষণাগারে সংগৃহীত হয়।

৫। সংরক্ষিত তথ্য একজন বিজ্ঞানী অথবা একদল বিজ্ঞানী কর্তৃক বিক্ষিপ্ত হয় ও নতুন তথ্য ও তত্ত্ব সৃষ্টির জন্য কাজে লাগানো হয়।

৬। নতুন তথ্য সৃষ্টি হয় এবং নতুন চক্র শুরু হয়।

সার্বিকীকরণ (Generalization)

কোন কোন গবেষণার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ শ্রেণীর সকল ব্যক্তি বর্গকে বা সকল ঘটনাকে পরীক্ষণের জন্য ব্যবহার করা যায় না। এজন্য সাধারণতঃ একটি ছোট দলে (sample group) পরীক্ষণ কার্য পরিচালনা করে প্রাপ্ত ফলাফল পরীক্ষিত দলের বাইরে একটি বিশেষ শ্রেণীর জনসংখ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই প্রকারে ছোট বা নমুনা দল থেকে প্রাপ্ত গবেষণার ফলাফলকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাকে সার্বিকীকরণ বা generalization বলা হয়। উল্লেখ্য যে, নমুনা দলটি যেন সমগ্র দলের যথার্থ প্রতিনিধি স্বরূপ হয়। অর্থাৎ পরিবেশ, শিক্ষার মান, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি সকল দিক থেকে বৃহত্তর দলটিতে যত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন আছে তাদের সকলেই যেন যথাযথ

Dhaka University Institutional Repository

অনুপাতে এই নমুনা দলটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রক্রিয়াটি যতই নিখুঁত হয় নমুনাদলটি ততই প্রতিনিধিত্ব-মূলক হয় এবং সার্বিকীকরণ নির্ভুল হয়।

তত্ত্বের ভূমিকা (Role of Theory)

অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে স্পষ্টতঃই পরিদৃষ্ট হবে সৃষ্টির শাশ্বত শৃংখলাবদ্ধতা ও নিয়মনিষ্ঠা। এই বিশাল মহাবিশ্বের ক্রিয়াকর্মের পশ্চাতে যে বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম ও জটিল কার্য-কারণ সম্পর্কিত পদ্ধতি বিদ্যমান তার গূঢ় রহস্য বের করাই জ্ঞান সাধনার মৌল প্রতিপাদ্য। মানুষ সাধনা করে যাচ্ছে অহরহ। সাধনার সার্থক ফলশ্রুতিই তত্ত্ব যা পরবর্তী জ্ঞান সাধনার ও অগ্রগতিতে সহায়ক বা মুখ্য দিশারী।

এখানে স্বতঃস্ফূর্ত প্রশ্ন হল তত্ত্ব কি ? তত্ত্ব সম্পর্কে অধিকাংশ লোকের যে ধারণা তা ভ্রমাত্মক। অনেকে তত্ত্বকে অলীক বলে মনে করে থাকে। তত্ত্ব সম্পর্কিত ভ্রমাত্মক লৌকিক ধারণার অর্থ দাঁড়ায়--তত্ত্ব হল অবাস্তব বা ধরা ছোঁয়ার বাইরে কোন কিছু অর্থাৎ জ্ঞান-কথা বিশেষ। কিন্তু এ ধারণা ছিল প্রথাসিদ্ধ অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস নির্ভর। প্রকৃত পক্ষে তত্ত্ব অলীক নয় বরং বাস্তব। বৈজ্ঞানিক যুগের প্রারম্ভে তত্ত্ব ছিল কল্পনাশ্রয়ী ও অবাস্তব। অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত না। বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এটা প্রতীয়মান হল যে তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এবং তত্ত্ব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের উপর নির্ভরশীল। আসলে তত্ত্ব বলতে বুঝায়--সৃষ্টি রহস্যের ঘট-নের কার্য-কারণ সম্পর্কের ব্যাখ্যা। তত্ত্ব কোন দৃশ্যমান বস্তুকে (phenomena) ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন চলের মধ্যে যে সকল কারণ সমূহের ফলাফল নির্ভরশীল তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে। অনেক সময় দেখা গেছে যারা গবেষণার মাধ্যমে নতুন তত্ত্ব আবিষ্কারের প্রচেষ্টা করেন তারা তত্ত্বের প্রকৃত ব্যবহারের প্রতি সচেতন থাকেন না। কোন একটি প্রবর্তিত তত্ত্বের অসংখ্য প্রায়োগিক মূল্য থাকতে পারে। তাই এক সময় জন ডিউই বলেছিলেন একটি ভাল তত্ত্বের চেয়ে অধিক ব্যবহার্য আর কিছু

METROPOLITON TEACHERS TRAINING COLLEGE DHAKA DATE.....

অতীত অভিজ্ঞতা, প্রচুর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা পরীক্ষণের পর একটি তত্ত্ব (Theory) প্রবর্তন করা যায়। অতীতের মতো বর্তমান যুগেও কোন তত্ত্বকে চূড়ান্ত বলে ধরে নেওয়া হয় না। বর্তমানে এটাই প্রতীয়মান হয় যে নতুন জ্ঞান সংযোজনের সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বেও পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে, সভ্যতার অগ্রগতির প্রতি ধাপে, আমাদের দৈনন্দিন কাজে তত্ত্বের ভূমিকা যথেষ্ট। যেমন, ঠান্ডা লাগলে সর্দি হয়, ময়দায় ঘামির দিলে পাউরুটি ফুলে, ধনাত্মক--ঋনাত্মক দিকের সংযোগে বিদ্যুৎ সার্কিট পূর্ণ হয় ইত্যাদি আমরা তত্ত্ব থেকে জেনে তারপর প্রয়োগ করি।

গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে যদি তত্ত্বের সঙ্গে একত্রিত করে দেখা যায় তাহলে এই জ্ঞানকে অধিকতর অর্থপূর্ণ করে তোলা হয়। পরবর্তী জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে বিচরণ করতে তত্ত্ব সাহায্য করে এবং গবেষণা ও নতুন জ্ঞান সন্ধান তৎপরতাকে ত্বরান্বিত করে। তত্ত্ব গবেষণা কর্মে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা করতে গবেষককে উৎসাহিত এবং প্ররোচিত করে। তত্ত্ব ও গবেষণা একে অন্যের পরিপূরক। গবেষণা দ্বারা যে সিদ্ধান্তে আসা হয় তার উপর ভিত্তি করে সার্বিকীকরণ সম্ভবপর হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সার্বিকীকরণের পরেও সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং তত্ত্বের প্রবর্তন সম্ভবপর হয়। তত্ত্ব প্রবর্তনের জন্য গবেষণার ক্ষেত্র হবে ব্যাপক, বিশাল এবং বাছাইকৃত নমুনা দল হবে যথার্থ প্রতিনিধিত্বমূলক। তত্ত্ব গঠনের জন্য পরিকল্পিতভাবে গবেষণা কার্য পরিচালিত করা হয়। কখনও কখনও গবেষণার ফলাফল আকস্মিক ভাবে তত্ত্ব প্রবর্তনে সহায়তা করে। আবার প্রচলিত তত্ত্ব গবেষণার মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নতুন তত্ত্ব প্রবর্তন করা হয়। যাচাইয়ের মাধ্যমে তা বাতিল বা পরিবর্তন করার প্রয়োজনও হতে পারে। গবেষণার মাধ্যমে সব তত্ত্বের সত্যতা যাচাই করা সব সময় সম্ভবপর নয় বলে তত্ত্ব প্রবর্তনে গবেষণার অবদান অনস্বীকার্য।

পৃথিবীর অবস্থান এবং আকাশের অন্যান্য ঘূর্ণায়মান বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক জনিত তত্ত্বের ফলেই আকাশযান নিক্ষেপ এবং ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। মহাকাশ গবেষণা ক্ষেত্রে তত্ত্বের ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

অনন্য। পূর্ববর্তী তত্ত্ব থেকে জ্ঞান ও ধারণা না নিয়ে পরবর্তী 'মহাকাশ গবেষণা' করা অসম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, মহাশূন্যে রকেট বা উপগ্রহ নিক্ষেপ করতে হলে এবং তাকে কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত রাখতে হলে প্রতি সেকেন্ডে তাকে ৭ মাইল বেগে নিক্ষেপ করতে হবে। মহাকাশ যান (space air craft) উৎক্ষেপণের জন্য এটা জানা আবশ্যক। গ্যাসীয় আচরণের তত্ত্বের জন্য 'রিফ্রিজারেটর' এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। বস্তুর ভর-বেগ এবং আনবিক গঠন জানা না থাকলে আনবিক শক্তি তৈরী করা সম্ভব হত না। তাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মৌলিক বিষয় হচ্ছে আগাম চিন্তা। কোন তত্ত্বের আবিষ্কার ভবিষ্যতে সর্বোচ্চ সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে।

বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্যই হল তত্ত্বের প্রবর্তন করা। প্রগতি এবং সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ হচ্ছে বিজ্ঞানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। অন্য কথায়, বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার অন্য পুরানো আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রেও উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়া (bacteria) যা রোগের সৃষ্টি করে তার আবিষ্কার সম্ভবপর হয় নাই। কাজেই বিজ্ঞানীর জন্য পূর্ববর্তী তথ্য সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

উপসংহারে বলা যায়--বাস্তব জীবন ও জগতে তত্ত্বের ভূমিকা অনেক। এই ভূমিকার অনেক কিছু এখনও আমাদের অজানা রয়েছে। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে তত্ত্ব যথানিয়মে তার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

শিক্ষা গবেষণার প্রকার ভেদ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে মানুষ গবেষণাকে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পেরেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিপুল উন্নতি সাধিত হয়েছে। শিক্ষা গবেষণাকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

১। ঐতিহাসিক গবেষণা
২। বর্ণনামূলক গবেষণা

৩। পরীক্ষণমূলক গবেষণা

১। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে অতীত ঘটনাবলী বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করাকে ঐতিহাসিক গবেষণা বলে, যা অতীতে ছিল তারই বর্ণনা হল এই গবেষণা। একে দলিল ভিত্তিক গবেষণাও বলা হয়। এই ধরণের গবেষণায় অতীতের ঘটনাবলী সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান, তথ্য লিপিবদ্ধ করণ এবং এদের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়। ফলাফলের ভিত্তিতে অতীতকে জানা যায়, অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানকে বুঝা যায় আর অতীত ও বর্তমান এই দুই জ্ঞানের সমন্বয় ভবিষ্যৎকে বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়বস্তু হবে কোন ব্যক্তি বিশেষ, কোন জাতি বিশেষ, কোন প্রতিষ্ঠান বিশেষ, কোন বিশেষ পদ্ধতি বা কোন বিশেষ ভাবধারা পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা ক্রমবিকাশ। ঐতিহাসিক গবেষণায় যতদূর সম্ভব প্রাথমিক তথ্যের উপর নির্ভরশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২। যা বর্তমানে বিদ্যমান তার বর্ণনাই হল বর্ণনামূলক গবেষণা। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে চলমান বর্তমানের ঘটনা নিয়ে যে গবেষণা করা হয় তাকে বর্ণনামূলক গবেষণা বলে। বর্তমান সমস্যাবলীর উপর ভিত্তি করে এই গবেষণা করা হয়।

বর্ণনামূলক গবেষণাকে জরীপ ভিত্তিক গবেষণাও বলা হয়। এই গবেষণায় কোন ঘটনার বর্তমান স্বরূপ, গঠন বা প্রক্রিয়ার বিবরণ, বিশ্লেষণ, সংরক্ষণ এবং ব্যাখ্যা করা হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন বিশেষ ব্যক্তি, দল বা বস্তু কিভাবে কাজ করে তা জানা এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য। এতে সংগৃহীত ঘটনাবলীর তথ্যাদির তুলনামূলক আলোচনা করা হয়ে থাকে।

৩। নিয়ন্ত্রিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে কি ঘটবার সম্ভাবনা আছে তা নির্ধারণ করাই হল পরীক্ষণমূলক গবেষণা। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে কঠোর নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় ইচ্ছাকৃত ভাবে কিছু করলে তার ফলাফল কি হবে তা যে গবেষণা পদ্ধতির সাহায্যে জানা যায় তাকে পরীক্ষণমূলক গবেষণা বলে। এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হল কারণ এবং ফলাফলের সম্পর্কের উপর বিভিন্ন উপাদানকে সুনিপুনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা, যাতে এদের প্রভাবের ফলাফল নির্ণয় করা সহজ হয়।

METROPOLITAN TEACHERS' TRAINING COLLEGE DHAKA DATE

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
গবেষণার সমস্যা চিহ্নিত করণ

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা করতে হলে প্রথম করণীয় হল গবেষণার উপযোগী সমস্যা নির্বাচন করা। সমস্যা হল যে বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে গবেষণা করা হয় বা গবেষণার বিষয় বস্তু। শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণার বিষয় বস্তুর অভাব নেই। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন গবেষণার ফলে গবেষণার দিগন্ত সম্প্রসারিত হচ্ছে। তবুও গবেষণার সবচেয়ে কঠিন দিক হল সমস্যা চিহ্নিত করণ। গবেষণাকারী শিক্ষার্থীদের গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন করার সময় অত্যন্ত কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সচরাচর নতুন গবেষকরা বড় আকারের সমস্যা বাছাই করতে আগ্রহী। এর কারণ সমস্যা সমাধানকারী ধারাবাহিক পদ্ধতি এবং গবেষণার ধর্ম সম্বন্ধে নতুন গবেষকদের তেমন ধারণা থাকে না। তাদের ধারণা সমস্যা যত বড় হবে তার মান তত বড় হবে। অনেক সময় গবেষণা করার আগ্রহ, প্রেরণা, উদাম নতুন গবেষকদের উৎসাহিত করে একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা অতি অল্প সময়ে সমাধান করার জন্য। গবেষণার ক্ষেত্রে নবাগত শিক্ষার্থীদের অসম্পূর্ণ জ্ঞানই এর জন্য দায়ী। অভিজ্ঞ গবেষকরা জানেন গবেষণা এমন একটি কাজ যা একঘেঁয়ে, অতি মন্থর এবং সহজে বোধগম্য নয়। সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান এবং সত্যের সন্ধান করার জন্য প্রচুর সময়, শক্তি এবং যুক্তিপূর্ণ চিন্তনশক্তি গভীরভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। যে ক্ষেত্র থেকে গবেষক যে সব তথ্যানুসন্ধান করবেন সে গুলোর যাবতীয় ভাবধারা সম্পর্কে তিনি অবহিত থাকবেন যে বিষয়ের উপর তথ্য পাওয়া কঠিন এবং সমস্যার সমাধানও সম্ভব নয় সে সব বিষয় গবেষণার জন্য উপযুক্ত নয়। গবেষণা ক্ষেত্রের সঙ্গে গবেষক যদি সুপরিচিত থাকেন এবং সেক্ষেত্রে অদ্যাবধি যে সব গবেষণা কাজ সম্পন্ন হয়েছে সে বিষয়েও যদি অবহিত থাকেন তাহলে তাঁর গবেষণার সমস্যা নির্বাচনের কাজ খুব সহজ হবে। জ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতা বিরাজমান। গবেষণার দ্বারা এই সব অসম্পূর্ণতা

সময় বিশেষ পরিপূর্ণ করা হয়। জ্ঞানের শূন্যতা থেকেই গবেষণার সৃষ্টি হয়। গবেষণাকারীর গভীর জ্ঞান গবেষককে বিষয় বস্তুর সন্ধান দেয়। আবার পরস্পর বিরোধী বক্তব্য থেকেও সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

গবেষণা ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত হওয়ার পূর্বে গবেষণার সমস্যা চিহ্নিত করা যায় না। গবেষণাকারী যখন কোন বিশেষ ধরনের বিষয়ে গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তখনই কেবল সেই গবেষণা তাঁকে আনন্দ দিতে পারে। বিষয় বস্তু নির্বাচনে অভিজ্ঞতা, আগ্রহ, স্বতঃস্ফূর্ত কৌতূহল এবং গবেষণা ক্ষেত্রের সঙ্গে সুপরিচিত থাকা অপরিহার্য। অভিজ্ঞ গবেষক অনেক সময় বিষয়বস্তু নির্বাচনে এমন ধরনের ভুল করে থাকেন যে গবেষণা কর্ম বেশ কিছুদিন পরিচালনা করার পর প্রতীয়মান হয় যে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর পূর্বেই গবেষণা করা হয়েছে। আবার অনেক সময় দেখা যায়, বিষয়বস্তু ঠিকভাবে নির্বাচিত না হলে গবেষককে অনতিক্রমনীয় বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে গবেষক দারুণভাবে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। ছোট আকারের সমস্যা নির্বাচন করে সেই বিষয়ে গভীরভাবে অনুসন্ধান করে গবেষণা করাই শ্রেয়ঃ। আপাতঃ দৃষ্টিতে অর্থহীন বিষয়বস্তুর গবেষণার ফলাফল অনেক সময় চমকপ্রদ হয়। অন্যের সাহায্যে গবেষণার সমস্যা নির্বাচন করার প্রত্যাশা না করা উচিৎ। গবেষক অবশ্যই নিজে তার নিজের গবেষণার সমস্যা নির্বাচন করবেন, কখনও কখনও উপদেষ্টা, বিষয় শিক্ষক অথবা সহপাঠীদের পরামর্শের সাহায্যে উপযুক্ত সমস্যা নির্বাচন সম্ভবপর হতে পারে। সমস্যাটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য : এটা সহজ, সুনির্দিষ্ট ও গবেষণার উপযুক্ত হতে হবে। সমস্যা নির্বাচনে গবেষককে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। প্রয়োগ ক্ষমতা, মৌলিকতা এবং গুরুত্বপূর্ণতা থাকতে হবে। কৌতূহল উদ্রেককারী সমস্যার কার্যকারণ সম্পর্কে জানবার জন্যে মানুষ স্বভাবতঃই আগ্রাহান্বিত থাকে। এই সকল সমস্যার কোন কোন্‌টা গবেষণার উপযুক্ত।

প্রথম গবেষণা পরিকল্পনা

গবেষণার প্রথম পরিকল্পনা সাধারণতঃ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

Dhaka University Institutional Repository

স্নাতক বা পরবর্তী পর্যায়ের আংশিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গৃহীত হয়ে থাকে। এর এমন কোন উদ্দেশ্য থাকে না যে, পরবর্তী কালে এইসব শিক্ষার্থী গবেষণায় নিয়োজিত থাকবে বা বড় গবেষক হবে। এইসব গবেষণার যৌক্তিকতা হল প্রাথমিকভাবে গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যেন কিছু দক্ষতা অর্জন করতে পারে-- যে দক্ষতা পরবর্তীকালে কোন শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করা যায় বা শিক্ষার প্রচলিত কোন রীতিনীতির ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন সাধন করা যায়। এসব সমস্যা সহজ এবং আকারে ছোট হওয়া প্রয়োজন যাতে অল্প সময়ে পরিচালনা করা যেতে পারে। এগুলো সচরাচর বর্ণনামূলক সমস্যা হয়ে থাকে, কখনও কখনও পরীক্ষণমূলকও হতে পারে। তবে এ ধরনের প্রথম গবেষণা জ্ঞানের প্রসারে, শিক্ষার রীতিনীতির উন্নয়নে বিশেষ কোন অবদান রাখতে পারে না এবং অতি অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী গবেষণায়-তাদের অর্জিত এই জ্ঞান বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকে। অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় শিক্ষা গবেষণায় প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ না করাই এর প্রধান কারণ। ব্যবহারিক গবেষণার প্রাদুর্ভাবের পর থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণার প্রয়োগ বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। শিক্ষকরা গবেষণা কর্মে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাবলী গবেষণার মাধ্যমে সমাধান করার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

গবেষণার সমস্যা চিহ্নিত করার পর নতুন গবেষকরা প্রয়োজন অনুসারে একাকী বা দলবদ্ধভাবে গবেষণা কার্য পরিচালনা করতে পারে। এই দলটি ৩ থেকে ৫ জনের মধ্যে সীমিত রাখাই বাঞ্ছনীয়। একই সমস্যার উপর একই ধরনের তথ্য সংগ্রাহক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু তথ্য সংগ্রহের উৎস হবে ভিন্ন এবং তথ্য বিন্যাস, বিশ্লেষণ এবং ফলাফল প্রকাশ পৃথক পৃথকভাবে করা প্রয়োজন। প্রথম পর্যায়ে দলবদ্ধভাবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে একাকী পরিচালনা করার ফলে গবেষণায় প্রয়োগকৃত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে যে সমন্বয় সাধিত হয় তা অত্যন্ত ফলপ্রসূ। এতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই গবেষণা কার্য সম্পন্ন করা যায় এবং প্রতিটি শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত ভাবে আলাপ আলোচনা ও সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে সুষ্ঠ ধারণা লাভ করার সুযোগ পায়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই প্রথম পরিকল্পনাটিকে পর-

বর্তীতে গবেষণা কার্য পরিচালনার একটি ভিত্তি বা প্রস্তুতি হিসাবে গণ্য করা হয়, আবার কখনও কখনও গবেষণার এই প্রথম সমস্যাকে বিশদভাবে বিস্তৃত এলাকায় প্রয়োগ করে এবং গভীরভাবে অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার রূপ প্রদান করা যেতে পারে।

একজন নবীন গবেষক তার গবেষণা পরিকল্পনায় নিহিত বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও গবেষণার প্রকারের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার বিশেষ একটি স্তরের উপর ভিত্তি করে সমস্যা নির্বাচন করতে পারে। তাদের জন্য উপযুক্ত সমস্যা উচ্চপর্যায়ের সমস্যা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। এটি অবশ্যই একটি সহজ ও ছোট আকারের সমস্যা হওয়া দরকার যা নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা যায় এবং যার দ্বারা গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সহজ হয়। তবে গবেষণার বাস্তব ক্ষেত্র থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতাই গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে অত্যধিক সহায়ক। এটা অনস্বীকার্য যে অভিজ্ঞতার উপর গবেষণা কার্যের সুষ্ঠ পরিচালনা অনেকাংশে নির্ভরশীল।

নবীণ গবেষকদের উপযুক্ত সহজ ও ছোট আকারের গবেষণার কয়েকটি সমস্যা উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া গেল—

১। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান।

২। প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর সার্বিক বিকাশে কতটুকু সহায়ক।

৩। প্রাথমিক স্তরের গণিত পাঠ্যক্রমে 'সেট সংযোজন' সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষিকাদের মতামত যাচাই।

৪। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভূগোল শিক্ষার উপকরণের অভাব।

৫। সপ্তম শ্রেণীর 'সামাজিক বিজ্ঞান' পাঠ্যপুস্তকের সার্বিক মূল্যায়ন।

৬। বে-সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের প্রশাসনিক দায়িত্ব নিরূপণ।

৭। ঢাকায় অবস্থিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে সুষ্ঠ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার অন্তরায় সমূহ।

৮। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষকতা পেশার প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

মনোভাব।

৯। বর্তমান সমাজে কর্মজীবি মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা নিরূপণ।

১০। বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং বিকাশ সাধন।

বিষয়বস্তু নির্বাচনের উৎস ঃ

১, শ্রেণীকক্ষ, বিদ্যালয় এবং লোক সমাজ গবেষণার সমস্যার একটি সঙ্গত ভিত্তিপূর্ণ উৎস। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক প্রতিনিয়ত নিত্য নতুন সমস্যার সম্মুখীন হন। যেমন, কতগুলো কাজ কেন আমরা করি ? যেসব বিষয়ে শিক্ষাদান করি, সেগুলো কি উদ্দেশ্যে শিক্ষা দেই ? আমরা কি উপযুক্ত সময়ে এবং অতি ফলপ্রসূভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করি, দৈনন্দিন শিক্ষাদান পদ্ধতি কি অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও ফলপ্রসূ করা যায় না ? শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের অর্জিত জ্ঞান কি পর্যাপ্ত এসব বিষয়ে আমাদের জানবার মত আরো তথ্য আছে কি ? বেশীর ভাগ শিক্ষার প্রচলিত রীতিনীতি গবেষণালব্ধ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অনুসন্ধিৎসু, কল্পনাপ্রবণ এবং কৌতূহল দীপ্ত মন থাকলে এই সকল ক্ষেত্রে গবেষণার উপযুক্ত অনেক সমস্যার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

২, বর্তমান যুগের কারিগরি, সামাজিক এবং শিক্ষাক্রমের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন গবেষককে নতুন সমস্যার সুযোগ ও সন্ধান দেয়। টেলিভিশন, প্রজেক্টার ও রেডিওতে প্রচারিত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানাদি শিক্ষার্থীদের মনে কি ধরণের প্রভাব বিস্তার করছে, কতদূর ফলপ্রসূ এবং আরো শিক্ষামূলক ও আকর্ষণীয় কিভাবে করা যায় গবেষণার মাধ্যমে অনুসন্ধান কর্ম পরিচালনা করে জানা যায়।

৩, শিক্ষা সংক্রান্ত সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে সমস্যা পাওয়া যায়। সমস্যার উৎস হিসাবে পাঠ্যপুস্তক, প্রবন্ধ, সাময়িকী, শিক্ষা বিভাগের রিপোর্ট, টার্ম পেপার ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪, উপদেষ্টা, বিষয় শিক্ষক বা অধ্যাপকের সঙ্গে আলোচনার ও তাঁদের সঙ্গে পরামর্শের মাধ্যমে গবেষক তাঁর ঈপ্সিত সমস্যার

সন্ধান পেতে পারেন, তাঁরা বিষয়বস্তু নির্বাচনে নির্দেশনা এবং পরামর্শ দান করে থাকেন। গবেষক অবশ্য নিজেই নিজের বিষয়বস্তু নির্বাচন করবেন।

বিষয়বস্তু নির্বাচন সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন ঃ

গবেষক কোন বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে গিয়ে সে বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিজকে কতিপয় প্রশ্ন করবেন। এই আত্মজিজ্ঞাসা সঠিক বিষয়বস্তু নির্বাচনে যথেষ্ট সহায়তা করবে। এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেলে বিষয়বস্তুটি গবেষণার উপযুক্ত বলে ধরে নেওয়া যায়। এসব অত্যাবশ্যকীয় প্রশ্নগুলো নিম্নে বর্ণিত হল ঃ—

১, বিষয়বস্তুটি যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক বা আগ্রহ উদ্দীপক কিনা ?

নির্বাচিত বিষয়টি যদি গবেষকের কাছে আনন্দদায়ক না হয় তাহলে ঐ বিষয়টির গবেষণা তার কাছে নিরস লাগবে। যদি বিষয়বস্তুর প্রতি গবেষকের সত্যিকার আগ্রহ, উৎসাহ ও কৌতূহল থাকে তবেই কেবল উক্ত গবেষণা দ্বারা একটি সমস্যার সমাধান সম্ভবপর।

২, বিষয়বস্তুটি নতুন ছিল কিনা ?

কোন একটি সমস্যার উপর পূর্বেই যদি গবেষণা হয়ে থাকে তাহলে সে বিষয়ে আর গবেষণা করা অর্থহীন। কোন গবেষণা পুনরাবৃত্তি করা যায় না। তবে যদি কোন ক্ষেত্রে গবেষণার ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতার উপর সন্দেহের উদ্রেক হয় বা পরস্পর বিরোধী বক্তব্য দেখা দেয় তখনই কেবল উক্ত বিষয়ে পুনরায় গবেষণা করার প্রয়োজন হতে পারে। পৃথিবীতে এমন অসংখ্য সমস্যা আছে যেগুলো সম্পর্কে পূর্বে কোন গবেষণা করা হয়নি। সুতরাং একই বিষয়বস্তুর উপর একাধিকবার গবেষণা করা উচিত নয়। পুনরাবৃত্তি নিবারনের জন্য ইতিপূর্বে কৃত গবেষণা সমূহের দলিলপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা উচিত। কোন সমস্যার নতুনত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সেই সমস্যাকে গবেষণার বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩, বিষয়বস্তুটি কি জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করে?

সব সমস্যাই গবেষণা উপযোগী নয় এবং সব সমস্যার প্রয়োজনও সমান নয়। অপ্রয়োজনীয় সমস্যার ফলাফল শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যহীন। কোন গবেষণার কোন বিষয়বস্তু নির্বাচনের পূর্বে বিবেচনা করে দেখতে হবে যে জ্ঞান বর্ধনে তার কোন অবদান আছে কিনা। অবশ্য একথা সুনিশ্চিত ভাবে বলা যায় না যে সব গবেষণা থেকে অর্থবহ ফলাফল পাওয়া যাবে। অনেক সময় দৈবক্রমেও অনেক মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত হয়ে যায়। তথাপি গবেষণার সমস্যাটি কতখানি সার্থক হবে সে বিষয়ে গবেষককে পূর্বাহ্নেই চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন। গবেষক চিন্তা করে দেখবেন তাঁর গবেষণা থেকে নতুন জ্ঞানের প্রত্যাশা করা যায় কিনা? তাঁর মতে উক্ত গবেষণার যদি কোন অবদান না থাকে তাহলে সমস্যাটি বর্জন করা উচিত।

৪, সমস্যাটি কি বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভবপর?

পৃথিবীতে এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আছে যেগুলোর সমাধান সম্ভবপর হলে জ্ঞানের রাজ্যে এদের অবদান অতুলনীয় হত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এদের সমাধান একেবারে অসম্ভব বা দুরূহ। যেমন—মঙ্গলগ্রহে মানুষ আছে কিনা এ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করার কোন নির্ভুল পদ্ধতি আজ পর্যন্ত মানুষের জানা নেই। কোন সমস্যা সমাধানের যুক্তিপূর্ণ, অর্থপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া না গেলে উক্ত সমস্যা গবেষণার সমীচীন নয় বলে গণ্য করা হয়। এই ধরনের সমস্যা জ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে অসংখ্য। অনেক সময় দেখা যায় তথ্যাদির অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও ঐ তথ্য সংগ্রহের কোন উপায় নেই। এ সকল ক্ষেত্রে গবেষণা করা সম্ভবপর নয়।

৫, বিষয়বস্তুটির কোন দাবীদার আছে কিনা?

যে গবেষক কোন একটি বিষয় প্রথম গবেষণা করবেন তিনিই তার একমাত্র দাবীদার থাকবেন এবং তাঁর অনুমতি ছাড়া অন্য কোন গবেষক সে বিষয়ে গবেষণা করতে পারবেন না। এই নীতি সব

গবেষকদের থাকা উচিত। সুতরাং গবেষণার বিষয়বস্তু বাছাই করার পূর্বে উক্ত বিষয়ে অন্য কোন গবেষক গবেষণা করছেন কিনা তা বিভিন্ন উপায়ে যাচাই করা প্রয়োজন।

৬, গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সংগতি, যথেষ্ট সময় ও প্রচুর সাহস আছে কিনা?

একটি উন্নত মানের গবেষণা কার্য পরিচালনা করার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আর্থিক অসংগতির জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কর্ম পরিহার করতে হয়। উন্নত দেশ সমূহের জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় গবেষণা হয়। সমাজের বিভিন্ন সমস্যাবলী গবেষণার মাধ্যমে সুষ্ঠভাবে সমাধান করা হয়। আর্থিক অসংগতির জন্য উন্নয়নশীল দেশের সর্বপ্রকারের সমস্যা গবেষণার মাধ্যমে সমাধান সম্ভব নয় এবং গবেষণার প্রচলনও ব্যাপক নয়। কোন বৈজ্ঞানিক সমস্যার সুষ্ঠ সমাধানের জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। যদি গবেষণার ফলাফল, সামাজিক সংস্কার, ধর্মীয় বিধান ইত্যাদির পরস্পর বিরোধী হয় তাহলে ফলাফল প্রকাশের জন্য সাহসের প্রয়োজন হবে। গবেষণার সমস্যা বাছাই করার পূর্বে এসব বিষয়ে গবেষককে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে।

৭, সমস্যাটি কি উন্নত মানের?

একটি ভাল সমস্যার প্রয়োজনীয় গুণাবলী হল মৌলিকতা, প্রয়োগ-ক্ষমতা এবং গুরুত্বপূর্ণতা। কোন সমস্যা ভাল কিনা নির্ধারণ করতে হলে সে সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। সংগৃহীত এই তথ্যের সাহায্যে সমস্যার ভাল মন্দ যাচাই করা যায়। প্রয়োজন বোধে প্রাথমিক পর্যায়ে সমস্যাটি বাতিল করা যায়। এটা লজ্জার ব্যাপার নয়। কারণ গবেষণা ভুল ত্রুটি এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

৪ গবেষণার পরিকল্পনা বা প্রস্তাবপত্র

□ অনুকরণ, পুনরাবৃত্তি ও সময়ের অপচয়রোধকল্পে গবেষণার

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবিত সমস্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণীকে গবেষণার প্রস্তাবপত্র বলে। অর্থাৎ প্রস্তাব পত্র হচ্ছে কর্মশক্তির অপচয়, অন্য গবেষণার পুনরাবৃত্তি ও নকল এড়ানোর জন্য একটি সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট বর্ণনামাত্র। গবেষণা পদ্ধতির অতি প্রয়োজনীয় একটি দিক হচ্ছে গবেষণা করার পূর্বে গবেষণার বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, গুরুত্ব, আনুমানিক সিদ্ধান্ত ইত্যাদি উল্লেখ করে গবেষক কিভাবে গবেষণা করবেন তার একটি খসড়া তৈরী করা। অর্থাৎ গবেষণার পূর্বে গবেষক যে খসড়া পরিকল্পনা করেন তাকে গবেষণার পরিকল্পনা বা প্রস্তাব পত্র বলা হয়। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে গবেষণার সমস্যা অনুমোদিত হবার পূর্বে এই প্রস্তাব পত্র উপদেষ্টার কাছে জমা দিতে হয়। গবেষণার প্রস্তাব পত্রকে বাড়ীর নীল-নক্সার সাথে তুলনা করা যায়। নীল-নক্সা দেখে যেমন বাড়ী তৈরী করা হয় ঠিক তেমনি প্রস্তাব পত্র দেখে গবেষক ধাপে ধাপে গবেষণার কাজে এগিয়ে যান। প্রয়োজনানুসারে প্রস্তাব পত্রের প্রথম খসড়াকে পরিবর্তন করা যায়। উচ্চমানের গবেষণা একটি সুপরিকল্পিত, ধারাবাহিক প্রস্তাবপত্রের উপর নির্ভরশীল। বলা হয়ে থাকে, একটি ভাল প্রস্তাব পত্র প্রনয়ন করার অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণ গবেষণা কার্যের প্রায় অর্ধেকটাই সম্পন্ন করা। গবেষক ও উপদেষ্টার জন্য এই প্রস্তাব পত্র খুবই প্রয়োজনীয়। উপদেষ্টার কাছে এই প্রস্তাব পত্র থাকলে তার পক্ষে গবেষককে গবেষণার ব্যাপারে সাহায্য করা কিংবা উপদেশ দেওয়া সহজ হয়। গবেষক সেই প্রস্তাব পত্র অনুসরণ করে গবেষণা কার্য ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করতে পারেন। এটা ভবিষ্যৎ গবেষণার নীল-নক্সা এবং সম্পূর্ণ গবেষণা কর্মের মূল্যায়ণের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। যাতে কোন গবেষণার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, অযথা শক্তি ও সময় ব্যয় না হয় সেজন্য প্রস্তাব পত্রের প্রয়োজন। একটি প্রস্তাব পত্রে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি প্রয়োজনীয় অংশ রয়েছে ঃ

১, সমস্যার বর্ণনা ঃ

প্রথমে সমস্যাটির বর্ণনা দিতে হয়। এই বর্ণনা প্রশ্নাকারে বা লিপিবদ্ধাকারে ধারাবাহিকভাবে করা হয়ে থাকে। একটি প্রধান প্রশ্নানুসারে অন্যান্য ছোট ছোট প্রশ্ন বা একটি প্রধান বর্ণনা অনুসারে অন্যান্য ছোট ছোট বর্ণনা দিয়ে সমস্যাটি তুলে ধরতে

সমস্যাটি গবেষণার উপযুক্ত এবং সুনির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সমস্যাটি সহজ ভাষায় বর্ণিত হবে যাতে গবেষণার পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি নির্দেশ পাওয়া যায়।

২, অনুমিত সিদ্ধান্ত গঠন ঃ

সুনির্দিষ্টভাবে গবেষণার সমস্যা প্রকাশ করার পর অনুমিত সিদ্ধান্ত গঠন করা হয়। যে সমস্যাটি নিয়ে গবেষণা করা হবে তার একটি সম্ভাব্য সমাধান বা ফলাফলকে অনুমিত সিদ্ধান্ত বলা হয়। "An hypothesis is a tentative answer to a question"

একটি প্রধান আনুমানিক সিদ্ধান্তের অনুসরণে অনেক ছোট ছোট আনুমানিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে। আনুমানিক সিদ্ধান্তে দুই বা ততোধিক চলের মধ্যে বিদ্যমান সম্ভাব্য সম্পর্কের বর্ণনা থাকবে এবং এই সম্পর্ক প্রমাণোপযোগী হতে হবে। অনুমিত সিদ্ধান্ত অবশ্যই ঃ—

ক, যুক্তি সঙ্গত হতে হবে।

খ, জানা ঘটনার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে।

গ, বিবরণী এমন হতে হবে যাতে সহজেই তার সত্যতা যাচাই করা যায়।

ঘ, সহজ সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করতে হবে।

এইভাবে অনুমিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজসাধ্য হয়, গবেষণার সমস্যা সম্বন্ধে পূর্ণ একটি ধারণা লাভ করা যায়, অনুসন্ধানের নিহিত যুক্তি সম্পর্কে এবং তথ্য সংগ্রহকারী পদ্ধতি সম্পর্কে সুষ্ঠ নির্দেশ পাওয়া যায়। গবেষণা কোন অনুমিত সিদ্ধান্ত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে পরিচালিত না হলে বিশেষ কোন্ উদ্দেশ্য বা বিশেষ কোন্ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করার লক্ষ্যে এটি পরিচালনা করা হল তা পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

৩, গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ

নির্বাচিত গবেষণার সমস্যার নিহিত উদ্দেশ্য কি তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিশেষ কি উদ্দেশ্যে গবেষণা কর্মটি পরিচালিত হবে তা প্রথমে প্রধান উদ্দেশ্য দ্বারা প্রকাশিত হবে। এই প্রধান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহ গঠন করতে হবে এবং তা স্পষ্টভাবে সহজ ভাষায় উল্লেখ করা প্রয়োজন।

৪, সমস্যার প্রয়োজনীয়তা ঃ

বাছাইকৃত সমস্যার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করতে হবে। প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা না থাকলে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যায় না। শিক্ষাক্ষেত্রে এই সমস্যাটির কতখানি গুরুত্ব রয়েছে সেটা ব্যক্ত করতে হবে। গবেষককে উল্লেখ করতে হবে তাঁর গবেষণা দ্বারা গৃহীত কোন প্রশ্নের উত্তর বা কোন সমস্যার সমাধান বা গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত প্রচলিত শিক্ষার রীতিনীতি, শিক্ষার তত্ত্ব, কোন উন্নয়ন কর্মসূচীর পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোন অবদান রাখতে পারবে কিনা। গবেষণা দ্বারা লব্ধ জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ এবং গবেষণার কার্যকারিতা পর্যাপ্ত যৌক্তিকতার সঙ্গে লিখিত হলে গবেষণাটির গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং যথার্থতা বৃদ্ধি পায়। গবেষণার খসড়ায় এইসব উল্লেখ করা না থাকলে গবেষণাটি গুরুত্বহীন হতে পারে। যে সব গবেষণার জন্য উদ্দেশ্যহীন ভাবে শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং সংগৃহীত তথ্যাদির বিশেষ কোন তাৎপর্য থাকে না তেমন গুরুত্বহীন সমস্যা গবেষণার উপযোগী নয়। এইগুলো গবেষণার জন্য চিহ্নিত না করে বর্জন করাই শ্রেয়। যেখানে শিক্ষার বিভিন্ন তত্ত্বে অনেক শূন্যতা রয়েছে এবং অনেক প্রচলিত শিক্ষার রীতিনীতির সংস্কার সাধনের প্রয়োজন সেখানে অপ্রয়োজনীয় সমস্যা নিয়ে অযথা অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে গবেষণা করার কোন যৌক্তিকতা নেই।

৫, সংজ্ঞা, আনুমানিক সিদ্ধান্ত, সীমাবদ্ধতা ও বাধা বিপত্তি ঃ
গবেষক যদি তাঁর গবেষণায় এমন কোন শব্দ ব্যবহার করেন যা

অনেকে জানে না, যে সকল শব্দ চরাচর ব্যবহৃত হয় না যে সকল শব্দে ভুল বিশ্লেষণের সম্ভাবনা থাকে সে গুলোর অর্থ বা সংজ্ঞা দেওয়া উচিত। শব্দাবলীর এ ধরনের বিশ্লেষণের সাহায্যে গবেষণার প্রতিটি অংশের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধিত হতে পারে। আনুমানিক সিদ্ধান্তের বিশদ বর্ণনার পুনরুল্লেখ থাকা দরকার। গবেষণা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে গিয়ে গবেষককে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এই অসুবিধা নানা প্রকারের হতে পারে। যেমন, আর্থিক অসুবিধা, তথ্যপ্রদানকারী ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বিঘ্ন, তাদের অসহযোগিতা, বই পুস্তকের অভাব, প্রাথমিক তথ্যের অভাব, তথ্য সংগ্রহে যাতায়াতের অসুবিধা, সঠিক তথ্য গোপন করার প্রবণতা ইত্যাদি। এছাড়া গবেষণা কর্মে নানা প্রকার সীমাবদ্ধতা ও বাধা বিপত্তি দেখা দিতে পারে। কোন একটি গবেষণার জন্য বিরাট ক্ষেত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন কিন্তু গবেষক সর্বত্র যেতে পারছেন না। আবার এমনও হতে পারে যে একজন গবেষককে ২০টি স্কুল থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, কিন্তু কোন কোন স্কুল কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা করল না। এসবই হল গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও বাধা বিপত্তি।

৬, গবেষণার পরিসর সীমিতকরণ ঃ

যে সমগ্রক থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে তার পূর্ণ বর্ণনা দিতে হবে। গবেষণার তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্র বড় আকারের হলে এবং প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যদি সম্ভবপর না হয় তাহলে নমুনায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে একটি নমুনা দল গঠন করতে হবে। এই নমুনা দল দ্বারা গবেষণার ক্ষেত্রকে সীমিত করা হয় বা গবেষণার এলাকাকে ক্ষুদ্র একটি এলাকায় সীমাবদ্ধ করা হয়। যে বিশেষ নমুনা পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হবে সেটির এবং গঠিত নমুনার আকার সম্পর্কে যুক্তি সহকারে উল্লেখ করতে হবে। গবেষণার খসড়ায় এসবের বিশদ উল্লেখ থাকলে গবেষণার কোন কাজই অতিরঞ্জিত হবার সম্ভাবনা থাকে না এবং গবেষকও লক্ষ্য ভ্রষ্ঠ হবেন না।

METROPOLITON TEACHERS TRAINING COLLEGE DATE........

Dhaka University Institutional Repository

৩, গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ

নির্বাচিত গবেষণার সমস্যার নিহিত উদ্দেশ্য কি তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিশেষ কি উদ্দেশ্যে গবেষণা কর্মটি পরিচালিত হবে তা প্রথমে প্রধান উদ্দেশ্য দ্বারা প্রকাশিত হবে। এই প্রধান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহ গঠন করতে হবে এবং তা স্পষ্টভাবে সহজ ভাষায় উল্লেখ করা প্রয়োজন।

৪, সমস্যার প্রয়োজনীয়তা ঃ

বাছাইকৃত সমস্যার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করতে হবে। প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা না থাকলে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যায় না। শিক্ষাক্ষেত্রে এই সমস্যাটির কতখানি গুরুত্ব রয়েছে সেটা ব্যক্ত করতে হবে। গবেষককে উল্লেখ করতে হবে তাঁর গবেষণা দ্বারা গৃহীত কোন প্রশ্নের উত্তর বা কোন সমস্যার সমাধান বা গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত প্রচলিত শিক্ষার রীতিনীতি, শিক্ষার তত্ত্ব, কোন উন্নয়ন কর্মসূচীর পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোন অবদান রাখতে পারবে কিনা। গবেষণা দ্বারা লব্ধ জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ এবং গবেষণার কার্যকারিতা পর্যাপ্ত যৌক্তিকতার সঙ্গে লিখিত হলে গবেষণাটির গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং যথার্থতা বৃদ্ধি পায়। গবেষণার খসড়ায় এইসব উল্লেখ করা না থাকলে গবেষণাটি গুরুত্বহীন হতে পারে। যে সব গবেষণার জন্য উদ্দেশ্যহীন ভাবে শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং সংগৃহীত তথ্যাদির বিশ্লেষে কোন তাৎপর্য থাকে না তেমন গুরুত্বহীন সমস্যা গবেষণার উপযোগী নয়। এইগুলো গবেষণার জন্য চিহ্নিত না করে বর্জন করাই শ্রেয়। যেখানে শিক্ষার বিভিন্ন তত্ত্বে অনেক শূন্যতা রয়েছে এবং অনেক প্রচলিত শিক্ষার রীতিনীতির সংস্কার সাধনের প্রয়োজন সেখানে অপ্রয়োজনীয় সমস্যা নিয়ে অযথা অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে গবেষণা করার কোন যৌক্তিকতা নেই।

৫, সংজ্ঞা, আনুমানিক সিদ্ধান্ত, সীমাবদ্ধতা ও বাধা বিপত্তি ঃ
গবেষক যদি তাঁর গবেষণায় এমন কোন শব্দ ব্যবহার করেন যা

অনেকে জানে না, যে সকল শব্দ চরাচর ব্যবহৃত হয় না যে সকল শব্দে ভুল বিশ্লেষণের সম্ভাবনা থাকে সে গুলোর অর্থ বা সংজ্ঞা দেওয়া উচিত। শব্দাবলীর এ ধরনের বিশ্লেষণের সাহায্যে গবেষণার প্রতিটি অংশের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধিত হতে পারে। আনুমানিক সিদ্ধান্তের বিশদ বর্ণনার পুনরুল্লেখ থাকা দরকার। গবেষণা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে গিয়ে গবেষককে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এই অসুবিধা নানা প্রকারের হতে পারে। যেমন, আর্থিক অসুবিধা, তথ্যপ্রদানকারী ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বিঘ্ন, তাদের অসহযোগিতা, যথেষ্ট পুস্তকের অভাব, প্রাথমিক তথ্যের অভাব, তথ্য সংগ্রহে যাতায়াতের অসুবিধা, সঠিক তথ্য গোপন করার প্রবণতা ইত্যাদি। এছাড়া গবেষণা কর্মে নানা প্রকার সীমাবদ্ধতা ও বাধা বিপত্তি দেখা দিতে পারে। কোন একটি গবেষণার জন্য বিরাট ক্ষেত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন কিন্তু গবেষক সর্বত্র যেতে পারছেন না। আবার এমনও হতে পারে যে একজন গবেষককে ২০টি স্কুল থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, কিন্তু কোন কোন স্কুল কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা করল না। এসবই হল গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও বাধা বিপত্তি।

৬, গবেষণার পরিসর সীমিতকরণ ঃ

যে সমগ্রক থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে তার পূর্ণ বর্ণনা দিতে হবে। গবেষণার তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্র বড় আকারের হলে এবং প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যদি সম্ভবপর না হয় তাহলে নমুনায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে একটি নমুনা দল গঠন করতে হবে। এই নমুনা দল দ্বারা গবেষণার ক্ষেত্রকে সীমিত করা হয় বা গবেষণার এলাকাকে ক্ষুদ্র একটি এলাকায় সীমাবদ্ধ করা হয়। যে বিশেষ নমুনা পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হবে সেটির এবং গঠিত নমুনার আকার সম্পর্কে যুক্তি সহকারে উল্লেখ করতে হবে। গবেষণার খসড়ায় এসবের বিশদ উল্লেখ থাকলে গবেষণার কোন কাজই অতিরঞ্জিত হবার সম্ভাবনা থাকে না এবং গবেষকও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবেন না।

METROPOLITAN TEACHERS TRAINING COLLEGE DATE

Dhaka University Institutional Repository

৭, সংশ্লিষ্ট বই পুস্তকের পর্যালোচনা ঃ

গবেষক যে বিষয় নিয়ে গবেষণা করবেন সেই বিষয়ের উপর অন্য কারো গবেষণা থাকলে এবং বিশেষজ্ঞদের সংশ্লিষ্ট কোন লেখনী থাকলে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিতে হবে। এই বিবরণী থেকে বুঝা যাবে গবেষক তাঁর লেখনীর সংশ্লিষ্ট জানা ও অজানা তথ্যাদি সম্পর্কে অবগত আছেন এবং তথ্যাদি বা ফলাফলের সঙ্গে গবেষকের মতের ঐক্য বা অনৈক্য থাকলে প্রস্তাবপত্রে সে বিষয়েও উল্লেখ করতে হবে। সম্পর্কযুক্ত গবেষণা, লেখনী বা বই পুস্তকের বিশদ সমালোচনার দ্বারা যা পূর্বে প্রচারিত হয়ে গেছে সে সবের পুনরাবৃত্তি হবার সম্ভাবনা থাকে না, অযথা সময় ও শক্তির অপচয় ঘটেনা এবং ভবিষ্যতে তথ্য সংগ্রহ সম্পর্কে বিশেষ দিক নির্দেশনা লাভ করা যায়। উল্লেখ্য যে, উন্নতমানের গবেষণা অতীতের লব্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়ে থাকে। সমগ্র মানব জাতির জ্ঞান প্রতিবেদন আকারে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে যা আমরা বই পুস্তকে পেতে পারি।

৮, প্রস্তাবিত গবেষণা পদ্ধতির বিশদ বর্ণনা ঃ

গবেষককে স্থির করতে হবে তিনি কি পদ্ধতি প্রয়োগ করে গবেষণা করবেন। গবেষণার তথ্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা যায়, যেমন, প্রশ্নমালা, মতামত সংগ্রহকারী পত্র, সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ, মনোবিজ্ঞান সম্মত পরীক্ষা নিরীক্ষা ইত্যাদি। শুধু পদ্ধতি নয়, সম্পূর্ণ গবেষণা পরিকল্পনা বিশদভাবে আলোচনা করতে হবে, চিহ্নিত সমস্যা কি প্রকারে গবেষণার মাধ্যমে সমাধান করা যাবে, কি ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হবে, তথ্য সংগ্রহের উৎস কি? কোন্ বিশেষ ধরনের পদ্ধতির সাহায্যে তথ্য সংগৃহীত হবে, এই বিশেষ পদ্ধতিটি কেন নির্বাচন করা হল, ব্যবহৃত পদ্ধতির আবশ্যকীয় গুণাবলী যথা উদ্দেশ্য নিষ্ঠা, যথার্থতা, ব্যবহার যোগ্যতা ইত্যাদি রয়েছে কিনা, সংগৃহীত তথ্য কি উপায়ে বিশ্লেষণ করা হবে এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে ইত্যাদি প্রস্তাবপত্রে সুষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। একই সমস্যার ক্ষেত্রে একের অধিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হলে কোন প্রকার তথ্যের জন্য কোন প্রকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে; যুক্তিসংকারে পৃথক পৃথকভাবে সেসব উল্লেখ করতে হবে।

৯, সময়সূচী বা সময় তালিকা ঃ

গবেষণা কর্মকে ধারাবাহিক ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি সময় সূচী তৈরী করা আবশ্যক। সম্পূর্ণ গবেষণা কর্মের জন্য সময় বরাদ্দ করা এবং গবেষণা কর্মকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে প্রতিটি অংশের জন্য সময় নির্ধারণ করা হবে। এই সময় সূচী অনুযায়ী গবেষক ধারাবাহিকভাবে ধীরে ধীরে গবেষণা কর্মে অগ্রসর হবেন। সময় সূচীর নির্ধারিত সময় অনুযায়ী গবেষণার প্রত্যেক অংশের কার্য সম্পাদন করা হয়। এতে অযথা সময় ও শক্তি অপচয় হবার অবকাশ থাকে না। গবেষণা কর্ম বিলম্বিত হবার কোন প্রকার আশংকাও থাকে না এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করতে অত্যন্ত সহায়ক হয়।

গবেষণা পরিকল্পনার উপরোক্ত নয়টি প্রয়োজনীয় অংশ ছাড়া আরও দুইটি অংশ প্রয়োজনবোধে উল্লেখ করা যেতে পারে। অংশ দুইটি নিম্নরূপ ঃ—

১০, বাজেট ঃ Budget:

গবেষণা একটি ব্যয় বহুল, অর্থ সাপেক্ষ, সুসংগঠিত অনুসন্ধান পদ্ধতি। গবেষণার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থের উৎস কি, কি প্রকারে অর্থ সংগৃহীত হবে এবং লব্ধ অর্থ গবেষণার কোন খাতে কি প্রকারে ব্যবহৃত হবে তা প্রস্তাব পত্রে বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়। গবেষণা কার্য শুরু করার পূর্বে বাজেট করে আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুযায়ী গবেষণা কার্য পরিচালিত হলে অর্থের অপচয়, অর্থের অভাবে গবেষণা কার্য অসমাপ্ত থেকে যাওয়া বা আকস্মিকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কোন প্রকার অপচয় না ঘটানো প্রস্তাবপত্রের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। অপচয় রোধকল্পে এবং নির্ধারিত অর্থের দ্বারা গবেষণা কার্য সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে একটি বাজেট তৈরী করা গবেষণা পরিকল্পনার অতি প্রয়োজনীয় অংশ।

১১, সাহায্যকারী ব্যক্তিবর্গ ঃ

একটি গবেষণার বিভিন্ন কার্য পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মোট কতজন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা প্রয়োজন তা পূর্বেই বিবেচনা করে স্থির করা হয়। একজন প্রধান সমন্বয়কারী ছাড়া কতজন গবেষক, সহকারী গবেষক, তথ্য সংগ্রহকারী, তথ্য বিন্যাস ও বিশ্লেষণকারী, পরিসংখ্যানবিদ এবং প্রয়োজন বোধে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ আবশ্যক তা উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

অগ্রগতির প্রতিবেদন :

কোন কোন প্রতিষ্ঠানে গবেষণা কর্মের অগ্রগতি উল্লেখ করে বিভিন্ন সময়ে উপদেষ্টার নিকট একটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার প্রয়োজন হয়। এই প্রতিবেদন গবেষকের কাছে খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক ও উদ্দীপনা সঞ্চারক হয়ে থাকে। সময় সূচী অনুসরণ করে গবেষণা কর্ম পরিচালনা করার জন্য এই প্রতিবেদন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গবেষণা-কর্ম সুষ্ঠভাবে সমাপ্ত করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী :

নির্বাচিত গবেষণার জন্য গবেষক যে সকল বই পুস্তকের সাহায্য নিয়েছেন তার একটি তালিকা দিতে হবে। এই তালিকাকে গ্রন্থপঞ্জী বলা হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

পরিশিষ্টে গবেষণা পরিকল্পনার একটি নমুনা দেওয়া গেল।

পঞ্চম অধ্যায়

গ্রন্থাগার ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদির ব্যবহার

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার জাতীয় জীবনের ও সভ্যতার নিয়ন্ত্রক শক্তি। তাই সভ্যতা-সচেতন জাতির মধ্যে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের গুরুত্ব এবং ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বর্তমানে উন্নতদেশসমূহে শিক্ষার মানোন্নয়ন, উচ্চ শিক্ষার প্রসার এবং গবেষণার জন্য গ্রন্থাগারকে একটি প্রধান হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করা হয়। উন্নত দেশসমূহে শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে গ্রন্থাগার মুখী শিক্ষাদান ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। ছাত্র ছাত্রীরা তাদের মেধা, প্রবণতা ও অনুরাগ বিজ্ঞান সম্মত ভাবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে জ্ঞান বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং গবেষণার ক্ষেত্রে নব দিগন্তের উন্মোচন করছে।

অনেকগুলো প্রগতির একটি তখনই সাধিত হয় যখন মানুষ পরবর্তী বংশধরদের জন্য জ্ঞান সঞ্চালনে প্রথা ও গল্প লেখকদের স্মৃতিশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে নিজেই তার ধারণা ও অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। স্থায়ীভাবে তথ্য রেকর্ড করার এই দক্ষতা ব্যক্তিকে তার স্মৃতি ভান্ডারে অনেক কিছু সংযুক্ত করার সুযোগ দেয়, এবং স্বতঃপ্রসারমান এমন একটি জ্ঞান-ভিত্তি প্রদান করে যার মাধ্যমে ব্যক্তি নতুন ধারণা ও নতুন বিষয় তৈরী করতে পারে। তথ্য লিখিত বা মুদ্রিত এই দুই প্রকার ব্যতিরেকে দৃশ্য ও শব্দ এই দুই ভাবেও প্রকাশিত হতে পারে। শব্দ ও দৃশ্যকে বৈদ্যুতিকভাবে রেকর্ড করার যে দক্ষতা মানুষের রয়েছে, তন্মধ্যে অডিও টেপ, ভিডিও টেপ, মাইক্রো-ফিল্ম, মাইক্রোকার্ড, স্লাইড ইত্যাদি তথ্যকে রেকর্ড ও সংরক্ষণ করার ব্যাপারে মানুষের ক্ষমতাকে বহুগুণ বিস্তৃত করেছে যার ফলে পাঠাগার এখন কেবল মাত্র শিক্ষিত বা মুদ্রিত উপাদানের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই। আদর্শগত ভাবে এই স্থানটিতে বই, জার্নাল এবং অন্যান্য প্রকাশনা

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যের উৎস হিসাবে থাকবে যা গ্রাহকদের প্রয়োজন মিটাবে। পাঠাগারকে অবশ্যই জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু হতে হবে এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পাঠাগার সমূহের পদ্ধতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে 'লিয়াজো' রক্ষা করতে হবে। কারণ আজকের এই তথ্য বিস্ফোরণের যুগে কোন গ্রন্থাগারই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

সমগ্র মানব জাতির জ্ঞান পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হয়ে গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। শিক্ষা গবেষণার জন্য লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পুস্তক, পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন, নানা প্রকার প্রকাশনা, পরিসংখ্যানমূলক তথ্যাদির ব্যবহার ও প্রয়োজন অপরিহার্য। তাৎপর্যপূর্ণ ও উন্নতমানের গবেষণার জন্য লাইব্রেরী এবং বাস্তব উৎস উভয় ক্ষেত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। শিক্ষা গবেষণার বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতির মধ্যে ঐতিহাসিক গবেষণা, দলিল-ভিত্তিক গবেষণা, ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণ ইত্যাদি পদ্ধতিতে কোন গবেষণা কর্ম পরিচালনার জন্য লাইব্রেরী থেকে সংগৃহীত তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঐতিহাসিক গবেষণার প্রাথমিক তথ্য, মাধ্যমিক তথ্য, সংযোগসাধন এবং সকল প্রকার গবেষণার সংশ্লিষ্ট বই-পুস্তকের পর্যালোচনার জন্য গ্রন্থাগারের ব্যবহার অতীব প্রয়োজনীয়। উন্নত মানের গবেষণা অতীত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। অতীত জ্ঞানের সন্ধান গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়। গবেষণা সমস্যার বিশদ বর্ণনা, ব্যবহৃত শব্দের সংজ্ঞাদান, গ্রন্থপঞ্জী রচনা এবং অনুকরণ ও পুনরাবৃত্তি এড়ানোর লক্ষ্যে গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত তথ্যাদির পর্যালোচনা অত্যাবশ্যক।

যে কোন পাঠাগার, যত বড় বা যত ছোটই হোক না কেন, তার একটি লক্ষ্য ও কার্যক্রম থাকবে। লক্ষ্য হল জ্ঞান বিতরণ এবং পাঠকদের প্রয়োজন মিটানো। আর কার্যক্রমের প্রধান হল সেবাকার্য। এই তথ্যসেবা কত লোক গ্রহণ করবে তা নির্ভর করে বিষয়ের সংখ্যার উপর। সেবাকার্যের অনেকগুলো দিক রয়েছে তন্মধ্যে রেফারেন্স সার্ভিস (Reference service) অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। রেফারেন্স সার্ভিসের প্রাথমিক কার্যক্রম হল পাঠককে তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণা কর্মে সহযোগিতা করা। পাঠককে মাঝে মাঝে গবেষণা কর্মে নির্দেশ দানও এর অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকই

হচ্ছেন নির্দেশদানকারী ব্যক্তি। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রন্থাগারিকের কাজ হল নির্দিষ্ট তথ্য চিহ্নিত, নিরূপণ ও সংগ্রহে ব্যবহারকারীদের সহায়তা করা। অন্যদিকে গ্রন্থাগারের সুষ্ঠ ব্যবহার সম্পর্কে গবেষকেরও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

গবেষণায় গ্রন্থাগার ব্যবহারের উদ্দেশ্য ঃ

গ্রন্থাগারের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে—মূলতঃ বইয়ের মাধ্যমে জ্ঞান দান বা বিতরণ করা, জ্ঞানের জন্য আকর্ষণ ও পিপাসা সৃষ্টি করা। গ্রন্থাগার তাই জ্ঞানের ধারক ও বাহক। শিক্ষা গবেষণায় গ্রন্থাগার ব্যবহারের নানাবিধ উদ্দেশ্য রয়েছে। সংক্ষিপ্তভাবে সেগুলো নিম্নরূপ ঃ—

১। একটি গুরুত্বপূর্ণ, তাৎপর্যপূর্ণ এবং মৌলিক সমস্যা বাছাই করা ও সমস্যাটি গবেষণার উপযুক্ত কিনা যাচাই করার জন্য গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বিভিন্ন পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, গবেষণা-রিপোর্ট ও সেমিনার রিপোর্টের সম্যক পর্যালোচনা প্রয়োজন। নির্বাচিত বিষয়টি সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান অর্জন এবং সুষ্ঠ ধারণা লাভ করার জন্যও গ্রন্থাগারের ব্যবহার অপরিহার্য।

২। নির্বাচিত সমস্যাটির উপর গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং একটি পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় অংশগুলো প্রণীত পরিকল্পনায় যথাযথ প্রয়োগ করার জন্য গ্রন্থাগার থেকে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

৩। পুনরাবৃত্তি ও অনুকরণ এড়ানোর জন্য গ্রন্থাগারের ব্যবহার অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। প্রথম নজর দিতে হবে গবেষকের নির্বাচিত সমস্যার উপর ইতিপূর্বে অন্যকোন গবেষণা হয়েছে কিনা। হয়ে থাকলে গবেষণাটি দ্বারা সমস্যার কোন দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে। এছাড়া ব্যবহৃত পদ্ধতি, গবেষণার উদ্দেশ্য ইত্যাদিও জানা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, গবেষণার বিষয়বস্তু হল, "বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যাবলী" গবেষককে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান লাভ করতে হবে বিশেষতঃ এই বিষয়ে ইতিপূর্বে যে সকল গবেষণা পরিচালিত হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে। এতে পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থাকে না এবং বিষয়টির নতুন দিক উদ্ঘাটনের

Dhaka University Institutional Repository

ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৪। গবেষণায় ব্যবহৃত বিশেষ বিশেষ শব্দ যা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না এবং ভুল বিশ্লেষিত হবার সম্ভাবনা থাকে সেগুলোর সংজ্ঞা দান ও ব্যাখ্যা করার জন্য এবং গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করার জন্য গ্রন্থাগারের প্রয়োজন হয়।

৫। গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত তথ্যাদির সাহায্যে সংশ্লিষ্ট পুস্তক, বিষয়াদি এবং গবেষণা কার্যের পর্যালোচনা করা সম্ভবপর। উন্নতমানের গবেষণা অতীত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়, যে জ্ঞান ও তথ্য কেবলমাত্র গ্রন্থাগার সরবরাহ করে থাকে।

৬। গ্রন্থাগার—গবেষণা, ঐতিহাসিক গবেষণা, দলিল-বিশ্লেষণ, ঘটনা-প্রবাহ-বিশ্লেষণ, ঘটনাবলীর তুলনামূলক আলোচনা, ঘটনাবলীর ধারাবাহিক ও বংশানুক্রমিক আলোচনার জন্য গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত তথ্যাদি ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়।

৭। কেবল মাত্র গ্রন্থাগার থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণা করা যায় তা নয়, গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বিভিন্ন পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, গবেষণা রিপোর্ট ও অন্যান্য বিষয়াদির উপরও গবেষণা করা যেতে পারে।

৮। গবেষণা কার্য সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের অবদান অনস্বীকার্য। গবেষককে একটি গ্রন্থাগারের ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। প্রত্যেক গ্রন্থাগারই পুস্তকের শ্রেণীবিন্যাস, কার্ড ক্যাটলগ, পুস্তকের নম্বর নির্ধারণ ইত্যাদি ব্যাপারে একটি সাধারণ নীতি অনুসরণ করে থাকে। তবে সংরক্ষিত পুস্তকের সংখ্যা, পুস্তক বিন্যাস ও বিন্যস্ত করার দিক থেকে একটি গ্রন্থাগার অপর একটি গ্রন্থাগার থেকে পৃথক হতে পারে।

কার্ড ক্যাটলগ (Card Catalogue) :

কার্ড ক্যাটলগ প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থাগারের নির্ঘন্ট বা ইনডেক্স (index)। এটি গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা এবং নানাবিধ প্রকাশনার সূচী নির্দেশক এবং পুস্তকের যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করে থাকে। গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রাথমিক পর্যায় হল কার্ড

ক্যাটলগ সম্পর্কে ধারনা লাভ করা। ডিকশনারীর মতো অক্ষরানুক্রমিক ভাবে কার্ড ক্যাটলগকে বিন্যস্ত করা হয়। এটাকে 'Bibliographic information)' ও বলা যেতে পারে। এক-জন পাঠকের প্রয়োজন মিটাতে কার্ড ক্যাটলগ অত্যন্ত সহায়ক।

কার্ড ক্যাটলগে পুস্তক বিন্যাস করার নিয়মাবলীঃ—

প্রতিটি পুস্তকের জন্য তিনটা আবার কোন কোন গ্রন্থাগারে কোন কোন পুস্তকের জন্য একটি চতুর্থ কার্ড প্রস্তুত করা হয়। চারটি পৃথক কার্ড, চারটি পৃথক 'ট্রে'তে সাজান থাকে। কার্ডগুলো লেখক কার্ড (author card or master card), বিষয় কার্ড (subject card), শিরোনাম কার্ড (title card)' ও বিশ্লেষণ ভিত্তিক কার্ড (analytical card) এই চার পর্যায়ে চিহ্নিত করা থাকে।

লেখক কার্ড (Author or Master Card):

লেখকের নাম অনুসারে যে কার্ড প্রস্তুত করা হয় তাতে পাশ্চাত্যের লেখকের শেষ নাম প্রথমে দেওয়া হয়। যেমন, যদি লেখকের নাম হয় জন, ডবলিউ বেষ্ট, তাহলে লেখক কার্ডে লেখা হবে বেষ্ট জন, ডবলিউ। উদাহরণ স্বরূপে একটি লেখক কার্ডঃ

	আবদুল করিম
৯৫৪,০২	পাক ভারতে মুসলিম শাসন। ঢাকা,
আবপা	কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড; ১৯৬৯
	৫১৯ পৃষ্ঠা

চিত্র—৩ লেখক কার্ড

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় কার্ড (Subject Card):

যে কার্ডে কোন কাজের বা প্রকাশনার বিষয় ভিত্তিক অন্তর্ভুক্তি করা হয় তাকে বিষয় কার্ড বলে। এতে প্রথমে কোন বিষয়ের নাম উল্লেখ করা থাকে। এই কার্ড গবেষকের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কোন পুস্তক কোন লেখকের জীবনী নিয়ে রচিত হলে, তা 'জীবন-বৃত্তান্ত' এই বিষয় কার্ডে অন্তর্ভুক্ত হবে। উদাহরণ স্বরূপ একটি বিষয় কার্ড—

৯৫৪,০২ আবপা	— ইতিহাস আবদুল করিম পাক ভারতে মুসলিম শাসন কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা ১৯৬৯—৫১৯ পৃষ্ঠা

চিত্র—৪ বিষয় কার্ড

শিরোনাম কার্ড (Title card):

শিরোনাম কার্ডটি প্রথমে পুস্তকের শিরোনাম উল্লেখ করে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ একটি শিরোনাম কার্ড—

৯৫৪,০২ আবপা	পাক ভারতে মুসলিম শাসন। আবদুল করিম কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা ১৯৬৯, ৫১৯ পৃষ্ঠা

চিত্র—৫ শিরোনাম কার্ড

বিশ্লেষণ ভিত্তিক কার্ড (Analytical card):

একই পুস্তকে বিভিন্ন বিষয় থাকলে বিভিন্ন পাঠকের প্রয়োজন হতে পারে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী কার্ডের সংখ্যা হবে। একে 'added entry' ও বলা হয় এবং অনেকটা documentation' এর মত। লেখক কার্ডের অনুরূপে তালিকাভুক্ত করা হয়ে থাকে। বিষয়াদির কিছু কিছু প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করা থাকে। সাধারণতঃ বড় বড় গ্রন্থাগারে এই কার্ডটি ব্যবহৃত হয়। এই কার্ড কোন একটি পুস্তকের গুরুত্বপূর্ণ অংশ সম্পর্কে ধারনা দেয়।

লেখক কার্ড, বিষয় কার্ড এবং শিরোনাম কার্ড আদ্যাক্ষর দিয়ে অক্ষরানুসারে সংগঠন করা হয় যাতে সহজে পুস্তকটি পাওয়া যায়। সব কার্ডের লেখনী গ্রন্থপঞ্জীর মত হয়ে থাকে। কার্ড ক্যাটলগের পুস্তক বিন্যাস পদ্ধতি এতই সুসংগঠিত এবং সুশৃংখলিত যে, কোন পুস্তকের সঠিক শিরোনাম বা লেখকের নাম সম্পূর্ণভাবে পাঠকের মনে না থাকলেও বিষয়বস্তু কার্ড দেখে বের করা সম্ভবপর। আবার বিষয়বস্তু কার্ড দেখে একটি বিশেষ বিষয়ে কোন কোন লেখক কি কি শিরোনামের পুস্তক লিখেছেন তাও জানা যায়।

উল্লেখিত কার্ডগুলো ছাড়াও গ্রন্থাগারের প্রশাসনিক কার্য সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে 'অফিসিয়াল কার্ড' বা 'সেল্ফ কার্ড' প্রস্তুত করা হয়। এতে সমগ্র গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পুস্তকাদির পূর্ণ তালিকা দেওয়া থাকে। কোন কোন বৃহদায়তন লাইব্রেরী 'cataloging data' তৈরী করে যাতে ছোট লাইব্রেরীগুলোকে সহায়তা করা যায় এবং তাদের নিজস্ব বই ফেরৎ না পাওয়া গেলে তা চিহ্নিত করা সম্ভবপর হয়।

গ্রন্থাগারে পুস্তকের শ্রেণী বিন্যাস:

গ্রন্থাগারে পুস্তকের শ্রেণী বিন্যাস নানা পদ্ধতিতে করা যায়। সচরাচর সাধারণ থেকে বিশেষ এবং অবরোহ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। Dewey Decimal পদ্ধতি বহুলাংশে ব্যবহৃত একটি

Dhaka University Institutional Repository

সহজ বোধগম্য পদ্ধতি। এই শ্রেণীকরণ পদ্ধতিতে পুস্তকের শ্রেণী নির্দেশ করে, প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ গ্রন্থাগারে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী বিভিন্ন শাখার জ্ঞানকে ১০টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এই ১০ ভাগের প্রতিটি ভাগকে আবার ১০টি উপ-ভাগে বিভক্ত করা হয়। নিম্নে এই পদ্ধতিতে শ্রেণীকরণের উদাহরণ দেওয়া হল।

Dewey Decimal Classification

First Summary:
প্রথম শ্রেণী বিন্যাস

000 General Works	সাধারণ কাজ বা সার্বজনীন কাজ
100 Philosophy	দর্শন
200 Religion	ধর্ম
300 Social Science	সমাজ বিজ্ঞান
400 Language	ভাষা
500 Pure Science	বিজ্ঞান
600 Technology	প্রযুক্তি বিজ্ঞান
700 The arts	শিল্পকলা
800 Literature	সাহিত্য
900 History (Geography, Travels)	ইতিহাস (ভূগোল, ভ্রমণ)

Second Summary :
দ্বিতীয় শ্রেণী বিন্যাস

000 General Works	সাধারণ কাজ/সার্বজনীন কাজ
010 Bibliography	গ্রন্থপঞ্জী
020 Library Science	গ্রন্থাগার বিজ্ঞান
030 General encyclopedias	সাধারণ বিশ্বকোষ
040 ,, Collected essays	সাধারণ প্রবন্ধ সংকলন

050	,, Periodicals	সাধারণ	সাময়িকী
060	,, Societies	,,	মানব সমাজ
070	,, Newspaper Journalism	সংবাদ পত্র, সাংবাদিকতা	
080	Collected works	সংগৃহীত গ্রন্থাদি	
090	Manuscripts and rare books	পাণ্ডুলিপি ও দুর্লভ সংগ্রহ*	

কার্ড ক্যাটলগের উপরে বাম কোণে দুইটি নম্বর থাকে। একে 'কল নম্বর' (call number) বলা হয়। পুস্তকের শ্রেণী নম্বর ও পুস্তক নম্বর সমন্বয়ে 'কল নম্বর' গঠিত হয়ে থাকে। (পুস্তকের শ্রেণী নং+পুস্তক নং=কল নম্বর)। পুস্তকের শ্রেণী নম্বর, Dewey Decimal পদ্ধতি অনুযায়ী নির্ধারিত নম্বর এবং তা প্রতিটি বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট কৃত নম্বর। পুস্তক নম্বর লেখকের নামের প্রথম দুই অক্ষর এবং শিরোনামের প্রথম অক্ষর নিয়ে গঠিত হয়। কল নম্বরের সাহায্যে প্রয়োজনীয় পুস্তকটি সহজে পাওয়া যায়। লেখক কার্ড, বিষয় কার্ড ও শিরোনাম কার্ডে উল্লেখিত ৯৫৪ নম্বরটি Dewey Decimal পদ্ধতি অনুযায়ী নির্ধারিত পুস্তকের শ্রেণী নম্বর। এই কার্ডগুলোতে প্রদত্ত ·০২ দ্বারা ভারতের মধ্য যুগ নির্দেশ করছে। (·০১ প্রাচীন যুগ এবং ·০৩ আধুনিক যুগ)। কার্ডগুলোর পুস্তক নম্বর হল—আবপা যা লেখকের নামের প্রথম দুই অক্ষর এবং শিরোনামের প্রথম অক্ষর দিয়ে গঠিত।

শ্রেণী বিন্যাসের উদ্দেশ্য:

১। একটি বিষয়ের পুস্তক গ্রন্থাগারে একটি বিশেষ স্থানে সংরক্ষিত করা যায়।

২। আগ্রহী পাঠককে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য সরবরাহ করা যায়।

৩। একটি বিশেষ পুস্তকের অবস্থান সম্পর্কে পাঠকের সুনিশ্চিত ধারণা জন্মায়।

*Dewey Melvil. Dewey Decimal Classfication and Relative Index. New York : Forest Press INC. 1958.

Dhaka University Institutional Repository

৪। পাঠক একই বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন পুস্তক সহজে খুঁজে পাবেন। ফলে একটি বিশেষ বিষয়ে পাঠকের জ্ঞান বহুলাংশে বর্ধিত হবে এবং পুস্তক পাঠের আগ্রহ বাড়বে।

তথ্যের প্রচার ঃ

দুই প্রকারে তথ্যের প্রচার হয়, (ক) মৌখিক ভাবে (খ) লিখিত ভাবে।

নতুন জ্ঞান সৃষ্টি হচ্ছে সঙ্গত আলোচনা থেকে। যেমন, গবেষণাগার, চায়ের আসর অথবা অন্যত্র সাদৃশ্য বা সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে একদল লোক একত্রে মিলিত হওয়া। ছোট বড় বা অল্প কয়েক জনের মধ্যে এই অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক তথ্যের প্রচার আনুষ্ঠানিক উপস্থাপনার মাধ্যমে স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে বৃহৎ আকারে প্রকাশ করা যায়। প্রসঙ্গত, তথ্য আনুষ্ঠানিক ভাবে লিখিত হয় এবং আরও ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হয়। এটাই হচ্ছে গ্রন্থাগারের প্রাথমিক পর্যায়ের সাহিত্য।

প্রকাশনার প্রকার ভেদঃ

প্রকাশনাকে মোট তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

১। প্রাথমিক প্রকাশনা (Primary publication)
২। মাধ্যমিক প্রকাশনা (Secondary publication)
৩। সংকলিত প্রকাশনা. (Consolidated publication)

১. প্রাথমিক প্রকাশনাঃ

যে প্রকাশনায় নব্য তথ্য ও জ্ঞান প্রথম প্রকাশিত ও রেকর্ডকৃত হয় তাকে প্রাথমিক প্রকাশনা বলা হয়।

প্রাথমিক প্রকাশনা তিন প্রকারের। যথাঃ

ক, জার্নাল (Journal)
খ, কনফারেন্স প্রসিডিং (Conference proceeding)
গ, টেকনিক্যাল রিপোর্ট (Technical Report)

ক, জার্নাল ঃ

জার্নালের প্রতিটি প্রকাশনায় অনেকগুলো প্রবন্ধ থাকে। প্রতিটি প্রবন্ধে লেখক নতুন তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান দেয়। বিজ্ঞান বিষয়ক জার্নালে কোন বিষয়ের উপর ব্যাপক আলোকপাত করে। আবার কোন কোন বিষয়ে নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচিত হয়।

খ, কনফারেন্স প্রসিডিং ঃ

যে প্রকাশনা কোন সভা সমিতি বা কনফারেন্সে উপস্থাপিত তথ্যাদি সংরক্ষণ করে তাকে কনফারেন্স প্রসিডিং বলে। প্রতিটি প্রকাশনাই একটি একক কনফারেন্সের উপর রচিত। এই সকল প্রকাশনার প্রবন্ধগুলোতে অন্যান্য সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির তুলনায় পরিমাণগত অনেক পার্থক্য পাওয়া যায়।

গ, টেকনিকাল রিপোর্ট ঃ

একমাত্র গবেষণার প্রকাশিত রিপোর্টকে টেকনিক্যাল রিপোর্ট বলা হয়। এগুলোকে অনেক সময় অপ্রকাশিত প্রকাশনা হিসাবেও বিবেচনা করা হয়। অনেক সময় এই সকল রিপোর্ট পুনর্লিখিত হয়। পান্ডুলিপি থেকে পুনর্মুদ্রণ বা কাছাকাছি মুদ্রণ পদ্ধতি যেমন মিমিও গ্রাফিং (Mimiographing), ডিটোইং (Detoing), মালটিলিথিং (Multilithing) বা ফটো কপিং এর দ্বারা পুনর্লিখিত হয়।

২. মাধ্যমিক প্রকাশনা ঃ

এই ধরনের প্রকাশনার উদ্দেশ্য হল সকল প্রকার প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী তথ্য প্রকাশ করা। পাঠকদের নতুন তথ্য পরিবে-

Dhaka University Institutional Repository

শনে সহযোগিতা করার প্রয়াসে অনেক প্রকার প্রকাশনা চালু করা হয়েছে। যার সাহায্যে পাঠকগণ বর্তমান ও অতীতের তথ্যগুলো সহজে পেতে পারে। মাধ্যমিক প্রকাশনা চার প্রকার—

ক, কারেন্ট এওয়ারনেস্ জার্নাল (Current Awareness Journal)

খ, ইনডেক্সিং জার্নাল (Indexing Journal)

গ, এবাসট্রাকটিং জার্নাল (Abstracting Journal)

ঘ, লাইব্রেরী ক্যাটলগ (Library catalogue)

ক, কারেন্ট এওয়ারনেস জার্নালঃ

এইসব জার্নাল বিজ্ঞানীকে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে নতুন তথ্য সম্বলিত প্রকাশনা সম্পর্কে সজাগ থাকতে সহায়তা করে। জার্নালগুলোতে বিষয় সারণী (table of context) তালিকা ভুক্ত থাকে। এতে কোন নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সম্প্রতিকালের প্রবন্ধ থাকে। এগুলোর প্রধান সুবিধা হল সময়ানুবর্তিতা। এ জার্নাল পত্রস্থতে তেমন কোন মেধা অপচয়ের প্রয়োজন হয় না তাই এগুলো খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হতে পারে। অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট বিষয় সংঘটিত হবার সাথে সাথেই ফলাফল সমেত অর্থাৎ Table of contexts সহ প্রকাশিত হতে পারে।

খ, ইনডেক্সিং জার্নালঃ

কোন বিষয় বা কোন লেখক সম্পর্কে কোন প্রকাশনায় প্রকাশিত নিবন্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করাই ইনডেকসিং জার্নালের প্রধান বৈশিষ্ট। এর প্রতিটি প্রকাশনাই কেবল বিষয় অথবা লেখকের কোন নির্দিষ্ট নিবন্ধের প্রসঙ্গ ধারণ করে থাকে। প্রতিটি প্রসঙ্গই লেখকের নাম,

নিবন্ধের শিরোনাম, জার্নালের নাম (যেখানে নিবন্ধ প্রকাশিত হয়) তালিকাভুক্ত করে। যে জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল, সেই প্রকাশনায় নিবন্ধটির যে বিশেষ দিক তুলে ধরা হয়েছে সে সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা দেওয়া হয়ে থাকে।

গ, এবসট্রাক্টিং জার্নালঃ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এইগুলো ইনডেক্সিং জার্নালের চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আবার কোন কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রাথমিক তথ্যের জন্য এই সকল জার্নাল অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রত্যেকটি প্রকাশনায় 'পিরিওডিকাল-এ' (Periodical) প্রকাশিত নিবন্ধের প্রসঙ্গ ধারণ করে এবং ঠিক ইনডেকসিং জার্নালের ন্যায় কাজ করে। ইনডেকসিং জার্নালের সাথে এর বৈসাদৃশ্য হল এই জার্নালে নিবন্ধের প্রতিটি প্রসঙ্গে একটি অনুচ্ছেদ থাকে যা তথ্যমূলক ভাবে তালিকা ভুক্ত প্রসঙ্গগুলোর বিষয় বস্তুকে প্রকাশ করে। প্রসঙ্গগুলোর সারাংশ বিষয় ভিত্তিতে এমন ভাবে সাজান থাকে যাতে সহজে বোধগম্য হয়। প্রতিটি প্রকাশনা নির্দিষ্ট বিষয়ের সারাংশের ইনডেক্সগুলো ধারণ করে। একটি প্রকাশনার পুঞ্জিভূত ইনডেক্সগুলো বার্ষিক বা ষান্মাসিক হিসাবে প্রকাশিত হয়। যেসব জার্নাল প্রাথমিক তথ্য প্রকাশ করে থাকে সেগুলোর নির্বাচিত নিবন্ধের সারমর্মও প্রকাশ করে থাকে যা পাঠকদের আগ্রহ সৃষ্টির ব্যাপারে সহায়ক।

ঘ, লাইব্রেরী ক্যাটলগঃ

৭৪ ও পরবর্তী পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে—

৩. কনসোলিডেটিং পাবলিকেশনঃ

এই প্রকাশনায় নথিকৃত তথ্যাদি ক) মূল্যায়িত খ) সংক্ষিপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

গ) সরলীকৃত করা থাকে এবং বিক্ষিপ্ত বিষয়কে একটি ... কাঠামোর আওতায় আনা হয়। গ্রন্থাগারে যে ধরনের কনসোলিডেটিং পাবলিকেশন সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয় সেগুলো হল পর্যালোচনা বা পর্যবেক্ষণ (Review), পাঠ্য পুস্তক (Text book), হ্যান্ড বুক (Hand boo , বিশ্বকোষ, অভিধান ইত্যাদি। সংশ্লিষ্ট বই পুস্তকের পর্যালোচনা, গবেষণা বিজ্ঞান সাহিত্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্রমান্বয়ে যতই প্রকাশিত সাহিত্যের পরিমাণ বাড়ছে ততই তার গুরুত্ব বাড়ছে। সংশ্লিষ্ট বই পুস্তকের পর্যালোচনা করার জন্য পূর্বে প্রকাশিত একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রাথমিক তথ্যের প্রতি লেখকের বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। লেখককে বিষয়টি সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এভাবে প্রস্তুত নিবন্ধটি হবে নিম্নরূপ—

১, প্রকাশিত কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের সংক্ষিপ্তভাবে পূর্ণ পর্যবেক্ষিত তথ্য

২, কোন কলা বা কৌশলের সারাংশ

৩, প্রসঙ্গ সমেত নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান ভিত্তিক উপাত্ত উপস্থাপনকারী।

একটি ভাল পর্যালোচনার মাধ্যমে সন্ধানকারী পাঠক কোন বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংক্ষিপ্ত, সুনির্বাচিত এবং সুসংগঠিত অবস্থায় পেতে পারে এবং তা তথ্যের প্রকৃত উৎসের অনুসন্ধান দেয়। প্রয়োজনবোধে পাঠক প্রাথমিক নিবন্ধগুলো পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। এজন্য পাঠককে কোন বিষয়ের ইনডেক্সিং এবং এবস্ট্রাকটিং জার্নাল অনুসন্ধান করার প্রয়োজন হয়, যদি তা পর্যালোচনা প্রকাশের একবছর বা দু'বছর আগে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

মনোগ্রাফ (Monograph)

এই প্রকার পুস্তকে কোন একক বিষয়কে সম্পূর্ণভাবে পর্যালোচনা করা হয়। একজন নতুন পাঠকের নিকট এ জাতীয় প্রকাশনা একটি গবেষণা কার্যের ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। পাঠ্য পুস্তক হল ব্যাপক বিষয়ের নির্বাচিত ও সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা।

এগুলো শিক্ষার্থী ও কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয়। অন্যান্য কনসোলিডেটিং পাবলিকেসন (consolidating publication) হল বিশ্বকোষ—যা বিষয়ের (topic) সংক্ষিপ্ত সার; অভিধান—যা শব্দের ব্যাখ্যা দেয় (defines term) এবং Audio—visuals—যেমন, ছবি, রেকর্ড, টেপ। অডিওভিসুয়াল প্রাথমিক তথ্যের উৎস হিসাবে কাজ করে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলীর উত্তর দান (Answering reference question)

গ্রন্থগারিকের কর্মদিবসের কিছু সময় অতিবাহিত হয়—সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উত্তর দানে। বিষয়টি গ্রন্থাগার ব্যবহারের অভ্যাস এবং ব্যবহারকারীদের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। এছাড়া গ্রন্থগারীকের উন্নত মানের সেবা কার্যক্রমের উপরও নির্ভর করে। একজন পাঠক বা গবেষক যদি বুঝতে পারেন যে গ্রন্থগারিক অধিক নির্ভরশীল তাহলে গ্রন্থাগার ব্যবহারে তিনি অধিক আগ্রহী হবেন এবং গবেষণার তথ্যাদি সংগ্রহে উৎসাহিত থাকবেন।

টোকা বা নোট প্রস্তুত করণ (Note Taking)

স্নাতক পর্যায়ে গবেষণার অতি প্রয়োজনীয় একটি করণীয় হল নোট টুকে রাখা, তাতে প্রয়োজন অনুসারে তা হাতের কাছে পাওয়া যায় ও ব্যবহার করা যায়। গবেষণার প্রতিবেদনকে গ্রহণ যোগ্য, নির্ভর যোগ্য, মূল্যবান এবং যুক্তিপূর্ণ ভাবে প্রণয়নের জন্য গবেষক বিভিন্ন বই পুস্তক, পত্র পত্রিকা, বিভিন্ন লেখকের বক্তব্য, মতামত ইত্যাদি থেকে প্রয়োজনীয় অংশ বিশেষ টুকে রাখেন। গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যান্য লেখকের বক্তব্য, উদ্ধৃতি, সংজ্ঞা ইত্যাদি টুকে রাখা এবং পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োজন অনুসারে এসব ব্যবহার করা যায়। নোট টুকে রাখার বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ৬"×৪" ইঞ্চি শেট কার্ড ব্যবহার করা হয়। একটি কার্ডে একটি মাত্র বিষয় থেকে নোট টুকে রাখা

Dhaka University Institutional Repository

যায়। কার্ডে কি বিষয়ে নোট করা হয়েছে তা শিরোনামের মত সংক্ষেপে লিখতে হবে। তারপর উদ্ধৃতি আকারে লেখকের বক্তব্য নিজ ভাষায়, সংক্ষিপ্তাকারে, বা মূল্যায়ণের মাধ্যমে টোকা বা নোট গৃহীত হতে পারে। টোকার নীচে গ্রন্থপঞ্জীর ন্যায় লেখকের নাম, বইয়ের নাম, প্রকাশকের নাম, পৃষ্ঠার নম্বর ইত্যাদি দিতে হবে, নোট কার্ডে গৃহীত তথ্যাদি পরে পাদটীকায় ব্যবহার করা যেতে পারে। এর সাহায্যে গবেষক ধারাবাহিক ভাবে কোন্ তথ্যের পর কোন তথ্য ব্যবহার করবেন তা সহজে নির্ধারণ করতে পারেন। নোট কার্ডের ব্যবহার অত্যন্ত আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মত।

একটি নোট কার্ডের নমুনা—

Definition of research hypothesis
A research hypothesis is the statement of expected out come that is based on theory or previous research. "অনুমিত সিদ্ধান্ত হল কোন সমস্যার সম্ভাব্য ফলাফলের বর্ণনা যা একটি তত্ত্ব বা অতীত গবেষণা থেকে গৃহীত।"
David R. cook and N. Kenneth Lafleur, A Guide to Educational Research, Boston—London—Sydney: Allyn and Bacon Inc, 1975, pp—19.

চিত্র—৬ নোট কার্ড

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

গবেষণার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির একটি তালিকা প্রস্তুত করা গবেষকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

সুসংগঠিত এবং ধারাবাহিকভাবে গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করার জন্য ৫"×৩" গ্রন্থপঞ্জী কার্ড ব্যবহার করা হয়। বিশেষ কোন পুস্তকের উপর গ্রন্থপঞ্জী কার্ড প্রস্তুত করা হলে কার্ডে কার্ড নং উল্লেখ করা প্রয়োজন। এছাড়া লেখকের নাম, পুস্তকের নাম, প্রকাশকের নাম, প্রকাশনার স্থান, তারিখ, পৃষ্ঠা নম্বর ইত্যাদিও উল্লেখ করা হয়। কোন লেখনীর শেষে সংযোজিত গ্রন্থপঞ্জী যে পদ্ধতিতে লিখিত হয়, ঠিক সেই পদ্ধতিতে গ্রন্থপঞ্জী কার্ডও প্রস্তুত করা হয়। তবে কল নং কার্যকরী গ্রন্থপঞ্জীতে থাকে না। গ্রন্থপঞ্জী কার্ডের শেষ অংশে পুস্তকটির সার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা প্রয়োজন। একটি প্রকাশনা বা পুস্তকের জন্য একটি মাত্র কার্ড ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ একটি গ্রন্থপঞ্জী কার্ড:

৩৪ তম বর্ষ
৭৯ তম সংখ্যা
ঢাকা, শনিবার

উপসম্পাদকীয় "নিবেদন ইতি"
দৈনিক ইত্তেফাক ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৯৩ পৃঃ ৮
১। মনোবিজ্ঞানের একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় হল পজিটিভ থিংকিং। কোন বিষয়েই নেতিবাচক চিন্তা না করিয়া বিষয়কে ইতিবাচক চিন্তা করা।
পৃঃ ২

চিত্র—৭

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়
ঐতিহাসিক গবেষণা

ইতিহাস হচ্ছে মানব কর্মের একটা অর্থপূর্ণ, সম্পূর্ণ, সঠিক, সার্থক স্বাক্ষর। বংশানুক্রমিক ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বিবরণীকে ইতিহাস বলা যায় না। সত্য ঘটনা যা কোন একটি বিশেষ স্থানে, বিশেষ সময়ে ঘটে গেছে তার উপর ভিত্তি করে ইতিহাস রচিত হয়। অতীত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানকে জানবার জন্য মানব জাতি ইতিহাস পাঠ করে। অতীত ঘটনাবলীর উন্নয়ন ও সংস্কার লিপিবদ্ধ এবং সংরক্ষণ করে। এর সাহায্যে অতীতকে জানা যায়, অতীত থেকে জ্ঞান আহরণ করা যায় এবং অতীত ঘটনাবলীর সঙ্গে বর্তমান ঘটনাবলীর সম্পর্ক উদঘাটন করা যায়। ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে কিছুটা সঠিকতার সঙ্গে তারও আন্দাজ পাওয়া যায়। এই জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ তার ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে থাকে।

ইতিহাস কোন ব্যক্তি বিশেষ, দল, আদর্শবাদ, আন্দোলন বা প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে রচিত হয়। পৃথক পৃথক ভাবে এদের কোনটাই ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত হয় না যদি এদের দেশ, জাতি বা সমাজের প্রতি কোন অবদান না থাকে। যে ব্যক্তি কোন দেশের বিশেষ কোন আদর্শবাদে, আন্দোলনে অথবা প্রতিষ্ঠানে অবদান রাখতে পারে সে ব্যক্তি হয় ইতিহাসে আলোচনার বিষয় বস্তু।

ইতিহাস জানার প্রয়োজনীয়তা নানাবিধ। ইতিহাসের আলোকে একজন ব্যক্তিকে বিচার বিশ্লেষণ করা যায়, বর্তমানকে বুঝা যায়, বর্তমানের সঙ্গে অতীতের সম্পর্ক জানা যায়, ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে তার একটা আভাস পাওয়া যায়। কোন দল, প্রতিষ্ঠান, আন্দোলন, আদর্শবাদ ইত্যাদির একটি চিত্র পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক গবেষণা কাকে বলে ?

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে অতীত ঘটনাবলীর বর্ণনা এবং বিশ্লেষণ করাকে ঐতিহাসিক গবেষণা বলে। যে সব গবেষণায় দলিল এবং পুরাতন রেকর্ড পাঠে নতুন তথ্য ও নীতি সম্বন্ধে জানা যায় তাদেরই দলিল ভিত্তিক বা ঐতিহাসিক গবেষণা বলা হয়। অতীতের যে কোন সত্য ঘটনা যা কোন একটি বিশেষ সময় একটি বিশেষ স্থানে ঘটে গেছে তার উপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক গবেষণা করা হয়। অতীতের যে ঘটনা বা বিষয়ের অস্তিত্ব ছিল তা হবে গবেষণার বিষয়বস্তু। বৈজ্ঞানিকগণ দেখতে চান অতীত ঘটনাবলীর সত্যতা ও সূত্র কি ছিল ? গভীর ভাবে অনুসন্ধান করে তারা অতীত থেকে জ্ঞান অন্বেষণ করে থাকেন। এই গবেষণা পদ্ধতি অন্যান্য গবেষণা পদ্ধতির মত। অন্যান্য পদ্ধতির মত এই গবেষণায়ও সমস্যা চিহ্নিত করণ, অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, তথ্য সংগ্রহ, বিন্যাস এবং বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। সংগৃহীত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে অনুমিত সিদ্ধান্ত যাচাই করে তা গৃহীত হলে প্রতিবেদন লেখা হয়। এইসব ধাপের মধ্য দিয়ে নতুনভাবে অতীতকে জানা যায়, অতীতের সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্পর্ক বুঝা যায়।

এই ধরণের গবেষণা শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে ইতিহাস, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি মানবিক বিষয় সমূহে। ঐতিহাসিকগণ এই পদ্ধতি এত বেশী ব্যবহার করেন যে এই পদ্ধতি ঐতিহাসিক গবেষণা নামে অধিক পরিচিত। যদিও এই গবেষণা অতীতের কার্যাবলী ও ঘটনাবলী অনুসন্ধান করে, তবুও বর্তমান বিষয়েও এর ব্যবহার অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। শত্রুদের সাংকেতিক লিপির পাঠোদ্ধারের জন্য মার্কিন ক্রিপটোগ্রাফারগণ এই পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। এই পদ্ধতির ব্যবহার কেবলমাত্র ঐতিহাসিক গবেষণাতেই সীমাবদ্ধ নয়। এই ধরনের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে সর্বপ্রাচীন গবেষণাপদ্ধতি বলে আখ্যায়িত করা যায়। এরিস্টোটল গ্রীক নাটক ও কবিতা পাঠে এই দলিল ভিত্তিক গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন। বর্তমানে এই পদ্ধতিকে আরো উন্নত করা হয়েছে। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ ও দার্শনিকরা যে ভাবে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন বর্তমান প্রয়োগ পদ্ধতি তার চেয়ে অনেক বেশী উন্নততর। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত দলিল ও রেকর্ডে যে সব প্রাথমিক তথ্য থাকে সেগুলো

Dhaka University Institutional Repository

যৌক্তিকতার সঙ্গে এই গবেষণায় সাজানো হয়। এইসব প্রামাণিক তথ্য ইতিপূর্বে অজ্ঞাত ঘটনাকে প্রতিষ্ঠিত করে, অথবা অতীত ও বর্তমান ঘটনার সম্পর্ক, এদের মানবিক উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য এবং চিন্তাধারাকে সঠিক ভাবে প্রকাশ করে। এই পদ্ধতি সাধারণতঃ মানব জাতি সম্পর্কীয় তথ্যাদি জানবার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়। মানব জাতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় এমন রেকর্ডপাঠও ফলপ্রসূ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ভূতত্ত্ববিদগণ শিলাস্তর (rockstrata) ও জীবাশ্ম (fossils) বিষয়ক অধ্যায়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এইসব অধ্যায় থেকে পৃথিবীর জন্মসংক্রান্ত ঘটনাবলীর ইতিহাস জানা যায়। এই ধরনের দলিল লিখিত কোন রেকর্ড নয়। এমন কি মানুষের কোন কার্যক্রমের চিহ্ন বহন করে না। এগুলো প্রাকৃতিক ঘটনার নিদর্শন মাত্র। এসব পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ এবং স্থায়ী রেকর্ড হিসাবে অল্পবিস্তর কাজ করে। পূর্ণাঙ্গ নির্ভুল তথ্য পরিবেশন না করলেও জীবাশ্ম থেকে প্রাগৈতিহাসিক জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারি যা লিখিত কোন দলিল থেকে আমরা পাই না। এইসব দলিলের ভিত্তিতে কেমন করে গবেষণা করা যায় তা আলোচনা করার পূর্বে কেন এই গবেষণা করা হবে তা সর্বপ্রথম বিবেচনা করা প্রয়োজন। এই কেন এর উত্তর হল মানুষের জানার আকাঙ্ক্ষা। প্রাগৈতিহাসিক বা ঐতিহাসিক জ্ঞানের কোন ব্যবহারিক মূল্য থাকুক বা না থাকুক মানুষ অতীত ঘটনা সম্পর্কে জানতে এবং তৎসম্পর্কে গবেষণা করতে আগ্রহী। এতএব, এইসব তথ্যপাঠে মানুষের কৌতূহল থাকার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। অধিকন্তু, অতীত ঘটনাবলী সম্পর্কিত জ্ঞান আমাদের বর্তমান কার্যাবলীকে পরিচালিত করতে পারে। অতীতকে জানবার জন্য এবং অতীত থেকে জ্ঞান আহরণ করে অতীতকে বর্তমান কালের সাথে তুলনা করে ভবিষ্যৎ কাজের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। অতীতকে বাদ দিয়ে কোনদিন ভবিষ্যৎ গড়ে উঠতে পারে না। যেমন, কোন বিষয় অধ্যয়ন করলে ভবিষ্যতে বেশী কাজে লাগবে তা জানতে হলে বিষয়টির অতীত ইতিহাস জানা প্রয়োজন। আবার আধুনিক ভাবধারা সম্পর্কে জ্ঞানের গভীরতায় স্তরে পৌঁছবার মূল উৎস এবং ক্রমবর্ধনের ধাপগুলো সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য। এসব ক্ষেত্রে দলিলপত্র কেবলমাত্র প্রাচীন নিদর্শনের মূল্যায়ণ করে না বরং মানুষকে বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে এবং আমাদের

নিজেদের সম্বন্ধে চিন্তা করার শক্তিকে বৃদ্ধি করে। আমরা গবেষণা করি প্রথমতঃ অতীত ও বর্তমান রেকর্ডসমূহ সম্যক উপলব্ধির জন্য, দ্বিতীয়তঃ তাদের মধ্য দিয়ে অতীত ঘটনাবলী আবিষ্কার করার জন্য; তৃতীয়তঃ অতীতের লেখক বা সৃজনকারী সম্পর্কে জানার জন্য। একমাত্র গবেষণার মাধ্যমে আমরা এসব সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি।

ঐতিহাসিক গবেষণার তথ্যাদি শিক্ষাক্ষেত্রে নানা প্রকারে প্রয়োগ করা যায়। এই গবেষণালব্ধ জ্ঞান শিক্ষাবিদদের অতীব প্রয়োজনীয়। এসব জ্ঞান থেকে অতীতে প্রচলিত শিক্ষার রীতিনীতি ও শিক্ষার তত্ত্ব সম্পর্কে জানা যায়। অতীতের শিক্ষার রীতিনীতির প্রয়োগ ও ফলাফল উপলব্ধি করা এবং তার মূল্যায়ণের মাধ্যমে ভবিষ্যতে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ণের জন্য সুপারিশ করা যায়। প্রয়োজন অনুসারে প্রচলিত শিক্ষার রীতিনীতি ও শিক্ষার তত্ত্বের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যায় এবং এদের সুফল ও কুফল নির্ধারণ করা যায়। এসব রীতিনীতি, তত্ত্ব কি প্রকারে প্রসার লাভ করল, কি প্রকারে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত আছে, শিক্ষার গুরুত্ব, শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক এবং শিক্ষার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে জানা যায়।

ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি অন্যান্য গবেষণা পদ্ধতির চাইতে কঠিন এবং কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। প্রথমতঃ ধরা যাক সমস্যা চিহ্নিত করণ। অতীত ঘটনাবলী যার সাথে গবেষকের বিশেষ কোন পরিচয় নেই এবং যে ঘটনা থেকে তিনি বহুদূরে সরে এসেছেন এ ধরনের ঘটনাবলী থেকে সমস্যা চিহ্নিতকরা সহজ সাধ্য নয়। ঐতিহাসিক গবেষণার সমস্যা ছোট আকারের হওয়া বাঞ্ছনীয়। ছোট সমস্যার সুষ্ঠ বিশ্লেষণ সম্ভবপর। নতুন গবেষকদের বড় আকারের সমস্যা বাছাই করার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ঐতিহাসিক গবেষকরা জানেন যে ঐতিহাসিক গবেষণা হল সীমিত আকারের সমস্যার অতি গভীরে অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করে তথ্য অনুসন্ধান করা। বড় আকারের সমস্যার উপরিভাগ বিশ্লেষণ করা নয়। অতি সচেতনতার সঙ্গে অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহীত হওয়া প্রয়োজন। কেন না অনুমিত সিদ্ধান্তই তথ্য সংগ্রহ করা এবং বিশ্লেষণ করার প্রতি আলোকপাত করে। ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

অনুমিত সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনুমিত সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে গৃহীত না হলে ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য সংগৃহীত তথ্যাদি শুধুমাত্র ঘটনার বিবরণীতে পর্যবশিত হয়। এর দ্বারা নতুন সত্যের সন্ধান পাওয়া, বর্তমানকে বুঝা এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারনা করা, কিছুই সম্ভবপর হবে না। এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা ও বিশ্লেষণ করা অন্যান্য গবেষণার চেয়ে কঠিন। কারণ তথ্য সংগ্রহ করার জন্য গবেষককে অন্যের বর্ণনা, অন্যের অভিজ্ঞতা এবং অন্যের লেখনীর উপর নির্ভর করতে হয় অর্থাৎ এই তথ্য পরোক্ষভাবে সংগৃহীত হয়ে থাকে। যিনি গবেষক তিনি হয়ত সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না, তিনি নিজেও হয়ত সেই ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেন নি এবং ঘটনা ও গবেষকের মধ্যে ইতিমধ্যে অনেক ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে। গবেষণার জন্য ঘটনাটিকে পুনরায় ঘটানো সম্ভবপর নয়।

নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করার জন্য অনেক সময় গবেষককে ধ্বংসাবশেষের উপর নির্ভর করতে হয়। প্রচুর যুক্তির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদির বিন্যাস ও বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন। বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করার জন্য যতদূর সম্ভব প্রাথমিক বা মৌলিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ঐতিহাসিক গবেষণার এই বিশেষ দিকটি সম্পন্ন করার জন্য ঐতিহাসিক গবেষককে একজন জ্ঞানী, তথ্য সমৃদ্ধ, কল্পনাশক্তির ও সৃজনীশক্তির অধিকারী হতে হবে। এই পদ্ধতির গবেষণায় প্রচুর অভিজ্ঞতা থাকলে এইসব গুণাবলী অর্জন করা সম্ভবপর।

তথ্যের উৎস

ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বা প্রমাণ যে কাল বা পাত্র থেকে সংগ্রহ করা হয় তাকে উৎস বা Source বলা হয়। গবেষক যে জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন সেটাই ঐতিহাসিক গবেষণার তথ্যের উৎস। এই উৎস প্রধানত: দুই প্রকার, যথা:—

১। প্রাথমিক উৎস (Primary source)

মাধ্যমিক উৎস (Secondary source)

১. প্রাথমিক উৎস:

প্রত্যক্ষভাবে দর্শনকারী বা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীর লিখিত বা মৌখিক বিবরণীকে প্রাথমিক উৎস এবং সংগৃহীত তথ্যকে প্রাথমিক বা মূল তথ্য বলা হয়। এইসব তথ্য ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য অত্যাবশ্যক। প্রাথমিক উৎস এবং এই উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যথা:—

ক. ইচ্ছাকৃত বা ঐচ্ছিক
খ. অনিচ্ছাকৃত বা অনৈচ্ছিক
গ. লিখিত
ঘ. অলিখিত

X 3519
Photo Copy
Dhaka University Library

ক. ইচ্ছাকৃত বা ঐচ্ছিক:

যে সকল তথ্য ইচ্ছাকৃত ভাবে ভবিষ্যতে জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করা হয়েছে তাদের ইচ্ছাকৃত প্রাথমিক তথ্য বলা হয়। যেমন, কোন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বা প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণকারীর লিখিত বা মৌখিক রেকর্ড বা বর্ণনা। ঐতিহাসিক ও দলিল ভিত্তিক গবেষণার প্রাথমিক উৎসসমূহ হল: সংবিধান, উইল, ছবি, গবেষণা রিপোর্ট, ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ, মানচিত্র, বিজ্ঞাপন, পেন্টিং, লিপি ইত্যাদি।

খ. অনিচ্ছাকৃত বা অনৈচ্ছিক:

যে সকল তথ্য ইচ্ছাকৃত ভাবে সংরক্ষিত নয় অথচ ঐতিহাসিক গবেষণার নির্ভরযোগ্য প্রাথমিক তথ্যরূপে ব্যবহার করা যায় তাদের অনিচ্ছাকৃত তথ্য বলা হয়। ইচ্ছাকৃত প্রাথমিক তথ্যের মতো এই সব তথ্যও ভবিষ্যতে জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অনিচ্ছাকৃত প্রাথমিক উৎসসমূহ হল: কোন দল, কোন যুগ বা ব্যক্তিবিশেষের ধ্বংসাবশেষ, জীবাশ্ম, কঙ্কাল, খাদ্য, বাসন কোসন,

Dhaka University Institutional Repository

জামা-কাপড়, ছবি, মুদ্রা, পেন্টিং, দালান-কোঠা, আসবাব পত্র, চলচ্চিত্র, সমাধি ইত্যাদি।

গ. লিখিত :

১। অফিসের দলিলপত্র ও রেকর্ড সমূহ—প্রশাসনিক রিপোর্ট, সভার কার্যবিবরণী, ক্লাব কমিটির কার্যবিবরণী, বৈধ দলিল পত্রাদি, আইন ও আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী, ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা প্রণীত দলিল বা চুক্তিপত্র, প্রশংসা পত্র, লাইসেন্স, সনদ পত্র, অফিসের কার্যাবলীর রেকর্ড, সিদ্ধান্ত সমূহ ইত্যাদি। এসব হচ্ছে তথ্যের সর্বোত্তম উৎস। কারণ অফিস কর্মকর্তাগণ এসব রেকর্ডপত্র নির্ভুল, সুষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গরূপে প্রস্তুত করেন এবং সংরক্ষণ করেন।

২। সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ও সাময়িকী—সংবাদ পত্রগুলো যদিও সব সময় নির্ভুল তথ্য পরিবেশন করে না, তা সত্ত্বেও আদর্শ সংবাদ পত্রগুলো বিশ্বের ঘটনাবলীর স্থায়ী রেকর্ড সংরক্ষণের কাজ করে থাকে। ম্যাগাজিন এবং সাময়িকীতে খবরাখবর প্রকাশিত হয়ে থাকে কিন্তু সত্য ঘটনা এবং মতামত প্রচারের ক্ষেত্রে প্রভেদ রয়েছে। স্বভাবতঃই অফিস কর্মকর্তা এবং পন্ডিত ব্যক্তিদের গবেষণা কর্ম থেকে প্রাপ্ত তথ্য যেমন সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ, সংবাদপত্র ও বার্ষিকীতে প্রকাশিত তথ্যাদি তেমন নয়। সুতরাং অফিস রেকর্ড পাওয়া না গেলে সংবাদপত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩। চিঠিপত্র ও ব্যক্তিগত ডায়েরী—জীবন চরিত সম্পর্কিত গবেষণায়—লেখকের চিঠিপত্র ও ডায়েরী আকারে লিখিত ব্যক্তিগত কাগজ পত্রের বিবরণী, জন সাধারণের মতামত অপেক্ষা অধিকতর নির্ভর যোগ্য।

৪। জীবনী, আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা—কোন ব্যক্তি বিশেষের জীবনে সংঘটিত ঘটনাবলী পর্যালোচনা করার জন্য জীবনী, আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা বিশ্বস্তসূত্রে পাওয়া গেলে অত্যন্ত সহায়ক হয়। অনেক সময় এসব তথ্যাদির দ্বারা নতুন ঘটনাও সংযোজিত হতে পারে। সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ ও মৌলিক উৎসের ব্যবহারই শ্রেয়। অবশ্য যদি এদের সন্ধান পাওয়া যায়।

৫। ঐতিহাসিক লিপি ও গবেষণা—বিজ্ঞান সম্মত তথ্যানুসন্ধানে ঐতিহাসিক লিপি ও গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর অনেকটা আস্থা স্থাপন করা যায়। মূল দলিল পত্রাদির ব্যবহার সর্বক্ষেত্রেই অধিকতর নির্ভর যোগ্য।

৬। অতীতের বর্ণনা ভিত্তিক গবেষণা—অতীতের পান্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও নতুন তথ্যাদি অনুসন্ধানের জন্য এসব দলিল ভিত্তিক গবেষণার গুরুত্ব রয়েছে।

৭। সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধীয় লিপি—কোন লেখকের চিন্তধারা সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি কোন বিশেষ ঘটনা সম্বন্ধে সঠিক তথ্যের সন্ধান দিতে পারে।

৮। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী—এধরনের তথ্য লিখিত বা মৌখিক হতে পারে। যদি অনুসন্ধানকারী কোন ঘটনা নিজে না দেখেন, তাহলে উক্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর লিখিত বা মৌখিক বিবরণীকে অনুমোদিত উৎস হিসাবে গণ্য করা যায়। অর্ধশতাব্দী আগে বাংলাদেশের স্কুলগুলির অবস্থা পর্যালোচনার কাজে এমন ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলোচনা সহায়ক হবে যাঁরা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কোন আদর্শ স্কুলের শিক্ষক অথবা ছাত্র ছিলেন। অবশ্য মানুষের অতীত স্মৃতির অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী সময়ে পূর্ববর্তী ঘটনার তথ্যাদি সম্ভবপর হলে প্রত্যক্ষদর্শীর লিখিত বিবরণ থেকে নেওয়া শ্রেয়। (সাধারণত ঃ লিখিত বিবরণী মৌখিক বিবরণী অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য, তবে সব সময় এবং সর্বক্ষেত্রে এটা সত্য নাও হতে পারে।)

ঘ. অলিখিত :

১। প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ—এ জাতীয় ধ্বংসাবশেষ লিখিত রেকর্ডের মত দলিল পত্র নয় বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক গবেষণার প্রাথমিক তথ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

২। বিবিধ—চারুকলার কাজ, সঙ্গীত রচনা, স্মৃতিসৌধ, স্মৃতিস্তম্ভ ইত্যাদিও গবেষণার তথ্যের উৎস হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. মাঝামাঝি পর্যায়ের :

কিছু কিছু তথ্য আছে যেগুলো ইচ্ছাকৃতও নয়, অনিচ্ছাকৃতও নয়, আবার লিখিতও নয়, অলিখিতও নয়। মুখে মুখে চলে আসছে এবং এদের মাঝামাঝি। যেমন, গ্রাম্য গাথা, লোকগীতি, খনার বচন ইত্যাদি।

২. মাধ্যমিক উৎস :

কোন ঘটনায় যিনি অংশগ্রহণ করেছেন বা প্রত্যক্ষভাবে ঘটনাটি অবলোকন করেছেন তার লিখিত বা বর্ণিত তথ্যাদি অন্য কেউ লিখলে বা বর্ণনা করলে তাকে মাধ্যমিক উৎস এবং সংগৃহীত তথ্যকে মাধ্যমিক বা মূলজ তথ্য বলা হয়। প্রাথমিক তথ্যের অভাবে এই তথ্য ব্যবহার করা যেতে পারে। মাধ্যমিক তথ্য প্রাথমিক তথ্যের মত নির্ভরযোগ্য নয়। মূল দলিল পাওয়া গেলে তার অনুলিপি ব্যবহার করা অনুমোদন যোগ্য নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মূল দলিল সংগ্রহ করতে অধিক সময় ব্যয় হয় ও অর্থের অপচয় হয়। এসব ক্ষেত্রে আশু কাজ সমাধার জন্য প্রস্তুতকৃত অনুলিপি সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে। কোন লেখকের পুস্তকে বা প্রবন্ধে অন্যকোন লেখকের উদ্ধৃতি থাকলে তাকে প্রাথমিক তথ্যরূপে গণ্য করা যায় না। এধরনের তথ্য ব্যবহার করতে গবেষককে অবশ্যই মূল গ্রন্থ বা প্রবন্ধের অনুসন্ধান করতে হবে। বেশীর ভাগ ইতিহাস গ্রন্থ, বর্ষপঞ্জী, পাঠ্যপুস্তকাদি অথবা বিশ্বকোষ তথ্যের প্রাথমিক উৎসরূপে গণ্য হতে পারে না। কারণ এ জাতীয় তথ্য ও ভাবধারা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত নয়। অন্যের লেখা থেকে এগুলো সংগৃহীত ও সংকলিত হয়ে থাকে। যদি কোন তথ্য নানা হাত ঘুরে গবেষকের হাতে আসে তাহলে তা মূল বক্তব্যের একটি বিকৃত রূপে পর্যবসিত হয়ে যায়। অনেক সময় কোন গবেষণার উদ্দেশ্য বিশেষে মাধ্যমিক তথ্যকে প্রাথমিক তথ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় গবেষণার বিষয়বস্তুঃ 'ভারতীয় ঐতিহাসিক আর, সি, মজুমদার, এল, মুখার্জী ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণের

মতে ভারতে অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রচার।' স্বভাবতই এ ধরনের গবেষণার জন্য ইতিহাস গ্রন্থ সমূহ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। ইতিহাস গ্রন্থ মাধ্যমিক উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্র ও উদ্দেশ্যের জন্য ইতিহাস গ্রন্থকে প্রাথমিক উৎস হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

দলিল পত্রাদি সযত্নে সংরক্ষণের গুরুত্ব জ্ঞানী ব্যক্তিরা উপলব্ধি করেন। সতর্কতার সঙ্গে সংরক্ষিত না হলে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র হারিয়ে যাওয়া বা অপহৃত হবার সম্ভাবনা থাকে, ফলে গবেষক তাঁর গবেষণা কর্মে অহরহ অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন এবং বিরক্ত বোধ করেন। আবার কখনও কখনও দুরভিসন্ধিমূলক ভাবেও দলিল পত্রাদি বিনষ্ট হতে পারে। যদি বিষয়বস্তু সম্পর্কিত মূল্যবান উৎসগুলি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে নির্ধারিত গবেষণা সম্বন্ধে গবেষক নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন এবং দলিল পত্র সংগ্রহের কাজে তাঁর উৎসাহও বাধাপ্রাপ্ত হয়। গবেষক উপলব্ধি করেন যে একটি তথ্য নষ্ট হওয়ার অর্থ, যেন কোন জীবন ইতিহাসের একটি পাতা নষ্ট হওয়া।

গবেষক যে সকল দলিল পত্র ব্যবহার করে থাকেন সেগুলো কোমল হস্তে নাড়চাড়া করার জন্য আপনা থেকে একটি তাগিদ আসে। ব্যবহারের পর এগুলোকে যত্ন সহকারে সাজিয়ে রাখাও তাঁর কর্তব্য।

ঐতিহাসিক সমালোচনা

ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য সমালোচনা অপরিহার্য। সাহিত্যিকরা যেভাবে সাহিত্যের সমালোচনা করে থাকেন, ঐতিহাসিক সমালোচনা ঠিক সে রকম নয়। এই সমালোচনার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও পদ্ধতি সবই পৃথক। একে বিশ্লেষণও বলা চলে। এই সমালোচনার প্রধান এবং প্রথম উদ্দেশ্য হল সংরক্ষিত বা সংগৃহীত তথ্যকে প্রামাণ্যকরণ করা ও অতীত ঘটনাবলীর সত্যতা যাচাই করা। বস্তুতঃ ঐতিহাসিক গবেষণায় সমালোচনার মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্যের মূল্যায়ণ করা হয়ে থাকে।

দেখা গেছে যে, ঐতিহাসিকরা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যব-

Dhaka University Institutional Repository

হার করে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন না। গবেষণার জন্য অতীত ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি করা সম্ভবপর নয়। কাজেই যিনি কোন ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন বা কোন ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেছেন তাঁর লেখনী বা বর্ণনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। আবার প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা বা লেখনী যদি অন্যকেউ বর্ণনা করেন বা লেখেন সেটাও ঐতিহাসিক গবেষণার তথ্যের উৎস হতে পারে। এ ধরনের লেখনী বা বর্ণনার মধ্যে ভুল থাকতে পারে। ফলে তথ্য সংগ্রহ করার পর ঐতিহাসিক গবেষক সরাসরি সেসব ব্যবহার করতে পারেন না। এ জন্যই সমালোচনার প্রয়োজন হয়। সমালোচনার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যকে এমনভাবে যাচাই করতে হয় যাতে অপ্রয়োজনীয়, মিথ্যা কিংবা ভুল ভ্রান্তিমূলক তথ্যাদি বাদ দেওয়া যায়।

নির্ভরযোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য তথ্যকে ঐতিহাসিক গবেষণায় ঐতিহাসিক প্রমাণ বলা হয় (historical evidence)। এই প্রমাণ অনুমিত সিদ্ধান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করা ও তথ্যাদি বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়ার উপায় হল ঐতিহাসিক সমালোচনা। এই সমালোচনা দুই প্রকার—

১. বাহ্যিক সমালোচনা
২. আভ্যন্তরীণ সমালোচনা

১. বাহ্যিক সমালোচনা:

বাহ্যিক সমালোচনা দ্বারা বই পুস্তক, দলিল পত্র এবং অন্যান্য তথ্যাদির অকৃত্রিমতা ও আইনানুগতা যাচাই করা হয়। কোন পুস্তক, দলিল বা অন্য কোন লিখিত তথ্য রচনার সালটির সঠিকতা নির্ণয় করা দরকার। নানা প্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এই সঠিকতা নির্ণয় করা যায়। যেমন, ব্যবহৃত শব্দের বানান, মুদ্রণের টাইপ, ব্যবহৃত ভাষা, পৃষ্ঠা, স্বাক্ষর ইত্যাদির সঙ্গে চিরাচরিত ঘটনাবলীর কতটুকু সাদৃশ্য রয়েছে তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যাচাই করা যায়। কোন কোন সময়ে দলিল পত্রে এমন সব তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলো আপাতঃ দৃষ্টিতে সত্য বলে মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে সত্য নয়। মানুষের ইতিহাস ধোঁকা বাজি ও জালিয়াতিতে কলুষিত থাকতে পারে। এছাড়া সত্য উদ্‌ঘাটনে ভুল হওয়াও সম্ভবপর। বিখ্যাত লোকের চিঠিপত্র গুলো বিভিন্ন ভুলসহ যেভাবে বাজারে পাওয়া যায়, সেগুলো ধোঁকাবাজি ও জালিয়াতি বলেও সহজে প্রমাণিত হয়। লিঙ্কনের চিঠি বলে কথিত এমন একটি জাল পত্রে জালকারী তার অপারদর্শিতার জন্য ধোঁকাবাজির প্রমাণ নিজেই দিয়েছিল। এই জালপত্রে ক্যানসাস্ অঙ্গরাজ্যের উল্লেখ ছিল, কিন্তু ক্যানসাস্ অঙ্গরাজ্য জনবসতি শুরু হয় আরও বিশ বছর পরে। একমাত্র গভীর বাহ্যিক সমালোচনা দ্বারা এসব প্রতারণা উপলব্ধি করা সম্ভবপর। বাহ্যিক সমালোচনা অবশ্য নতুন দলিল পত্রাদির ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য যেগুলোর মূল্যায়ণ পূর্বে হয় নি। শিক্ষাক্ষেত্রে অসংখ্য তথ্য পাওয়া যায় যাদের সত্যতা পূর্বে নির্ধারিত। কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত গবেষক সন্দিগ্ধমনা থাকবেন। সন্তোষজনক প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন তথ্যকে গ্রহণ না করাই পান্ডিত্যের লক্ষণ। হস্তলিখিত বেসরকারী ধরনের দলিল পত্রের মূল্যায়ণের সময় গবেষক অবশ্যই সেগুলো দলিল লেখকের অন্যান্য হস্তলিপির সঙ্গে তুলনা করে নেবেন। কোন কোন সময় এসব হস্তলিপিতে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য অতি সহজেই ধরা পড়ে। গবেষক যদি কোন বিশেষ লেখকের হস্তলিপির সঙ্গে সুপরিচিত হন তাহলে আর সমস্যা থাকে না। অনেক সময় কোন হস্তলিপি লেখকের হস্তলিপি কিনা তা নির্ধারণ করা আদৌ সহজ হয় না। এমন কি একটি স্বাক্ষরও বিরাট এক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

কোন দলিলের অকৃত্রিমতা যাচাইয়ের অন্যান্য পদ্ধতিও আছে। যেমন, যে পদার্থের উপর তা লিখিত তার ভৌতিক ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ। কাগজ তৈরীর পদ্ধতি যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। অতএব, দলিলের কাগজ কবে এবং কোথায় প্রস্তুত হয়েছিল তা নির্ধারণ করতে পারলে সেই দলিল মূল্যায়ণের কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যায়। হস্তলিপিতে ব্যবহৃত কালির ক্ষেত্রেও ভৌতিক ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রযোজ্য। সম্প্রতি অতি বেগুনী রশ্মি ও প্রতিপ্রভা (flurosence) আলোক চিত্রের সাহায্যে দলিল পরীক্ষা করার এক অভিনব ও আকর্ষণীয় পদ্ধতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। কোন দলিল পরীক্ষার পর অসামঞ্জস্য মনে হলে সেটা গ্রহণ যোগ্য হবে না। যুক্তির সাহায্যে অবশ্যই এই অসামঞ্জস্য খন্ডাতে হবে। টাইপ করার পদ্ধ-

Dhaka University Institutional Repository

তিতেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলা মুদ্রাক্ষর যন্ত্রের প্রচলন বেশীদিন আগের কথা নয়। দলিলে ব্যবহৃত মুদ্রাক্ষরযন্ত্রের ছাপা থেকেও দলিলের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা যায়।

২. আভ্যন্তরীণ সমালোচনা ঃ

আভ্যন্তরীণ সমালোচনা দ্বারা তথ্যাদির বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা, এর সঠিকতা, নির্ভর যোগ্যতা, নির্ভুলতা, যথার্থতা ও যৌক্তিকতা যাচাই করা হয়। ঐতিহাসিক গবেষণার কোন ঘটনা বাহ্যিক সমালোচনা দ্বারা সঠিক বলে নির্ধারিত হলে আভ্যন্তরীণ সমালোচনা দ্বারা তা আরও গভীর ভাবে যাচাই করা প্রয়োজন। বাহ্যিক সমালোচনা হল তথ্য সম্পর্কিত আর আভ্যন্তরীণ সমালোচনা হল তথ্যে কি বলা হয়েছে তা যাচাই করা। দলিলটি সত্য বলে প্রমাণিত হলে স্বভাবতঃই গবেষকের মনে একটি প্রশ্ন জাগবে তথ্যের উৎস হিসাবে এর গুরুত্ব কি? এর দ্বারা সরবরাহকৃত তথ্য সমস্যাটি সমাধানের জন্য সহায়ক হবে কিনা?

আভ্যন্তরীণ সমালোচনায় দলিল-পত্র বা বই পুস্তকের লেখকের বা রচয়িতার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়, যিনি লেখক তিনি কি ধরনের ব্যক্তি ছেলেন, সৎ ছিলেন কিনা, তাঁর মধ্যে কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল কিনা, ঘটনা ঘটার কত বছর পরে তিনি লিখেছেন, কোন প্রলোভনে লিখেছেন কিনা ইত্যাদি। লেখক যখন লিখেছেন তখন তাঁর স্মরণশক্তি এবং মানসিকতা কেমন ছিল তা যাচাই করা হয়। এসব যাচাই করার জন্য গবেষক নিজেকে কতগুলো প্রশ্ন করবেন: এগুলো হল লেখক কে? তাঁর সঙ্গে এবং দলিলের সঙ্গে সম্পর্ক থাকাই কি স্বাভাবিক? বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক প্রত্যাশা করা যায় কি? তথ্য সরবরাহ কি নির্ভুল ও সঠিক ছিল? তিনিই কি এটার প্রকৃত স্রষ্টা? সম্ভাব্য লেখক কি বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত স্বভাব দ্বারা তথ্যের বিবরণ সমূহ সমৃদ্ধ করতে সক্ষম ছিলেন? এ ধরনের অনুসন্ধানমূলক আরো অনেক প্রশ্ন প্রকৃত তথ্যের অনুসন্ধান করে একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গবেষককে সাহায্য করে।

কোন দলিলের মর্ম সহজও হতে পারে আবার কোন কোন

ক্ষেত্রে তা এমন জটিলও হতে পারে যে এর মর্ম উদ্ধারের জন্য নানা বিষয়ের উপর গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। তবে গবেষণা পরিচালনার জন্য দলিলের সঠিক মর্ম উদ্ধার করা যে অপরিহার্য তা সুস্পষ্ট। এজন্য আভ্যন্তরীণ সমালোচনা ও বাহ্যিক সমালোচনা এই দু'টোই ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য প্রয়োজন। এই দুই সমালোচনা একই সঙ্গে প্রয়োগ করা যেতে পারে বা অন্যান্য ভাবেও করা যেতে পারে।

সংযোগ সাধন বা সংশ্লেষণ ঃ

বাহ্যিক সমালোচনা ও আভ্যন্তরীণ সমালোচনার পর বিক্ষিপ্ত আকারের তথ্যাদিকে অর্থপূর্ণ ভাবে একত্রিকরণের মাধ্যমে একটি রূপদান করাকে সংযোগ সাধন বা সংশ্লেষণ বলা হয়। সংযোগ সাধনের পর তথ্যাদিকে অনুমিত সিদ্ধান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজে লাগানো হয়। অনুমিত সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হলে শুরু হবে ইতিহাস গ্রন্থ রচনা, ফলাফল প্রকাশ বা প্রতিবেদন লেখন। ঐতিহাসিক গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সার্বিকীকরণ সহজ সাধ্য নয়। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে সার্বিকীকরণ সম্ভবপর আবার কেউ কেউ এর বিপরীত মতামত পোষণ করেন তবে তাঁরা সার্বিকীকরণের বাস্তব প্রয়োগ ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান। ধারাবাহিক ভাবে ও নিয়ম অনুযায়ী ঐতিহাসিক গবেষককে অবশ্যই একজন সৃজনীশক্তি সম্পন্ন, জ্ঞানী, কল্পনা শক্তির অধিকারী, ধৈর্যশীল, সৎ ও উৎসাহী ব্যক্তি হতে হবে।

ক্যার্ডিফের বিশালাকৃতির দানব[1]

ঐতিহাসিক সমালোচনা দ্বারা কি প্রকারে সংগৃহীত তথ্যাদি যাচাই করা হয় এবং যাচাইয়ের পর অসত্য ও ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয় তার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা গেল। ঘটনাটির নাম হল 'ক্যার্ডিফের বিশালাকৃতির দানব'[1]. এটি একটি সত্য ঘটনা। ১৮৬৯ সালে নিউইয়র্কের কাছে সেরা-

1. John W. Best, Research in Education. New Jersey, Prentice-Hall, INC, Eaglewood Cliffs, 1970, P. 105.

Dhaka University Institutional Repository

কিউস নামক স্থান থেকে মাত্র তের মাইল দূরে কার্ডিফ নামক এক গ্রামে এক কৃষকের শস্য ক্ষেত্রের তিন ফুট নীচে একটি বিশালকায় নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল। এই নরকঙ্কালটির ওজন ছিল প্রায় তিন হাজার পাউন্ড এবং লম্বা ছিলো দশ ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি।

এই নরকঙ্কালটিকে প্রথমে ইয়েল ইউনিভার্সিটির দুইজন বিজ্ঞানী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কোন বিশালকায় মানুষের জীবাশ্ম বলে ব্যক্ত করলেন। তারপর এক এক করে নিউইয়র্ক স্টেট মিউজিয়াম থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক, হারভার্ড থেকে চিকিৎসাবিদ, এমনকি বহু সংখ্যক ধর্মীয় যাজকগণও জীবাশ্মটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মিলিত অভিমত প্রকাশ করলেন যে এটি কোন বিশালাকৃতির মানুষের জীবাশ্ম। ধর্মীয় যাজকগণ আরও জানালেন যে 'জেনেসীস' নামক ধর্মীয় গ্রন্থে উল্লেখিত এ ধরণের মানবাকৃতির সত্যতা প্রকাশ করছে এই জীবাশ্মটি।

কিছুকাল পর পি, টি, বার্নাম নামে এক ভদ্রলোক যার নিউইয়র্কে একটি মিউজিয়াম ছিল তিনি বহু অর্থের বিনিময়ে নরকঙ্কালটি ক্রয় করে তাঁর মিউজিয়ামে দর্শনীয় বস্তু হিসাবে সংরক্ষণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্থানীয় লোকজন বিশেষত জীবাশ্মটির মালিক এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না। এতে বার্নাম বহু অর্থ ব্যয় করে একজন ভাস্করের সাহায্যে ঐ জীবাশ্মটির হুবহু অনুকরণ তৈরী করে তার মিউজিয়ামে দর্শনীয় বস্তু হিসাবে স্থাপন করেন। এই সংবাদ কার্ডিফ গ্রামে পৌঁছানোর পর জীবাশ্মের মালিকগণ আদালতের সাহায্যে কঙ্কালটিকে মিউজিয়ামে দর্শনীয় বস্তু হিসাবে আর না রাখার জন্য আদেশ জারী করার চেষ্টা চালালেন। কিছুদিন পর প্রমাণিত হল যে শুধু বার্নামের কঙ্কাল নয় আসল জীবাশ্মটিও পুরোপুরি মিথ্যা এবং নকল। এই খবরে উৎসাহিত হয়ে কোন এক সংবাদ পত্রের সংবাদদাতা ঘটনাটির উপর আরও গভীর ভাবে অনুসন্ধান চালিয়েছিল। গভীর অনুসন্ধানের পর জানা গিয়েছিল যে মিঃ হাল নামে একজন পাথর খোদাইকারক অন্য এক-জন শিল্পীর সহায়তায় কার্ডিফের কঙ্কালটির প্রতিকৃতি তৈরী করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তারা জিপসাম নামক একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করেছিলেন এবং বিভিন্ন স্থান থেকে বহু যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করেছিলেন। মিঃ হাল আইওয়া অঙ্গরাজ্যে তার

ভগ্নির বাড়ীতে থাকাকালীন 'জেনেসিস' নামক ধর্মীয় গ্রন্থে, 'পৃথিবীতে নর দানব'—এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল, এই আলোচনা থেকে ধারণা করা হয় যে পৃথিবীতে এক সময়ে এই ধরনের বিশালকায় মানুষের বসবাস ছিল। এই আলোচনার ফলশ্রুতি স্বরূপ মিঃ হালের এই ধরনের নরমূর্তি তৈরী করার প্রবল বাসনা জাগে। নিজের গ্রামে ফিরে আসার পর বিশালাকৃতির নর দানবটি তৈরী করেন এবং সালফিউরিক এসিডের সাহায্যে কঙ্কালটির আয়ু বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঘটনাটি ঘটার ঠিক এক বছর পূর্বে মাটির তিন ফুট নীচে এটাকে পুঁতে রাখা হয়। এক বছর পর ঐ স্থানে একটি কূপ খনন করার জন্য কিছু শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছিল যারা কূপ খনন করতে গিয়ে আকস্মিকভাবে কঙ্কালটি আবিষ্কার করে। তারপর কঙ্কালটিকে প্রদর্শনীর জন্য সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রাখা হয়। দলে দলে লোকজন বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে সেটি দেখার জন্য গভীর আগ্রহে ভীড় জমাত। আর এই কঙ্কালের মালিকরা সহজে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে লাগল। বস্তুতঃ সহজ অর্থ উপার্জন করাই এর উদ্দেশ্য ছিল। আদালত মিঃ হালকে দোষারোপ করেনি। বরং তার তৈরী পাথরের কঙ্কালটির অর্থ উপার্জন ক্ষমতা এবং বহুসংখ্যক বিশেষজ্ঞদের ধোঁকা দেওয়ার দক্ষতা মিঃ হালকে প্রশংসিত করেছিল। তাহলে এ ঘটনা থেকে যা পাওয়া গেল তা হল, কেবলমাত্র বাহ্যিক সমালোচনা বা বাহ্যিক ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা কোন অতীত ঘটনার সত্যতা যাচাই করা সমীচীন নয়। আভ্যন্তরীণ সমালোচনারও প্রয়োজন। এই ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিশেষজ্ঞদের বাহ্যিক সমালোচনা দ্বারা নরকঙ্কালটি যে মিথ্যা তা প্রমাণিত হয় নি। কিন্তু আভ্যন্তরীণ সমালোচনা বা গভীর অনুসন্ধানের পর প্রমাণিত হল যে কার্ডিফের আসল নর কঙ্কালটি সম্পূর্ণ রূপে নকল ও মিথ্যা। ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ উভয় সমালোচনাই অপরিহার্য। দুই সমালোচনা একত্রে করা যায় বা পৃথক পৃথক ভাবেও করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

বর্ণনামূলক গবেষণা

বর্ণনামূলক গবেষণা বর্তমান সমস্যাবলীর উপর ভিত্তি করে করা হয়। এই গবেষণায় বর্তমান বিষয়ের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। এটা চলমান বর্তমান। বর্তমানে যে সকল অবস্থা ও রীতিনীতি প্রচলিত আছে, যে সকল বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব পোষণ করা হচ্ছে, যে সকল প্রক্রিয়া চলছে, প্রতিক্রিয়া অনুভূত হচ্ছে এবং যে সকল প্রবণতা দেখা যাচ্ছে সেগুলোর উপর ভিত্তি করে এই গবেষণা করা হয়।

বর্ণনামূলক গবেষণা প্রক্রিয়ায় তথ্য সংগ্রহ করা ও তালিকা করে সাজানো ছাড়া আরও করণীয় আছে। প্রয়োজন অনুসারে সংগৃহীত তথ্যের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা এই প্রক্রিয়ার একটি দিক। অতএব বর্ণনা হচ্ছে সাধারণতঃ শ্রেণীবিভাগ, ব্যাখ্যা, পরিমাপন এবং মূল্যায়ণের মাধ্যমে তুলনামূলক একটি প্রক্রিয়া। সংগৃহীত তথ্যাদির তুলনামূলক আলোচনা করা হয়, কারণ এবং ফলাফলের মধ্যে সম্পর্ক দেখা হয়। এটি সমাজ বিজ্ঞানের সব চাইতে প্রচলিত পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতির চাইতে সহজ এবং বিশেষ ধরনের। এই গবেষণায় মানুষের আচার আচরণ-বিশ্লেষণ করা হয়। বিভিন্ন অবস্থায় মানুষ কেন বিভিন্ন রকম ব্যবহার করে থাকে তার কারণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করাও এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

সামাজিক গবেষণায় ব্যবহৃত অনেক শব্দের অর্থের ব্যাপারে তেমন মতৈক্য পরিলক্ষিত হয় না। বর্ণনামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন কোন গ্রন্থকার বর্ণনাভিত্তিক এই গবেষণাকে বর্ণনামূলক গবেষণা আবার কেউ কেউ জরীপ ভিত্তিক গবেষণা বলে আখ্যায়িত করেছে। যেহেতু সব রকমের গবেষণার মধ্যে একটি বর্ণনামূলক দিক থাকে, সেহেতু এই আখ্যান সর্বাংশে সন্তোষজনক নয়। অন্যদিকে 'জরীপ ভিত্তিক গবেষণা' এই শব্দটি প্রায়শঃই একটি বিশেষ ধরনের বর্ণনামূলক গবেষণা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কোন সাধারণ মতৈক্য না থাকায় শব্দ বাছাইর ক্ষেত্রে কিছুটা স্বেচ্ছাচারিতা হতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে এই উপলব্ধি থাকা দরকার, যে শব্দই বাছাই করা হোক না কেন তা যেন যুক্তির মাধ্যমে যাচাই করা হয়। গ্রন্থকার, বর্ণনামূলক আখ্যানটি এই বিশ্বাস থেকে বাছাই করে থাকেন যে বর্ণনামূলক অধ্যায়টির আলোচনা যথাযথ যুক্তিপূর্ণ ও সঙ্গতিপূর্ণ হবে। আখ্যানবিদ্যা থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল পদ্ধতিবিদ্যার এই বিশদ শ্রেণী বিভাগের প্রকৃত উপলব্ধি করা, শিক্ষাগত সমস্যাবলী সমাধানের অনুকূলে তার মূল্য অনুধাবন এবং সমস্যা সমাধানের জন্য তার বিভিন্ন প্রয়োগে কিছু দক্ষতা অর্জন করা।

এটাও ব্যক্ত করা দরকার যে বর্তমান বিষয়ের বর্ণনাই এই গবেষণার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া নয়। তথ্য সংগ্রহ করা, প্রচলিত অবস্থা ও রীতিনীতি সমূহের বর্ণনা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হলেও সংগৃহীত তথ্যের বিন্যাস, বিশ্লেষণ এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত গবেষণার কার্য পরিপূর্ণ হয় না। এইসব সিদ্ধান্ত তুলনামূলক ভাবে কোন না কোন প্রকার সম্পর্ক বিচারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব অর্থ আবিষ্কারই সমগ্র প্রক্রিয়াটির কেন্দ্রবিন্দু।

মানুষের আচার আচরণ সম্পর্কে কিছু কিছু পরীক্ষা মূলক গবেষণা গবেষণাগারে ও কর্মক্ষেত্রে যথাযথ ভাবে পরিচালনা সম্ভব হলেও সমাজ বিজ্ঞানের প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে বর্ণনামূলক। বাসস্থান, শ্রেণীকক্ষ, কারখানা, শিল্পকেন্দ্র, চিত্তবিনোদন কেন্দ্র, মিলন কেন্দ্রের স্বাভাবিক অবস্থা, মানুষের আচার-আচরণ, প্রণালী বদ্ধভাবে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এই বিশ্লেষণ মানুষের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নিরূপনকারী বিভিন্ন উপাদান বা প্রভাবের রূপান্তর ঘটাতে পারে। উপাদান সমূহের এই রূপান্তরের মাধ্যমেই সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের কল্যাণ সাধনে অধিকতর ফলপ্রসূ প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

বর্ণনামূলক গবেষণার প্রকারভেদ ঃ

বর্ণনামূলক গবেষণাকে প্রধাণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ—

Dhaka University Institutional Repository

১. জরীপ গবেষণা (Survey study)
২. কেস্ স্টাডি (Case study)

১, জরীপ গবেষণায় অনেকগুলো ক্ষেত্র থেকে একটি বিশেষ সময়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। অনেকগুলো ক্ষেত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় বলে একে ব্যাপক এবং ক্রস্-সেক্শন্যাল (extensive এবং Cross-Sectional) বলা যায়। এটি অধিকতর ব্যাপক এবং তথ্যবিশ্বের একটি প্রচ্ছেদ সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধান। একটি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করলে বলা যায় ৫০০×১, অর্থাৎ পাচ'শ ক্ষেত্র থেকে মোটামুটি একবার অনুসন্ধান করে তথ্য সংগ্রহ করা হল।

২, কেস্ স্টাডিতে একটি বিশেষ ক্ষেত্র থেকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এটি গভীরতম এবং দীর্ঘস্থায়ী। একে গভীর এবং লন্জিটিউডিন্যাল (Intensive এবং Longitudinal) বলা যায়। একেত্রেও সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করলে বলা যায় ১×৫০০, অর্থাৎ একটি বিশেষ ক্ষেত্র থেকে পাঁচ'শ বার গভীরভাবে অনুসন্ধান করে তথ্য সংগ্রহ করা হল। এটি অধিকতর গভীর। এই ধরনের গবেষণায় একটি বিশেষ বিষয় ছাড়া অল্পসংখ্যক বিষয়েও সতর্কতার সঙ্গে তথ্যাদি সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়। এই দুই গবেষণার মধ্যে উদ্দেশ্যমূলক কোন পার্থক্য নেই, শুধুমাত্র পদ্ধতিগত পার্থক্য রয়েছে।

জরীপ গবেষণা পদ্ধতি ঃ

জরীপ পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে বহু সংখ্যক বিষয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এটি কোন বিশেষ ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সমূহ সম্পর্কিত নয়। এটি সার্বজনীন পরিসংখ্যানের সাহায্যে সীমিত দল বা তথ্য বিশ্বের একটি নমুনা থেকে পাওয়া তথ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণী। কোন স্থানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনার প্রথম পদক্ষেপ হবে, তথ্য সংগ্রহ করা অথবা যে অবস্থাটি বিরাজ করছে তার একটি স্পষ্ট ছবি তুলে ধরা। জরীপ দ্বারা সম্পূর্ণ জন সংখ্যা থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তা নয়। পুরো জন সংখ্যা

থেকে অতি সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে বাছাই করে ছোট আকারের একটি নমুনা দল গঠন করা যেতে পারে। এই নমুনা দল থেকে সংগৃহীত তথ্যাদির ফলাফল নমুনা দলটির বাইরে প্রযোজ্য হবে। আবার কোন কোন সময়ে জরীপ দ্বারা কোন সীমিত জন সংখ্যার বর্ণনাও দেওয়া যেতে পারে।

জরীপ গবেষণা একটি অতি প্রয়োজনীয় গবেষণা পদ্ধতি। এটি নিছক তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য বিন্যাস নয়। এতে একটি সুনির্দিষ্ট সমস্যা এবং এর একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকবে। এর জন্য একটি সুষ্ঠ পরিকল্পনা, সযত্ন বিশ্লেষণ, সংগৃহীত তথ্যাদির ব্যাখ্যা, যুক্তিসংগত এবং নিপুণতার সঙ্গে লিখিত বিবরণী থাকবে।

জরীপ পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যথা—

১. সামাজিক জরীপ (Social survey)
২. জনমত জরীপ (Public-opinion survey)
৩. স্কুল জরীপ (School survey)
৪. বাজার জরীপ (Market survey)

১. সামাজিক জরীপ ঃ

মানুষ ছাড়া গাছপালা, পশুপক্ষীর মধ্যেও সামাজিক জরীপ করা যায়। ডারউইনের বিবর্তনের তত্ত্ব এই ধরনের গবেষণার উপর ভিত্তি করে প্রবর্তিত। সমাজের বিভিন্ন সমস্যাবলী এই প্রকার গবেষণার বিষয়বস্তু। বেকার সমস্যা, কিশোর অপরাধ, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, যাতায়াত সমস্যা, শিক্ষার্থীদের উপর টেলিভিশনের প্রভাব, সহ-শিক্ষা ইত্যাদি সমস্যা সামাজিক জরীপ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে। সমাজ সংস্কার ও গঠনমূলক কর্মসূচী প্রণয়নের লক্ষ্যে এই গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। বিস্তৃত এলাকার অধিক সংখ্যক ক্ষেত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন হলে সাধারণতঃ প্রশ্নমালার ব্যবহার করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২. জনমত জরীপ ঃ

এই পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা বিভিন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কে জনমত যাচাই করা হয়ে থাকে। এই গবেষণা ছাড়া পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টেলিভিশন, জনসভা, গণভোট ইত্যাদির মাধ্যমেও জনমত যাচাই করা যায়। কোন দেশের বিরাজমান অবস্থার প্রতি জন সাধারণের দৃষ্টি ভঙ্গি, মতামত, প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা বা জ্ঞান সে দেশের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

কোন একটি বিশেষ বিষয়ে প্রতিটি ব্যক্তি থেকে মতামত সংগ্রহ করে জনমত জরীপ করা অনেক সময় সম্ভবপর নয়। এক্ষেত্রে নমুনা-দল গঠন করে মতামত সংগ্রহ করা যায়। কোন কোন উন্নয়নশীল দেশে বিভিন্ন ব্যাপারে কেবলমাত্র জনমত যাচাই করার জন্য পেশা দ্বার ব্যক্তিবর্গ এবং সংগঠিত দল রয়েছে, সরকারী কার্যাবলী ও নীতি এবং বিভিন্ন দল ও দলের নেতার প্রতি জনসাধারণের মনোভাব, আস্থা, ধারণা ইত্যাদি যাচাই করার জন্য জরীপ গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

জনমত বিশ্লেষণ পদ্ধতির নানাবিধ অসুবিধা রয়েছে। প্রথমতঃ সঠিক নমুনাদল গঠন করা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, নমুনা দলটি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন দ্বারা সংগঠিত হয়ে থাকে। এই দলে অন্তর্ভুক্ত স্বল্পশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে উদ্দেশ্যহীন ভাবে এবং না বুঝে উত্তরদানের প্রবণতা অত্যধিক প্রবল। তৃতীয়তঃ, পরিবর্তনশীল মতামত। মানুষের মতামত এবং অন্যান্য সব ধরনের আচরণ অত্যন্ত পরিবর্তনশীল। এইজন্য ছোট আকারের দল গঠন করার অনতিবিলম্বে মতামত সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয় যাতে পরিবর্তনের জন্য অধিক সময় না থাকে। মতামত জরীপ করার জন্য সচরাচর মতামত গ্রহণকারী অনুসন্ধান পত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৩. স্কুল জরীপ ঃ

স্কুলের বিভিন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হওয়া, বিভিন্ন চাহিদা ও প্রয়োজন মিটানো এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে

এই ধরনের জরীপ পদ্ধতি পরিচালিত হয়ে থাকে। স্কুলের বিরাজমান পরিস্থিতি, পাঠ্যসূচী, পাঠ্যক্রম, শিক্ষোপকরণ, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা, ছাত্র-শিক্ষকের আনুপাতিক হার, পাঠাগার, বাজেট, আর্থিক অবস্থা, বিনোদন, যাতায়াত ব্যবস্থা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বর্তমান পরিস্থিতি থেকে লব্ধ তথ্যাদি এবং ভবিষ্যৎ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সুপারিশ সমূহ তৈরী করা হয়। কোন দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান অস্থিরতা, বিসৃঙ্খলা, শিক্ষার মানের নিম্নোগতি, পাঠ্যপুস্তকের অভাব, প্রশাসনিক দুর্বলতা ইত্যাদি সমস্যা সমাধানের জন্যও এই জরীপ পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে পারে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে জড়িত শিক্ষাবিদগণ শিক্ষা প্রশাসনে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞগণ, অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের থেকে সাক্ষাৎকার এবং প্রশ্নমালার সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

৪. বাজার জরীপঃ

এই পদ্ধতির সাহায্যে কোন পণ্য দ্রব্যের প্রতি জনসাধারণের মনোভাব, আগ্রহ, প্রতিক্রিয়া এবং বিজ্ঞাপনের কার্যকারিতা ও ফলাফল মূল্যায়ণ করা হয়ে থাকে। উৎপাদিত দ্রব্যাদির বাজার চাহিদা, জনপ্রিয়তা এবং কোন দ্রব্যের প্রতি জনসাধারণের বিরূপ মনোভাব রয়েছে কিনা, যাচাই করা এই জরীপের উদ্দেশ্য। শিল্প প্রতিষ্ঠানে এর প্রয়োগ অত্যধিক। দ্রব্যের আকার-আকৃতি গঠনকারক, প্রস্তুতকারক, বিতরণকারী এবং বিজ্ঞাপন দাতার নিকট এই পদ্ধতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বলাবাহুল্য, এই জরীপের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিবর্তন সাধন করা যায়। এটি অনেকটা মতামত জরীপের মত। আধুনিক কালে ঝুঁকি এড়ানোর জন্য বাজারে নতুন কোন দ্রব্য ছাড়ার আগে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বাজার জরীপের সাহায্যে জনমত যাচাই করে থাকে। অতি সতর্কতার সঙ্গে নমুনাদল থেকে সাক্ষাৎকার এবং প্রশ্নমালার সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষোপকরণ, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মহলের মনোভাব যাচাই করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

কেস্ স্টাডি (Case Study)

একটি বিশেষ বিষয়ে অথবা অল্পসংখ্যক বিষয়ে গভীরভাবে অনুসন্ধান করে কেস্ স্টাডি করা হয়ে থাকে। বিষয়টি কোন বিশেষ ব্যক্তি, কোন বিশেষ দল, অথবা কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত হতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্র, মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, পৌরনীতি, লোক প্রশাসন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যখন কোন বিশেষ ব্যক্তি বা একটি বিশেষ দল সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করা হয় তখন পদ্ধতিটি ব্যক্তিগত হয়ে যায়। কোন একটি বিশেষ বিষয়, ব্যক্তি বিশেষ, দল, প্রতিষ্ঠান বা পরিবারকে গবেষণার এক একটি ইউনিট হিসাবে গণ্য করা হয়। এর উদ্দেশ্য হল, একটি ইউনিটের জীবন-চক্র আলোচনা করে এর উত্থান-পতন, সামাজিক দিক এবং অন্যান্য বিভিন্ন দিক উদ্‌ঘাটন করা ও ধারাবাহিকভাবে তথ্যানুসন্ধান করা। এই বিশ্লেষণটি হবে বিস্তারিত, গভীর, সম্পূর্ণ, নির্দেশিত, পরিবর্তন সাপেক্ষ, ধারাবাহিক এবং নির্বাচিত বিষয়টি জীবন-চক্রের ক্রমোন্নতি সম্পর্কীয় তথ্যাদির। তথ্যাদির অতি গভীরস্তরে পৌঁছাতে হয় এবং এর উপাদানগুলোর প্রভাবে উক্ত বিষয়টির যেসব বিশেষ বিশেষ দিকে পরিবর্তন বা বিকাশ সাধিত হয় সেগুলোর বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। নির্বাচিত বিষয়টির সম্পূর্ণ জীবন ইতিহাস বা জীবন ইতিহাসের অংশ বিশেষ বিশ্লেষণের মাধ্যমে পর্যালোচনা করা হয়, এটি একটি বহুল পরিচিত অনুসন্ধান পদ্ধতি। শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যাবলীর প্রকৃতি, ধারা ও বিকাশ উদ্‌ঘাটন করার জন্য এটি একটি উপযুক্ত পদ্ধতি। একটি মাত্র শিশুকে নিয়ে সীমিত আকারেও এই গবেষণা করা যেতে পারে। শিশুটির দুর্বলতা, অসুবিধা বা অন্য কোন সমস্যা থাকলে সে সব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে ফলাফলের ভিত্তিতে সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

সমাজ কর্ম ও নির্দেশনার ক্ষেত্রে কেস্ স্টাডি সীমিতভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে সচরাচর ব্যক্তি বিশেষের উপর অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করা হয়। ব্যক্তি বিশেষের সমস্যাবলী উদ্‌ঘাটন করে সেগুলো দূরীকরণের এবং সংশোধনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অনুসন্ধান পর্বটা গবেষণা কার্যের মতো ব্রত ধারাবাহিক বা

নিয়ন্ত্রিত নয় এবং ব্যক্তি বিশেষের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার মধ্যে সীমিত থাকে। কিন্তু গবেষণার কেস্ স্টাডি অধিকতর গভীর এবং এ হচ্ছে একটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত অনুসন্ধান পদ্ধতি।

কেস্ স্টাডি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন এবং বিভিন্ন লোকসমাজকে নিয়েও করা যেতে পারে। বিস্তৃত এলাকা থেকে গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে কেস্ স্টাডি পরিচালনা করে মানুষের আচরণ সম্পর্কে নতুন এবং প্রচুর জ্ঞানলাভ করা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে লব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে সার্বিকীকরণ সম্ভবপর হয়।

অন্যান্য গবেষণার ন্যায় কেস্ স্টাডিও বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যথা—

১. লোক-গোষ্ঠি বিশ্লেষণ (Community Studies)
২. কারণ-সমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ (Causal-Comparative Study)
৩. সময় ও গতি বিশ্লেষণ (Time and Motion Study)
৪. কার্য-কলাপ বিশ্লেষণ (Activity Analysis)
৫. অনুসরণ মূলক বিশ্লেষণ (The Follow-up Study)
৬. ঘটনা-প্রবাহ বিশ্লেষণ (Trend Studies)
৭. দলিল-বা বিষয় বস্তু ভিত্তিক বিশ্লেষণ (Document or Content Analysis)

১. লোক-গোষ্ঠি বিশ্লেষণ :

এই পদ্ধতির সাহায্যে একটি বিশেষ স্থানে, একত্রিতভাবে বসবাসকারী একটি বিশেষ লোক সমাজের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। গবেষণার বিষয়বস্তু হিসাবে যে সকল লোকগোষ্ঠি নির্বাচিত হয় সেগুলোর কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। অবস্থান, আকার-আকৃতি এবং সাংগঠনিক দিক দিয়ে এসব লোকগোষ্ঠি স্বতন্ত্র হওয়া দরকার। এই বিশেষ প্রকারের লোকগোষ্ঠির অর্থনৈতিক অবস্থা, আকৃতি, জীবনের উদ্দেশ্য, ভৌগলিক অবস্থান, ঐতি-

Dhaka University Institutional Repository

হাসিক পটভূমি, বিনোদন, জীবন-যাপনের পদ্ধতি, প্রাকৃতিক সম্পদ, আবহাওয়া, ধর্ম, শিক্ষা, সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কৃতি, খাদ্য, আচার-আচরণ, বহিঃজগতের সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যে সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠান লোক সমাজটির স্বাস্থ্যগত এবং নিরাপত্তামূলক দিক তদারক করে থাকে তাদেরও মূল্যায়ণ করা হয়। বাংলাদেশে চাকমা, নাগা, গারো, সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতির উপর এই জরীপ পদ্ধতি প্রয়োগ করে গবেষণা করা যেতে পারে।

২. কারণ সমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ :

এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন ঘটনা, অবস্থা এবং ব্যবহারের কারণ সমূহ নির্ণয় করা, কারণ সমূহের তুলনামূলক আলোচনা করে গুরুত্বের ক্রমঅনুসারে সাজানো এবং প্রধান কারণ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। প্রধান কারণ সংশোধন অথবা দূরীকরণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার প্রচেষ্টা করা এই বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য। সামাজিক সমস্যাবলী সমাধান করা এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশ জানবার জন্যও এই প্রকার গবেষণার আবশ্যক হয়। অপরাধ নিরসনকারীরা (Criminologist) প্রায়ই এই ধরনের অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করে থাকে।

কারণ সমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতির উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, বিশ্লেষণের বিষয় হল, 'রাস্তায় প্রতিনিয়ত যান-বাহনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করার উপায়।' দুর্ঘটনা বিভিন্ন কারণে ঘটতে পারে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী প্রথমে দুর্ঘটনার কারণ সমূহ জানা প্রয়োজন। যান-বাহনের দুর্ঘটনার কারণ স্বভাবতই হতে পারে— যান্ত্রিক গোলযোগ, চালকের অজ্ঞতা, চালকের দক্ষতার অভাব, অস্বাভাবিক অবস্থায় গাড়ী চালান, রাস্তাঘাটের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব, পথচারীর অসাবধানতা ইত্যাদি। কারণ সমূহের ক্রমঅনুসারে সাজানোর পর যদি দেখা যায় যে যান্ত্রিক-গোলযোগই প্রধান কারণ, তাহলে আইন প্রবর্তন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যান বাহনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার একটি বাধ্যতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যান্ত্রিক কোন গোলযোগ নেই এই

ধরনের সার্টিফিকেট লাভের পর রাস্তায় গাড়ী চালানোর অনুমতি দেওয়া যায়। অথবা দ্রুতগতিতে গাড়ী চালানো যদি প্রধান কারণ বলে নির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে এক্ষেত্রেও আইন প্রণয়ন করে গাড়ীর গতিসীমা সীমিত করে দেওয়া যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই পদ্ধতির যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কোন ভ্রষ্ট বা স্কুল পালানো শিক্ষার্থীর মধ্যে স্কুল পালানো বা ভ্রষ্ট হবার যে সকল সাধারণ কারণ বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলো উদ্‌ঘাটন করা যেতে পারে। প্রধান কারণের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীটিকে সংশোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। একদল ভ্রষ্ট এবং একদল অভ্রষ্ট শিক্ষার্থীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, একদল অভ্রষ্ট শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন কতগুলো গুণাবলী কম বেশী রয়েছে যা ভ্রষ্টদের মধ্যে নেই। আবার একদল ভ্রষ্ট শিক্ষার্থীর সকলের মধ্যে এমন কতগুলো ত্রুটি কম বেশী রয়েছে যা অভ্রষ্টদের মধ্যে নেই। তাহলে ধরা যাবে, যে বৈশিষ্ট্য ভ্রষ্ট দলটিতে বিদ্যমান কিন্তু অভ্রষ্টদের মধ্যে নেই, সেই বৈশিষ্টই হবে ভ্রষ্ট বা অপরাধ প্রবণ হবার মূল কারণ। ঠিক এভাবে উন্নত মানের শিক্ষাদান ও অনুন্নতমানের শিক্ষাদানের মধ্যে বিদ্যমান কারণ সমূহ বিশ্লেষণ করে শিক্ষার মান উন্নত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হবে এই বিশ্লেষণ পদ্ধতির দ্বারা সামাজিক ও শিক্ষামূলক সমস্যাবলীর আশু সমাধান সম্ভবপর। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা যাবে যে এই পদ্ধতিরও অনেক অসুবিধা আছে। যেমন, কোন ঘটনার প্রকৃত মৌলিক কারণ নির্ধারণ করা কঠিন, যেকোন ঘটনা একের অধিক কারণে সংঘটিত হতে পারে, কেবলমাত্র মূল কারণ দূরীকরণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান নাও হতে পারে। অনেক সময় কারণ এবং ফলাফলের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করা কষ্টসাধ্য। এ ছাড়া অনেক কারণ একত্রিত হয়ে ঘটনা ঘটতে পারে।

৩. সময় ও গতি বিশ্লেষণ :

এটি একটা বিশেষ ধরনের সূক্ষ্ম ও উন্নত মানের বিশ্লেষণ পদ্ধতি।

METROPOLITON TEACHERS' TRAINING COLLEGE DHAKA DATE.....

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প প্রতিষ্ঠানে এর প্রয়োগ অত্যধিক। কোন একটি বিশেষ কর্মে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিচালনা পর্যবেক্ষণ এবং পরিমাপ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রয়োজন অনুসারে ক্যামেরা (Motion Picture Camera) ঘড়ি (Stop Watch) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য হল, কোন একটি বিশেষ কর্ম সম্পাদন করতে কতক্ষণ সময়ের প্রয়োজন হয় তা জানা এবং কর্মটি আরও উন্নতভাবে সম্পন্ন করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করা। সংগৃহীত তথ্যাদির বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নতমানের যন্ত্রপাতি, উদ্ভাবন, কাঁচামালের সদ্ব্যবহার, কম সময় এবং কম শক্তি ব্যয় করে অধিক দ্রব্য উৎপাদন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিভিন্ন পরীক্ষার সময় নির্ধারণ, পঠন দক্ষতার মাত্রা নিরূপণ, বয়স, স্তর এবং শ্রেণীভেদে শিক্ষার্থীর গ্রহণযোগ্য পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং উন্নতমানের শিক্ষোপোকরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৪. কার্যকলাপ বিশ্লেষণ :

এই পদ্ধতির সাহায্যে যোগ্যতা এবং দক্ষতা পরিমাপ করা হয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানে এর প্রয়োগ এবং প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। শিল্প প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য কর্মক্ষেত্রেও এটি প্রয়োগ করা যায়। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীদের নিয়ে এই গবেষণা করা হয়ে থাকে। একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উর্ধতন কর্মকর্তা, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক এবং বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তথ্যাদির বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের যোগ্যতা এবং দক্ষতা মূল্যায়ণ করা যায়। বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে কর্মীদের বিভিন্ন কর্মে যোগ্যতা বৃদ্ধি করার সুবন্দোবস্ত করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করা গেল। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক, বিষয় শিক্ষক, ক্রীড়া শিক্ষক এবং প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ রয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকের উপর অর্পিত দায়িত্ব বিশ্লেষণ করে নিরূপণ করা যায় তারা স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে কতদূর যোগ্য, দক্ষ, উৎসাহী, নিষ্ঠা-

বান এবং প্রাণবন্ত। এদের কারো মধ্যে যদি প্রয়োজনীয় গুণাবলীর অভাব থাকে, তাহলে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তা অর্জনে সহায়তা করা যায়। যেমন, শিক্ষকদের শিক্ষকতায় দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া চাকুরী-কালীন বা প্রাক-নিয়োগ প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

এই প্রকারে বিশ্লেষণ লব্ধ তথ্যাদি বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন,—কোন চাকুরীর ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করা, বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি বর্গের দক্ষতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং একই ধরনের কর্ম বা দায়িত্ব পালনকারী সকল কর্মীদের ভাতা একই পর্যায়ের হবে তা নির্ধারণ করা, যাতে কোন প্রকার বৈষম্য দেখা না দেয়।

৫. অনুসরণমূলক বিশ্লেষণ :

কোন শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচী বা কোন প্রশিক্ষণ কতটা ফলপ্রসূ হল তা এই প্রকার বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে জানা যায়। বিশেষ শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং কোন চিকিৎসা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। সংগৃহীত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে অনুসন্ধান করা হয়, উক্ত ব্যক্তিবর্গ প্রাপ্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ বা চিকিৎসা দ্বারা কতটা উপকৃত হয়েছে, যে প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রশিক্ষণ বা চিকিৎসা দান করেছে তা শিক্ষার্থীদের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করল এবং প্রদত্ত শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের মোট কার্যকারিতা কি, ইত্যাদি। এই বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হল, কোন প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত কর্মসূচী, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যক্রমের যথার্থতা নির্ধারণ করা এবং সংগৃহীত তথ্যাদির বিশ্লেষণের পর প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন কর্মসূচীর মূল্যায়ণ করা। মূল্যায়ণ শেষে কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত শিক্ষাক্রম, নির্দেশনা দান ও প্রশাসনিক কার্যাবলীর উন্নয়ন সাধন করার সুপারিশ করা যেতে পারে। উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচনেও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

METROPOLITAN TEACHERS' TRAINING COLLEGE
DATE.........

Dhaka University Institutional Repository

৬. ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণ ঃ

পরিবর্তন এবং বিবর্তন বুঝানই এই বিশ্লেষণ পদ্ধতির উদ্দেশ্য। এটি হচ্ছে ঐতিহাসিক এবং বর্ণনামূলক গবেষণার সংমিশ্রণ। অতীত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এবং বর্তমানের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে তা এই পদ্ধতির সাহায্যে কিছুটা সঠিক করে আন্দাজ করা যেতে পারে। কোন একটি স্থানে গত কয়েক বছরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং বর্তমানের মোট জনসংখ্যা—এই দুই তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে সে স্থানটিতে মোট জনসংখ্যার পরিমাণ কত হতে পারে তা আন্দাজ করা যায়। একই পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার, শিল্প এবং কৃষি খাতে উৎপাদিত দ্রব্যের বৃদ্ধি বা হ্রাসের হার, রাজস্ব, যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি আনুমানিক ভাবে বলা যায়। সকল প্রকার পরিকল্পনার জন্য এই গবেষণার প্রয়োজন। অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ বিগ্রহ, অর্থনৈতিক মন্দা এবং কারিগরি পরিবর্তনের জন্য এই বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া দ্বারা লব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা শেষ পর্যন্ত ঠিকভাবে কার্যকরী নাও হতে পারে।

৭. দলিল বা বিষয়বস্তু ভিত্তিক বিশ্লেষণ ঃ

তথ্যের অন্বেষণের জন্য ধারাবাহিক ভাবে সমসাময়িক দলিল পত্রের বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। দলিল ভিত্তিক তথ্যাদি সব সময় নির্ভরযোগ্য এবং সঠিক নাও হতে পারে। সেজন্য ঐতিহাসিক গবেষণার ন্যায় এই বিশেষ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত দলিল পত্রাদি সমালোচনার মাধ্যমে যাচাই করার পর ব্যবহার করা যেতে পারে, দলিল পত্র এবং তার বিষয় বস্তুর সঠিকতা এবং নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করার দায়িত্ব গবেষকের। দলিল নানা ধরনের হতে পারে। যেমন, লিখিত, ছাপানো, ছকের আকারে, কার্টুন, ছবি, ড্রয়িং, পেন্টিং ইত্যাদি। ঐতিহাসিক গবেষণার ন্যায় তথ্যের উৎস হিসাবে পুস্তক, ম্যাগাজিন, ডায়েরী, খবরের কাগজ, পাঠ্যসূচী, পাঠ্যক্রম, পত্র, আত্ম-

জীবনী, অফিসের রেকর্ড ও রিপোর্ট ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য হল—অতীতের কোন সত্যকে উদ্ধার করা এবং প্রচলিত রীতিনীতি ও অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া। এছাড়া এ বিশ্লেষণের প্রাপ্ত ফলাফল অন্যান্য কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, শিক্ষার্থীদের লেখনীতে ভুলের মাত্রা নির্ধারণ করা, পাঠ্য পুস্তক বা অন্যকোন লেখনীতে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব, প্রচারণা আছে কিনা মূল্যায়ণ করা এবং কোন লেখনীতে ব্যবহৃত ভাষার কাঠিন্যের তারতম্য স্থির করা যায়। এছাড়া ব্যক্তি বিশেষ, কোন দেশ, দল বা প্রতিষ্ঠান যেসব নমুনা (Symbol) ব্যবহার করে থাকে সেগুলো বিশ্লেষণ করা যায় কোন লেখকের লেখার ভঙ্গিমা, ধারণা, বিশ্বাস ইত্যাদিও উপলব্ধি করা যায়।

শিক্ষা গবেষণার জন্য দলিল ভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির তথ্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংগৃহীত তথ্য প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষা গবেষণায় ব্যবহার করা যেতে পারে। সামাজিক ও শিক্ষামূলক রীতিনীতির পরিবর্তন সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং এসবের মূল্যায়ণের জন্যও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। মাথা পিছু গড় আয় সম্পর্কে জানারও এটি একটি উপযুক্ত পদ্ধতি।

07/9/88

মনোভাব নির্ধারণ ঘটিত গবেষণা
(Motivation Research)

বর্ণনামূলক গবেষণার একটি বিশেষ প্রকারের নাম মনোভাব নির্ধারণ ঘটিত গবেষণা। সম্প্রতিকালে এই পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। এটা অনেকটা বাজার জরীপের মত। সাধারণতঃ ব্যবসা ক্ষেত্রে ক্রেতাদের মনোভাব যাচাইয়ের জন্য এই গবেষণা ব্যবহার করা হয়। মনোভাব সম্পর্কিত গবেষণাটি ক্রেতাদের অন্তর্নিহিত রুচি এবং আগ্রহ যাচাইয়ের কাজে প্রয়োগ করা হয়। বিশেষ সাক্ষাৎকার পদ্ধতি এবং মনোবিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে ক্রেতাদের অবচেতন মনের ইচ্ছা যা ক্রেতারা নিজেরাও জানে না—সে সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এটা একটা পরোক্ষ পদ্ধতি, পরোক্ষভাবে লুক্কায়িত মনোভাব জানার চেষ্টা করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীদের

Dhaka University Institutional Repository

মনোভাব পরিমাপের গুরুত্ব অত্যধিক। ব্যবসা ক্ষেত্রে যেমন এই ধরনের গবেষণা ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে, শিক্ষাক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ যথেষ্ট। শিক্ষাক্ষেত্রে মনোভাব পরিমাপের দ্বারা শিক্ষার্থীদের কোন বিশেষ কাজে কৌতূহল ও আগ্রহের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এটি একজন শিক্ষার্থীকে সঠিক নির্দেশনাদানে সহায়তা করে। মনোভাব পরিমাপের দ্বারা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়াকে অধিকতর ফলপ্রসূ করা যায়। বাজারের অবস্থা বিশ্লেষণ করা, দ্রব্যের আকার-আকৃতি ও গঠন দান করা এবং বিক্রী বর্ধিত করার কাজে এই গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বর্ণনামূলক গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

যে কোন প্রকার সমস্যা সমাধান করা বা কোন কার্যক্রমের তালিকা প্রণয়ন করার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে সাধারণতঃ তিন প্রকারে তথ্য সংগৃহীত হয়ে থাকে। যেমন,—

১. প্রথম পর্যায়ের তথ্য সমূহ বর্তমান অবস্থার উপর নির্ভর করে সংগ্রহ করা যায়। বর্তমানে আমরা কোথায় আছি ?, কোনখান থেকে আরম্ভ করব ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণতান্ত্রিক বর্ণনা দ্বারা তথ্যাদি সংগৃহীত হতে পারে এবং বর্তমান অবস্থার প্রয়োজনীয় দিকগুলো বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

২. দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্যসমূহ "আমরা কি চাই ?" এই সম্পর্কিত একটি সমস্যার অনেক দিক আছে। এখন আমরা সমস্যার কোন দিকটির উপর গুরুত্ব দেব, কোন্‌দিকের সমাধান চাই, একটি ভাল কাজের উপস্থাপনায় কি ধরনের অবস্থা হওয়া উচিত এবং যা চাই বলে মনে করি তার একটি পর্যালোচনা থেকে উদ্দেশ্য বা গন্তব্যের একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। সম্ভবতঃ এটি অন্যত্র বিরাজমান অবস্থাসমূহের পর্যালোচনা অথবা বিশেষজ্ঞরা যাকে পর্যাপ্ত বা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন তা থেকে উদ্ভূত হতে পারে।

৩. তৃতীয় পর্যায়ের তথ্য কি ভাবে গন্তব্যে পৌঁছান যায় এবং সমস্যার সমাধান করা সম্ভবপর তৎসম্পর্কিত। অনুরূপ পরিস্থিতির

সঙ্গে জড়িত এমন কোন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান এই বিশ্লেষণ পদ্ধতির পর্যায়ভুক্ত হতে পারে। লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপায় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের মতামতও বিবেচিত হতে পারে।

কোন কোন গবেষণা কর্মে এই তিন প্রকারের মধ্যে মাত্র একটির উপর জোর দেওয়া হয়ে থাকে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দুই বা তিন প্রকারে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষণা কার্যে সমস্যা সমাধানের সব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আবশ্যিক ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা না হলেও কেবলমাত্র বর্ণনা থেকে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পন্থা নিরূপনের পদক্ষেপটির ব্যাখ্যা দানের মাধ্যমে মূল্যায়ণে অবদান রাখতে পারে। বর্ণনামূলক গবেষণা আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে পারে। বর্ণনামূলক গবেষণা একটি শিক্ষা সমস্যায় কতদূর সাহায্য করতে পারে তা উদাহরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংযুক্ত ল্যাবরেটরী স্কুলটিতে প্রতি বছর ভর্তি সমস্যা দেখা দেয়। শিক্ষা বর্ষের প্রারম্ভে প্রতি শ্রেণীতে শূন্য আসনের তুলনায় অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য আবেদন করে এবং ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে থাকে। ভর্তি সংক্রান্ত সমস্যাটি বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা ও চাহিদার তুলনায় বিদ্যালয়ের দালানটি অপ্রতুল এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্র ছাত্রীর স্থান সংকুলান হয় না। এই অবস্থা দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে ভর্তি সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারণ করবে। এই ধরনের সমস্যা বর্ণনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে সমাধানের জন্য প্রথম পদক্ষেপ হল বর্তমান পরিস্থিতির ধারাবাহিক বিশ্লেষণ করা। এই এলাকার স্কুলে যাওয়ার বয়সের কতজন শিশু আছে ? স্কুল-পূর্ব শিশুরাই বা কতজন, স্কুলে মোট কতগুলো শ্রেণীকক্ষ আছে ? সেগুলো কতদূর পর্যাপ্ত ? স্কুলে শিক্ষার্থীদের টিফিন, আমোদ প্রমোদ, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও লাইব্রেরীর ব্যবস্থা পর্যাপ্ত কিনা ? বর্তমানে স্কুলের বার্ষিক বাজেট কত ? স্কুলের ব্যয়ভার বহন করতে স্কুল কর্তৃপক্ষ সক্ষম কিনা ? শিক্ষাগত সুবিধাদানে স্কুল কর্তৃপক্ষ আগ্রহী কিনা ?

দ্বিতীয় পদক্ষেপ হল, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনায় লক্ষ্যে পৌঁছান। পাঁচ, দশ এবং বিশ বছরে স্কুলে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কত

Dhaka University Institutional Repository

হবে ? এরজন্য কতগুলো শ্রেণীকক্ষের প্রয়োজন হবে ? নতুন শিফট খোলার প্রয়োজন কিনা ? কোন্ কোন্ শ্রেণীকক্ষে 'সেকসন' খোলার প্রয়োজন হবে ? শিক্ষার চাহিদা অনুযায়ী স্কুলের বিশেষ ব্যবস্থা-পণার লাইব্রেরী, রেস্তোরাঁ, শরীরচর্চা কেন্দ্র এবং খেলাধূলো করার জায়গার কতটুকু সুবিধা দিতে পারবে ? শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা কত ? তাদের মধ্যে কতজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পদক্ষেপের দ্বারা কেমন করে লক্ষ্যে পৌঁছান যাবে সেটাই হবে তৃতীয় পদক্ষেপ। শ্রেণীকক্ষে আসন সংখ্যা বর্ধিত করে ভর্তি সমস্যা সমাধানের জন্য কি ধরনের বিদ্যালয় গৃহের প্রয়োজন হবে ? স্কুল-গৃহ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কি প্রকারে সংগ্রহ করা যাবে ইত্যাদি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের প্রশ্নগুলোর প্রাপ্ত উত্তর বিশ্লেষণ করে যে ফলাফল পাওয়া যাবে তা এবং অন্যান্য দেশের প্রচলিত শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করে, শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকগণের অভিমত সংগ্রহ করে, অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি এ ধরনের ভর্তি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে এবং তার সুষ্ঠু সমাধান দিয়ে থাকে, তাহলে সেখান থেকেও সমাধানের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। এইভাবে সমস্যা বিশ্লেষণ করে সমাধান পাওয়া গেলে ভবিষ্যৎ শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নততর এবং প্রসার করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। বর্ধিত আসন সংখ্যা দ্বারা ভর্তি সমস্যার আশু সমাধান হতে পারে, কিন্তু এই সঙ্গে পাঠ্যক্রম, শিক্ষার মানোন্নয়ন, বিদ্যালয়ের কার্যবিলীর সুষ্ঠু পরিচালনা ইত্যাদি সম্পর্কিত নানাবিধ সমস্যা অহরহ সৃষ্টি হয়ে থাকে যেগুলো সম্পর্কে সজাগ থাকা একান্ত প্রয়োজন।

* নমুনা স্বরূপ বর্ণনামূলক গবেষণার একটি প্রশ্নপত্র পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা গেল।

অষ্টম অধ্যায়
পরীক্ষণমূলক গবেষণা

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতিতে ইচ্ছাকৃত ভাবে কিছু করলে বা কোন গবেষণা কার্য পরিচালনা করলে তার ফলাফল কি হতে পারে তা যে পদ্ধতির দ্বারা বিশ্লেষণ এবং বর্ণনা করা হয়ে থাকে তাকে পরীক্ষণমূলক গবেষণা বলে। এই পদ্ধতিতে গবেষক নিয়ন্ত্রিত শর্তাধীনে পরীক্ষা নিরীক্ষা পরিচালনা করেন এবং এর প্রভাবে গবেষণার বিষয়বস্তু কিভাবে প্রভাবিত হয় তা লক্ষ্য করেন। এই নিয়ন্ত্রন ইচ্ছাকৃত এবং রীতিসিদ্ধ। এতে অন্যান্য উপাদান যা গবেষণার ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। অনভিপ্রেত উপাদান-এর প্রভাব গবেষণার উপর হতে সম্পূর্ণভাবে অপসারণ করা হয় অথবা তার প্রভাব পরিমাপ করার ব্যবস্থা করা হয়। গবেষণার সমস্যা চিহ্নিত করার পর গবেষক অনুমান স্থির করেন। নিয়ন্ত্রিত উপাদান সমূহের প্রভাব লক্ষ্য এবং পরিমাপ করার পর তিনি অনুমান গ্রহণ বা বর্জন করেন। এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নির্ভুল হিসাবে গণনা না করে সম্ভাবনা তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গ্রহণ করা হয়।

পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি বিজ্ঞান গবেষণাগারের একটি প্রচলিত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষণা পদ্ধতি। এটা অত্যন্ত কঠিন এবং আয়াস সাধ্য পদ্ধতি। তবে এর ফলাফল অন্যান্য গবেষণার ফলাফলের তুলনায় অধিকতর সঠিক। এই পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হল গবেষক এক্ষেত্রে তার প্রয়োজন অনুসারে একইরকম অবস্থা যতবার খুশী পুনরুৎপাদন করে ফলাফল যাচাই করতে পারেন। পরীক্ষণের ঘটনাটি গবেষক ইচ্ছানুযায়ী বারংবার সৃষ্টি করতে পারেন। প্রত্যেকবারই তিনি পর্যবেক্ষণের জন্য প্রস্তুত থাকবেন। আবার প্রয়োজন অনুসারে অবস্থার পরিবর্তন করে ফলাফলের পরিবর্তন অনুধাবন করতে পারেন। বিজ্ঞান গবেষণাগারের জন্য এই পদ্ধতি অত্যন্ত উপযোগী, সেখানে অবস্থাগুলো সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে আয়ত্বাধীনে রাখা যায়। পরীক্ষণ পদ্ধতি সবরকমের গবেষণার সমস্যায় প্রয়োগ করা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন, অনেক সামাজিক বা মানসিক সমস্যা রয়েছে যা পরীক্ষণের উদ্দেশ্যে ইচ্ছামত সৃষ্টি করা যায় না।

সম্প্রতিকালে, কিছুটা সফলতার সঙ্গে এই পদ্ধতিকে শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ করা হচ্ছে, যেখানে সীমিত আকারে কোন কোন অবস্থা বা উপাদানকে আয়ত্বাধীন রাখা যেতে পারে। বিজ্ঞান গবেষণাগারের মতো সমগ্র অবস্থাকে আয়ত্বাধীনে রেখে এই গবেষণা পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়। শ্রেণীকক্ষে পরিবর্তনশীল উপাদান হিসাবে বিবেচিত কতগুলো উপাদানকে পরিবর্তন করে এই গবেষণা করা হয়ে থাকে।

পরীক্ষণমূলক গবেষণার সূত্রাবলী

পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির যুক্তির ভিত্তি ইংরেজ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিলের উদ্ভাবিত পাঁচটি সূত্রের উপর নির্ভরশীল।

জন স্টুয়ার্ট মিল পরীক্ষণ পদ্ধতিতে কোন ঘটনার বা অবস্থার ফলাফল ও কারণের সম্পর্ক বিশ্লেষণের জন্য চারটি প্রধান সূত্র প্রণয়ন করেছেন। এই চারটি প্রধান সূত্রের সঙ্গে পঞ্চম একটি সূত্র যোগ করে দেওয়া হয়। পঞ্চম সূত্রটি প্রথম এবং দ্বিতীয় সূত্রের সংমিশ্রণে গঠিত। এই পাঁচটি সূত্র জন স্টুয়ার্ট মিলের সূত্রাবলী নামে সুপরিচিত। মিল তাঁর এক গ্রন্থে (A System of Logic) বিশদভাবে সূত্রগুলি আলোচনা করেন। এই সূত্রগুলি পরীক্ষণ পদ্ধতির গবেষণার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তবে কোন অবস্থাতে এগুলোর ব্যতিক্রম হবে না এমন নয়।

১. ঐক্যের পদ্ধতি (Method of Agreement) :

যদি কোন একটি ঘটনা, কোন বিশেষ অবস্থায়, একটি বিশেষ উপাদানের উপস্থিতিতে ঘটে তাহলে ঐ ঘটনার জন্য সংশ্লিষ্ট সেই বিশেষ উপাদানই দায়ী। অর্থাৎ, বিশেষ সেই উপাদানের উপস্থিতি ছাড়া ঘটনাটি সংঘটিত হতে পারে না।

উদাহরণ—

মনে করি, E একটি ঘটনা এবং তা নিম্নের প্রত্যেকটি অবস্থায় ঘটে।

১। উপাদান a, b, c, d এর উপস্থিতিতে।
২। উপাদান e, f, c, g এর উপস্থিতিতে।
৩। উপাদান h, i, c, k এর উপস্থিতিতে।

এক্ষেত্রে, মিলের ঐক্যের পদ্ধতি (Method of Agreement) অনুযায়ী c উপাদানই E ঘটনার জন্য দায়ী।

এই সূত্র বিভিন্ন গবেষণায় প্রয়োগ করে অত্যন্ত চমৎকার ফল পাওয়া যায়। প্রাচ্যের কোন এক শহরে মহিলাদের একবার অজ্ঞাত এক মহামারী রোগে আক্রান্ত হতে দেখা গিয়েছিল। বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে জানা গেল, যে সমস্ত মহিলা এক বিশেষ ধরনের পশমের স্কার্ফ ব্যবহার করতেন কেবল তাঁরাই ঐ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এর দ্বারা সাময়িকভাবে ধারণা করে নেওয়া যায় যে, ঐ স্কার্ফের মধ্যে রোগের জীবাণু ছিল।

তবে কেবল এই ধরনের তথ্যের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন নয়। কারণ, এর ব্যতিক্রমও ঘটতে পারে। যেমন, কোন এক গ্রামে গ্রামবাসীদের একবার এক প্রকার পেটের পীড়া দেখা দেয়। এদের সকলে গ্রামের একটি বিশেষ কূপের পানি পান করত। এক্ষেত্রেও সাময়িক ভাবে ধারণা করে নেওয়া হল ঐ কূপের পানির মধ্যে রোগের জীবাণু ছিল। কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কূপের পানি বিশুদ্ধ ছিল। এক্ষেত্রে কূপের পানি দূষিত এবং রোগের কারণ বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ঠিক নয়। কোন বিশেষ বিশেষ উপাদানের উপস্থিতি কোন বিশেষ ঘটনার জন্য দায়ী কিনা তা নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

২. পার্থক্যের পদ্ধতি (Method of Difference):

মিলের দ্বিতীয় সূত্রটির নাম পার্থক্যের পদ্ধতি। দুই বা ততোধিক ঘটনায় যদি একটি উপাদান ছাড়া অন্য সব উপাদান উপস্থিত

Dhaka University Institutional Repository

থাকে তাহলে ঘটনাটির জন্য উক্ত অনুপস্থিত উপাদানই দায়ী।

মনে করি E একটি ঘটনা।

১। a, b, c ও d— এদের উপস্থিতিতে E ঘটে না।
২। a, d, c, f— এদের উপস্থিতিতে E ঘটেনা।
৩। a, b, c, h— এদের উপস্থিতিতে E ঘটে।

এইক্ষেত্রে h হচ্ছে এই ঘটনার জন্য দায়ী। এই সূত্র বিভিন্ন গবেষণায় প্রয়োগ করে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। উদাহরণঃ— একদল ইঁদুরকে ভিটামিন 'c' বাদ দিয়ে অন্যান্য সব ভিটামিন যুক্ত খাদ্য দেওয়া হল এবং আর একদল ইঁদুরকে অন্যান্য ভিটামিন সহ ভিটামিন 'c' যুক্ত খাদ্য দেওয়া হল। কিছুদিন পর দেখা গেল যে, দ্বিতীয় দলের ইঁদুরগুলো প্রথম দলের ইঁদুরের চেয়ে আকারে অধিকতর বড় ও স্বাস্থ্যবান হয়েছে। এই ক্ষেত্রে মিলের দ্বিতীয় সূত্রানুসারে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যে, ভিটামিন 'c' এর অভাবে প্রথম দল স্বাস্থ্যবান হতে পারে নি। মূলতঃ একটি মাত্র বা অল্প সংখ্যক পরীক্ষা দ্বারা কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নয়। চূড়ান্ত এবং নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তের জন্য অনেকগুলো একই ধরনের পরীক্ষার প্রয়োজন। কারণ, তাদের মধ্যে অবর্তমান অন্য কোন কারণে ঘটনাটি ঘটতে পারে। ইঁদুরের এই উদাহরণটিতে বংশগত কারণও থাকতে পারে। এই সূত্রের একটি ত্রুটি হল এই যে, দুই বা ততোধিক পরিস্থিতিতে একটি ছাড়া অন্যান্য উপাদান বর্তমান থাকে, এধরনের দৃষ্টান্ত খুব কম দেখা যায়। এই অসুবিধার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করলে এই সূত্র অনেক সময় ফলপ্রসূ এবং কার্যকর হয়।

৩. যুক্ত পদ্ধতি (The Joint Method) :

এই সূত্রটি Method of Agreement এবং Method of Difference এই দুই সূত্রের সমন্বয়ে গঠিত এবং এর নাম যুক্ত পদ্ধতি। এই সূত্রানুসারে যদি প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রের শর্তাবলী অনুসরণ করা হয় তাহলে কারণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত অধিকতর

নির্ভরযোগ্য হয়। এই প্রক্রিয়ায় Method of Agreement প্রয়োগ করে প্রথমতঃ আনুমানিক সিদ্ধান্তে সত্যতা যাচাই করা হয়। অর্থাৎ, যে সাধারণ উপাদানের উপস্থিতিতে কোন ঘটনা ঘটে তা সেই ঘটনার জন্য দায়ী কিনা তা নির্ধারণ করা। তারপর Method of Difference প্রয়োগ করে যাচাই করে দেখা যায় যে, সেই সাধারণ উপাদানের অবর্তমানে ঘটনাটি ঘটে না। উভয় ক্ষেত্রে যদি একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহলে নিশ্চিত ভাবে ব্যাপারটি সত্য বলে ধরে নেওয়া যায়। লুই পাস্তুর এই পদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁর গবেষণা করেছিলেন।

৪. অবশিষ্টাংশ পদ্ধতি (Method of Residues) :

মিল তাঁর এই চতুর্থ সূত্রটি সম্পর্কে উল্লেখ করছেন, যে সব গবেষণায় উপরে বর্ণিত তিনটি সূত্রই পরপর অকৃতকার্য হয় সেসব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অতাকে একটি অপসারণ পদ্ধতিও বলা যেতে পারে। কোন ঘটনার এক অংশের জন্য দায়ী উপাদানগুলো সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া গেলে, অপর অংশের জন্য অবশিষ্ট উপাদানগুলো দায়ী একথাও নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে।

৫. সহগামী বিভিন্নতার পদ্ধতি (Method of Concomitant Variatians) :

মিলের পঞ্চম সূত্রটি সহগামী বিভিন্নতার পদ্ধতি নামে অভিহিত। যে সব ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত মিলের চারটি সূত্রই কার্যকরী বা প্রযোজ্য নয় সেসব ক্ষেত্রে মিলের পঞ্চম সূত্রটি প্রযোজ্য হবে। প্রকৃতপক্ষে যেখানে দুটি ঘটনা একই সূত্রে পরিবর্তিত হয় বা ঘটে সে সব ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। অর্থাৎ, তাদের একটির পরিবর্তন অন্যটির পরিবর্তন আনে বা উভয়ে কোন সাধারণ কারণে সংঘটিত হয়। উদাহরণস্বরূপ মিল উল্লেখ করেন পৃথিবীর জোয়ার ভাটার উপর চন্দ্রের আকর্ষণের কথা। চন্দ্রকে অপসারণ করে জোয়ার

Dhaka University Institutional Repository

করা যায় না। কাজেই শ্রেণীকক্ষের সাধারণ অবস্থাকে বজায় রেখে এবং অনিয়ন্ত্রিত উপাদানগুলো গবেষণার ফলাফলের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না এই ধারণা নিয়ে পরীক্ষণমূলক গবেষণা পরিচালনা করা যেতে পারে। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখতে গেলে দেখা যাবে যে, এমন কিছু কিছু উপাদান আছে যেগুলো কোন অবস্থাতেই আয়ত্তাধীন রাখা যায় না এবং গবেষণা কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, কোন এক সময়ে শিক্ষা-শিক্ষণ পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে যার জন্য শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়েই ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। আয়ত্তাধীনে রাখা অসম্ভব উপাদানসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলঃ—

১. শিক্ষকের কোন একটি বিশেষ পদ্ধতিতে পড়াবার প্রতি বা উপকরণ ব্যবহারের প্রতি উৎসাহ ও দক্ষতা কম বা বেশী হতে পারে।

২. পরীক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষাদানে শিক্ষকের দক্ষতা কম থাকলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও উৎসাহ কমে যায়।

৩. একজন শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর গবেষণার জন্য নির্ধারিত সময়ের সম্পূর্ণটা স্কুলে উপস্থিত থাকতে পারবেন বা উভয়েরই দৈনন্দিন উপস্থিতি আশাপ্রদ হবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

৪. শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের মানসিক অবস্থাকে কোনমতেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

পরীক্ষণের এই অসম্পূর্ণ অবস্থা শ্রেণীকক্ষ-গবেষণাকে পুরোপুরি ভাবে ব্যাহত করবে তা বলা যায় না। এইসব অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও শ্রেণীকক্ষে পরীক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগের অনেক সুফল পরিলক্ষিত হয়, যদিও বিজ্ঞান গবেষণাগারের মতো শ্রেণীকক্ষের অবস্থাকে কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত রাখা যায় না। পরীক্ষণ-পদ্ধতির সাহায্যে কোন সমস্যার সঠিক সমাধান করতে হলে নিখুঁত পরিকল্পনা ও সঠিক নকশা নির্বাচন করা প্রয়োজন এবং সমস্যাটিও পরীক্ষণের উপযুক্ত হওয়া দরকার।

পরীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে শ্রেণীকক্ষ গবেষণা পরিচালনা করলে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনশীল উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়—শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষা-উপকরণ, শিক্ষণীয় বিষয় এবং শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, যেমন, শ্রেণীকক্ষে দল গঠন, শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থা বা শ্রেণীকক্ষের অন্য কোন ব্যবস্থাপনা।

এই গবেষণার নিয়ম হল নতুন পদ্ধতি, নতুন ব্যবস্থাপনা বা নতুন উপকরণ যাদের বলা হয় পরীক্ষণমূলক উপাদান, যার সাহায্যে পড়াবার ফলাফলকে চিরাচরিত বা পুরাতন পদ্ধতি, পুরাতন উপকরণ, যাদের বলা হয় নিয়ন্ত্রিত উপাদান, তার সাহায্যে পড়াবার ফলাফলকে তুলনামূলক ভাবে যাচাই করা হয়ে থাকে। যেসব শিক্ষার্থীকে পুরানো বা প্রচলিত পদ্ধতিতে পড়ানো হয় তাদের বলা হয় নিয়ন্ত্রিত দল আর যাদের নতুন বা পরীক্ষণমূলক পদ্ধতিতে পড়ানো হয় তাদের বলা হয় পরীক্ষণমূলক দল। যে কোন পদ্ধতিতে পড়ানোর উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতাকে বৃদ্ধি করা বা কোন পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। নিয়ন্ত্রিত দল ও পরীক্ষণমূলক দলের দক্ষতা ও জ্ঞানের মান নিম্নবর্ণিত ছকের মাধ্যমে দেখান গেল।

নিয়ন্ত্রিত দল	পরীক্ষণমূলক দল
১. প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষা	১. প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষা
২. নিয়ন্ত্রিত উপাদানের প্রয়োগ	২. পরীক্ষামূলক উপাদানের প্রয়োগ
৩. চূড়ান্ত পরীক্ষা	৩. চূড়ান্ত পরীক্ষা
৪. অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ (চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল থেকে প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল বাদ দিয়ে)	৪. অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ (চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল থেকে প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল বাদ দিয়ে)

নিয়ন্ত্রিত দলের শিক্ষার্থীদের বর্ধিত জ্ঞান ও দক্ষতা এবং পরীক্ষণমূলক দলের বর্ধিত জ্ঞান ও দক্ষতার পার্থক্য থেকে এই ধারণায় উপনীত হওয়া যায় যে, যে দলের শিক্ষার্থীর বর্ধিত জ্ঞান ও দক্ষতার পরিমাণ বেশী সে দলের শিক্ষা পদ্ধতিই উন্নতমানের হবে। প্রথমে নিয়ন্ত্রিত দলের একটি প্রাক পরীক্ষা নিতে হবে। তারপর চিরচরিত পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করার পর চূড়ান্ত পরীক্ষা নিতে হবে। চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে অর্জিত জ্ঞান কতটা বৃদ্ধি পেল তা ছকের নিয়মানুযায়ী পরিমাপ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

এবার এই একই দলকে পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষাদান করতে হবে। এখন এই দলকে বলা হবে পরীক্ষণমূলক দল আর পদ্ধতিকে বলা যায় উদ্ভাবিত বা পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি। পূর্ব-বর্ণিত ছক অনুযায়ী এই দলকে উদ্ভাবিত পদ্ধতি প্রয়োগ করে পড়ানোর পূর্বে দলের একটি প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষা নিতে হবে। এরপর পরীক্ষণমূলক উপাদান প্রয়োগ করে পড়াবার পর একটি চূড়ান্ত পরীক্ষা নিতে হবে। এবারও ছকের নিয়মানুযায়ী তাদের অর্জিত জ্ঞান পরিমাপ করতে হবে। দুই পদ্ধতিকে পড়ানোর ফলাফলের মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে সেই পার্থক্যই নির্দেশ করবে কোন পদ্ধতি শ্রেয়।

শ্রেণীকক্ষ গবেষণায় গবেষকের পক্ষে শিক্ষাদান পদ্ধতির সব উপাদান নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। গবেষককে সব সময় সচেতন থাকতে হবে যে, শ্রেণী গড়ের বৃদ্ধির পরিমান যেন নির্ভুল হয়। সীমিত জ্ঞান পরিমাপ করা সহজসাধ্য, কিন্তু জ্ঞানের সব দিকের প্রয়োজনীয় ফলাফল পরিমাপ করা কষ্টকর। শ্রেণীকক্ষ গবেষণায় শ্রেণীগড় বৃদ্ধির পরিমাপের জন্য নির্ভরযোগ্য অভীক্ষা দরকার যেখানে প্রশ্নের মানে সমতা রক্ষা করা যায়। নতুবা অভীক্ষার উদ্দেশ্য নিরর্থক হবে। শ্রেণীকক্ষ গবেষণায় শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান পরিমাপ করার জন্য যে পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহৃত হবে তার কতগুলো আবশ্যকীয় গুণাবলী যথা—নির্ভরযোগ্যতা, উদ্দেশ্য নিষ্ঠা, নৈর্ব্যক্তিকতা, যথার্থতা, ব্যবহারযোগ্যতা আছে কিনা গবেষক গবেষণার পূর্বে যাচাই করে দেখবেন।

শ্রেণীকক্ষ গবেষণার প্রকার ভেদ

১. একক ব্যক্তি বা এক দলীয় নকশা।
২. দুই বা ততোধিক সমকক্ষ দল বা দুই দলীয় নকশা।
৩. আবর্তনমূলক পদ্ধতি।

১. একক ব্যক্তি বা এক দলীয় নকশা :

কোন শ্রেণীকক্ষ গবেষণার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি বিশেষ দলের শিক্ষার্থীকে ব্যবহার করে গবেষণা কার্য পরিচালিত হলে সেই প্রকারকে বলা হয় এক দলীয় নকশা। এই ধরনের পরীক্ষা একজন অথবা একদল শিক্ষার্থী নিয়ে করা হয়ে থাকে। একই দল শিক্ষার্থীকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে পড়ানোর ফলাফলকে অন্য আর একটি পদ্ধতিতে পড়ানোর ফলাফলের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এই পদ্ধতি দুই দলীয় নকশা বা আবর্তনমূলক নকশা থেকে সহজ, কারণ এতে শ্রেণীকক্ষের গতানুগতিক স্বাভাবিক ধারাকে পরিবর্তন করার কোন প্রয়োজন হয় না। পড়ানোর জন্য একটি নির্দেশ বিষয় নির্বাচন করা হয়। একই দল শিক্ষার্থীকে দুই পদ্ধতিতে পড়ানোর ফলাফলকে তুলনামূলক ভাবে যাচাই করে গবেষণার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সচরাচর এই পদ্ধতি শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ করার উপায় হল,—চিহ্নিত করা যায় এমন একটি উপাদান যুক্ত অথবা বিযুক্ত করা হয় এবং এর ফলে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তার পরিমাপ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, একদল শিক্ষার্থীর উপর নির্ধারিত মানদন্ড বিশিষ্ট একটি পরীক্ষা প্রয়োগ করা হল। উত্তরপত্রও মূল্যায়ণ করা হল। এরপর তাদের কিছু সময়ের জন্য সংশোধনী পাঠের বিষয়বস্তু দেওয়া গেল। পূর্বের পরীক্ষাটি অথবা সেটার সমতুল্য অন্য আর একটি পরীক্ষা দ্বিতীয় বার প্রয়োগ করা হল। দ্বিতীয় বারও উত্তরপত্র মূল্যায়ণ করা হল। উভয় পরীক্ষার নম্বরের তুলনামূলক যাচাই-এর দ্বারা শিক্ষার্থীদের পঠনের উন্নতির পরিমাপ নির্ধারণ করা যায়। যদি পরের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর অপেক্ষাকৃত বেশী হয় তাহলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে—সংশোধনী বিষয় বস্তু যা শিক্ষার্থীদের পঠনের জন্য দেওয়া হয়েছিল সেগুলো মূল্যবান এবং শিক্ষার্থীদের উপযোগী। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল—পরীক্ষণমূলক দল ও নিয়ন্ত্রিত দলের জন্য নির্বাচিত অধ্যায়গুলো সমান পর্যায়ের সহজ, কঠিন ও আনন্দদায়ক হতে হবে। একই ধরনের পরিমাপক যন্ত্র বা অভীক্ষা ব্যবহার করতে হবে। দু'বারের জন্য সমপরিমাণ সময় বরাদ্দ করতে হবে।

আপাতঃ দৃষ্টিতে এই পদ্ধতিকে যদিও সহজ বলে মনে হয়, আসলে তা নয়। কারণ, একই শিক্ষক যদি বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে, কোন একটি বিশেষ পদ্ধতিকে ভাল মনে করে অধিকতর উৎসাহ এবং আনন্দের সঙ্গে শিক্ষাদান করেন আর

Dhaka University Institutional Repository

অন্য পদ্ধতিতে যদি ততখানি উৎসাহের সঙ্গে শিক্ষাদান করতে না পারেন তাহলে ফলাফলের মধ্যে একটা তারতম্য হবার সম্ভাবনা বিদ্যমান এবং ফলাফল নির্ভুল বলে গণ্য করা যায় না। কারণ, কোন একটি পদ্ধতিতে শিক্ষকের ব্যক্তিগত পছন্দ কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আবার উভয় পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের বিষয়-বস্তুও সমপর্যায়ের হওয়া আবশ্যক। কারণ একটির বিষয়বস্তু যদি কঠিন হয় এবং অপরটির বিষয়বস্তু যদি অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, তাহলে যে ফলাফল পাওয়া যাবে তা নির্ভুল হবে না। মূলতঃ সমমানের শিক্ষার্থীদের নিকট সমান উপভোগ্য কোন বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা না হলে কোন শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগের ফলাফলের পার্থক্য নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়।

পদ্ধতির প্রয়োগ প্রণালী ঃ—

এই গবেষণা পদ্ধতি পূর্বোক্ত ছকের ন্যায় হবে। দল নির্বাচন করে প্রাক-নির্বাচনী অভীক্ষা প্রয়োগ করতে হবে। এরপর নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে। চূড়ান্ত পরীক্ষার পর অর্জিত জ্ঞান পরিমাপ করা হয়। এবার পরই একই দলে প্রাক-নির্বাচনী অভীক্ষা প্রয়োগ করার পর উদ্ভাবিত কোন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করতে হবে। চূড়ান্ত পরীক্ষার পর অর্জিত জ্ঞান পরিমাপ করা হয়। এরপর নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত গড় এবং পরীক্ষণমূলক প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত গড়ের তুলনা করা যায়। এই দুই পদ্ধতির মধ্যে যে পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত গড়ের মান বেশী হবে, সেই পদ্ধতিটিকে শ্রেয় বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয়, যে শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রয়োগ করে একদলীয় নকশার গবেষণা করা হয়, তার কেবল মাত্র একটি ব্যতীত অন্যান্য সবগুলো উপাদান নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায়, কিছু কিছু উপাদান আছে যেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর নয়। যেমন,—

শিক্ষকের দক্ষতা এবং উৎসাহ কোন একটি পদ্ধতিতে কম বা বেশী হতে পারে। প্রথম পর্যায়ের শিক্ষণীয় বিষয়ের কিছু কিছু দ্বিতীয় পর্যায়ে পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। অর্থাৎ প্রথমবারের পাঠ্য-বস্তু এবং উপস্থাপনের কলাকৌশল দ্বিতীয় বারের উপর প্রভাব

বিস্তার করতে পারে। প্রথম পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অপেক্ষা দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা মানসিকতা ও অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক ও উন্নততর হয়ে থাকে। প্রথম পর্যায় অপেক্ষা দ্বিতীয় পর্যায়ের শ্রেণীগড় কত-গুলো কলাকৌশল জানার জন্য এবং পদ্ধতির অভিনবত্বের জন্য অধিক হতে পারে।

২. দুই বা ততোধিক সমকক্ষ দল বা দুই দলীয় নকশাঃ

ক, নির্বিচারে নির্বাচিত সমান দল (equated by random sample)

খ, শ্রেণীগড় দ্বারা সমানকৃত সমান দল (equated by mean scores)

গ, সমান জোড়া থেকে গঠিত সমান দল (equated by matched pairs)

ঘ, যমজ জোড়া থেকে গঠিত সমান দল (co-twin method)

কোন পরীক্ষণমূলক গবেষণায় দুইদল শিক্ষার্থী ব্যবহার করা হলে সেই নকশাকে দুই দলীয় নকশা বলে। এই পদ্ধতিতে এক-দলীয় নকশার কিছু কিছু অসুবিধা দূর করা যায়। কিন্তু সম-পর্যায়ের দল গঠন করা খুব কঠিন। যেসব শিক্ষার্থী একই শ্রেণীতে অধ্যয়নরত তাদের থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দল গঠন করা যেতে পারে। দলগুলো যতদূর সম্ভব একই ধরনের হতে হবে, বিশে-ষতঃ পাঠাভ্যাস ও বুদ্ধিমত্তায়। দল নির্বাচনের পদ্ধতি নিম্নরূপঃ—

ক, নির্বিচারে নির্বাচিত সমান দল—

নির্বিচারে নির্বাচন পদ্ধতি অবলম্বন করে তথ্য বিশ্ব থেকে দুই বা ততোধিক দল গঠন করা যেতে পারে। ধরে নিতে হবে যে, নির্বি-চারে নির্বাচিত দলগুলো সমপর্যায়ের হবে।

খ, শ্রেণীগড় দ্বারা সমানকৃত সমান দল—

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণীগড় এবং প্রামাণ্য বিচ্যুতির ভিত্তিতে বয়সের গড়, বুদ্ধিমত্তার পরিমাপ, শ্রেণীগড় থেকে বিচ্যুতির পরিমাপ ইত্যাদি সমান হতে হবে যাতে দলগুলোর উপাদান সমপর্যায়ের ধরে নেওয়া যেতে পারে।

গ, - সমান জোড়া থেকে গঠিত সমান দল—

সমান জোড়া থেকে সমান দল নির্বাচন করার সময় একদলের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অন্য দলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মিল থাকতে হবে। বৈশিষ্ট্যগুলো হল বয়স, বুদ্ধিমত্তা, পারিবারিক পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, বংশ, লিংগ ইত্যাদি। এগুলোর উপর নির্ভর করে এক ধরনের এক জোড়া থেকে একজনকে নিয়ন্ত্রিত দলে আর অপরজনকে পরীক্ষণমূলক বা উদ্ভাবিত দলে রাখতে হবে, যে পদ্ধতির উপর পরীক্ষা হচ্ছে তার একটি ছাড়া অন্যান্য উপাদান একই থাকবে।

ঘ, যমজ জোড়া থেকে গঠিত সমান দল—

যমজ জোড়া থেকে একজনকে নিয়ন্ত্রিত দলে এবং অপর জনকে পরীক্ষণমূলক দলে অন্তর্ভুক্ত করে সমান দল গঠন করা যায়। এই পদ্ধতি শ্রেণীকক্ষ গবেষণা অপেক্ষা শিশুর উপর বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব সম্বন্ধে পুংখানুপুংখরূপে বিশ্লেষণ করার জন্য অধিকতর প্রযোজ্য। শ্রেণীকক্ষ গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক যমজ পাওয়া সম্ভবপর নয় বলে শ্রেণীকক্ষে এই পদ্ধতির প্রয়োগও সম্ভবপর নয়।

পদ্ধতির প্রয়োগ প্রণালী—

দুই বা ততোধিক সমকক্ষ দল পদ্ধতি বা দুই দলীয় নকশাটি শিক্ষাদানের নতুন একটি পদ্ধতির আপেক্ষিক কার্যকারিতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। এই প্রক্রিয়ায় দুইটি সমকক্ষ দল নির্বাচন করে একটিকে চিরাচরিত পদ্ধতিতে এবং অপরটিকে উদ্ভাবিত বা পরীক্ষণমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করতে হবে। প্রথমোক্ত দলটিকে স্বভাবতই নিয়ন্ত্রিত দল এবং অপরটিকে পরীক্ষণমূলক দল বলা হয়। উভয় দলের জন্য সমান সময় সীমার

মধ্যে যে বিষয় বস্তু শিক্ষা দেওয়া হয় তার উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর একটি অভিক্ষা প্রয়োগ করতে হবে। নিয়ন্ত্রিত দলের অর্জিত গড় অপেক্ষা যদি পরীক্ষণমূলক দলের গড় অধিক হয় তাহলে ধরে নিতে হবে যে নতুন পদ্ধতি অধিকতর ফলপ্রসূ। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, উভয় ক্ষেত্রে একই শিক্ষক পাঠদান করবেন। তবে শিক্ষক যদি নতুন পদ্ধতিতে পাঠদানে অধিকতর উৎসাহী ও আস্থাবান হন বা নতুন পদ্ধতির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন তাহলে পরীক্ষালব্ধ ফলাফল নির্ভরযোগ্য হবে না।

সমকক্ষদল পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হল পরীক্ষণের জন্য সজীব মানব শিশুদ্বারা গঠিত দুই বা ততোধিক সমকক্ষ একই চরিত্রের, একই মানের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিশু পাওয়া সহজ সাধ্য নয়। দুইটি দলের দুইজন শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি সামান্যতম পার্থক্য থাকে তাহলে এই পার্থক্য গবেষণার ফলাফলের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করবে। সমান জোড়া থেকে দুইটি সমান দল নির্বাচন করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে প্রতিটি জোড়ার উপর প্রয়োগকৃত বিভিন্ন অভীক্ষায় প্রতিজোড়ার স্কোর দুইটি প্রায় সমমানের হওয়া দরকার, দুই দলের শিক্ষার্থীদের গড়ও যেন সমমান বিশিষ্ট হয়। এছাড়া অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের প্রতিও অনরূপভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। আলোচ্য বিষয় থেকে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সমকক্ষ জোড়া থেকে সমকক্ষ দল গঠন করা অত্যন্ত জটিল ও কষ্টসাধ্য। কেবলমাত্র দল গঠন করাই কঠিন নয়, মানব শিশু সম্পর্কীয় তথ্য সংগ্রহ করাও অত্যন্ত কঠিন ও সমস্যাবহুল। সাধারণতঃ ছোট আকারের দল থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণা করার ফলাফল নির্ভরযোগ্য হয় না এবং সার্বিকীকরণও সম্ভবপর নয়। আবার বড় আকারের দল পরিচালনা করা অসুবিধাজনক। ছোটদলের প্রাপ্ত ফলাফলকে গ্রহণযোগ্য করতে হলে বহুবার পরীক্ষা করা দরকার। এইজন্য সমকক্ষ দল পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের দল নিয়ে বহুবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। ছোটদল থেকে সংগৃহীত তথ্যাদি তথ্য বিশ্বের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হলে কমপক্ষে কয়েকশত বা কয়েক সহস্র মানব শিশুকে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। এই উপায়ে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে একটি সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

৩. আবর্তনমূলক পদ্ধতি : (Rotational Method)

এই পদ্ধতি অন্য দুই পদ্ধতি থেকে পৃথক। পদ্ধতি বা দল পরিবর্তন করে এই গবেষণা করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল এর নিজস্ব কোন রূপ বা প্রয়োগ ক্ষমতা নেই। এক দলীয় বা দুই দলীয় নকশার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে গবেষণা করা হয়। বারবার প্রয়োগ করে কোন বিশেষ বিষয় শিক্ষাদানের জন্য কোন বিশেষ পদ্ধতি প্রযোজ্য সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় এবং অনিয়ন্ত্রিত উপাদানগুলোকে আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রনে আনা যায়।

একদলীয় নকশার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হলে শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয়। যেমন,

আবর্তন এক (cycle 1) প্রথমে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি এবং পরে পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি উপস্থাপন করা হয়।

আবর্তন দুই (cycle 2) প্রথমে পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি এবং পরে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি উপস্থাপন করা হয়।

আবর্তনমূলক পদ্ধতি দুই দলীয় নকশায় প্রয়োগ করা হলে, প্রথম পর্যায়ে দুটো দল থাকবে, 'ক' ও 'খ'। মনে করা হোক 'ক' দলে প্রয়োগ করা হবে পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি আর 'খ' দলে প্রয়োগ করা হবে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি। এবার দল বা পদ্ধতি যে কোন একটিকে পরিবর্তন করে গবেষণা করা হবে। ধরা যাক, দ্বিতীয় পর্যায়ে 'ক' ও 'খ' দল ঠিক থাকলো, তাহলে পদ্ধতির পরিবর্তন করা প্রয়োজন। ছকের সাহায্যে প্রকাশ করলে ধারণা সুস্পষ্ট হবে।

আবর্তন একঃ 'ক' দল—পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি
(পর্যায় ১) 'খ' দল—নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি
আবর্তন দুইঃ 'ক' দল—নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি
(পর্যায়–২) 'খ' দল—পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি

এইভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার ফলে যদি কোন বিশেষ শিক্ষাদান পদ্ধতিতে পড়ানোর ফলাফল বারবার উন্নততর প্রতীয়মান হয়

তাহলে সেই বিশেষ পদ্ধতিটির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় এবং যে কোন ক্রমে বা যে কোন দলে তা প্রয়োগ করা হোক না কেন তার উৎকর্ষতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আবর্তনমূলক কলা কৌশল প্রয়োগের ফলে অনিয়ন্ত্রিত উপাদানের দ্বারা গবেষণার ফলাফল খুব কমই প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে।

উপাদানমূলক নকশা (Factorial Design)

পরীক্ষণমূলক নকশার দ্বিতীয় প্রধান পদ্ধতি হলো উপাদানমূলক নকশা। এই পদ্ধতি একধারে যেমন গবেষণাগারে প্রয়োগ করা যায় তেমনি অন্যান্য ক্ষেত্র যেমন, শ্রেণীকক্ষ; কৃষিজমি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায়। পরিসংখ্যান বিজ্ঞানী R. A. Fisher এর প্রবর্তিত উপাদানমূলক নকশাটি গবেষণার জন্য বিশেষ সহায়ক।

সমতুল্য গ্রুপ ডিজাইনের (Equivalent group design) সাথে তুলনা করে দেখলে দেখা যায় উপাদানমূলক নকশা পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষক নির্ভরশীল চলের উপর একাধিক স্বাধীন চলের প্রভাব পর্যবেক্ষণে সক্ষম। এছাড়া পর্যবেক্ষক নির্ভরশীল চলের উপর দুই বা ততোধিক স্বাধীন চলের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া (Interaction) ও পর্যবেক্ষণ করতে পারে। অধিকন্তু, সমস্ত পর্যবেক্ষণ একটি মাত্র পরীক্ষাকার্যে ব্যবহার করা যায়। এ ধরনের পর্যবেক্ষণের প্রাথমিক পর্যায়ে একটি পরিসংখ্যানগত কৌশল অবলম্বন করা হয়, যে কৌশলটিকে বলা হয় ব্যবধান বিশ্লেষণ (Analysis of Variance)।

নিম্নোক্ত সমস্যাটি বিবেচনা করা যাক—

সমস্যাটি হলো, দুজন শিক্ষক দ্বারা দুটি ভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হওয়ায় পঠন দক্ষতা বা Reading achievement এর উপর কিরূপ প্রভাব পড়ে? বর্তমান সমস্যাটি থেকে আমরা শিক্ষণ পদ্ধতির পার্থক্য, শিক্ষকের পার্থক্য এবং শিক্ষক ও পদ্ধ-

Dhaka University Institutional Repository

তির মধ্যকার পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত পার্থক্য জনিত কারণে পঠন দক্ষতায় (বা অর্জিত ফলাফলে) যে পার্থক্য, তারতম্য পরিলক্ষিত হয় তা পর্যবেক্ষণে সচেষ্ট হবো।

উপরোক্ত পরীক্ষার (factorial design) হবে নিম্নরূপঃ—

বিবরানুযায়ী ছাত্রের চারটি দল গঠন করা হলো + দলগুলো একটি অপরটির সমতুল্য। দলগুলোকে ক, খ, গ ও ঘ হিসেবে চিহ্নিত করি। শিক্ষণে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে সেগুলো মনে করি 'অ' অথবা 'আ'। ১ নং শিক্ষক দল 'ক' কে 'অ' পদ্ধতিতে এবং গ্রুপ 'খ' কে 'আ' পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবেন। দল গ ও ঘ কে অনুরূপভাবে ২নং শিক্ষক শিক্ষা দেবেন। পর্যবেক্ষণের শেষে প্রত্যেকটি দলের Reading achievement বা ফলাফল মিলিয়ে দেখা হবে এবং এ ফলাফলটাই ব্যবধান বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়।

পঠন পদ্ধতি পরীক্ষণ

(Reading Methods Experiment)

শিক্ষক ১		শিক্ষক ২	
গ্রুপ ক	গ্রুপ খ	গ্রুপ গ	গ্রুপ ঘ
পদ্ধতি অ	পদ্ধতি আ	পদ্ধতি অ	পদ্ধতি আ

চিত্র—৯

পর্যবেক্ষণ সমূহঃ

১. পদ্ধতির জন্য পার্থক্য ব্যবধান কগ—খঘ
২. শিক্ষকের জন্য পার্থক্য বা .. কখ—গঘ
৩. গ্রুপের মধ্যে পার্থক্য বা ,, ক—খ—গ—ঘ
৪. শিক্ষক এবং পদ্ধতির মধ্যকার পারস্পরিক ক্রিয়ার (Interaction) জন্য পার্থক্য বা ব্যবধানঃ ভিন্ন গ্রুপের মধ্যকার পার্থক্য

অর্থাৎ ৩নং (ক—খ)—(গ—ঘ) থেকে ১নং ও ২নং বাদ দিয়ে যা থাকে তা।*

উদাহরণস্বরূপ শ্রেণীকক্ষে পরীক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করা গেল—

মাধ্যমিক স্কুলের শ্রেণীকক্ষের শর্তযুক্ত ব্যবহারিক পরীক্ষণ কলাকৌশলঃ

(The Application of Operant Conditioning Techniques in a Secondary School Classroom)

বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী B. F. Skinner এর Behavior modification তথ্যানুযায়ী 'পরিবেশ' শিক্ষার্থীদের আচরণকে কিভাবে প্রভাবিত করে তা ১৯৬৮ সনে L. W. McALLISTER ও তাঁর সঙ্গী STACHOWIAK, BAER শ্রেণীকক্ষে 'পরীক্ষণমূলক গবেষণার' দ্বারা প্রমাণ করেছেন।

[illegible]

১) সম্পূর্ণ পরীক্ষণ কার্যটি শ্রেণীকক্ষে অনুষ্ঠিত [illegible]
২) শ্রেণীর সব শিক্ষার্থীকে পরীক্ষণ কার্যের অন্তর্ভুক্ত করা [illegible]
৩) নিম্ন ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা কার্যে নেওয়া হয়।
৪) [illegible]।

[illegible] গবেষণা [illegible]

জুনিয়র ও সিনিয়র ইংলিশ স্কুলের ২৫ জন শিক্ষা[illegible] ১২ জন বালক ও ১৩ জন বালিকা) সমন্বয়ে শিক্ষা দলটি গঠন করা হয়েছিল।

* David R. Cook and N. Kenneth LaFleur A Guide To Educational Research, Second Edition, Boston, Allyn and Bacon, Inc, 1975 p. 115.

Dhaka University Institutional Repository

পরীক্ষণ দল ঃ

যে সব শিক্ষার্থীর বয়স ১৬--১৯ বৎসর এবং I. Q. ৭৭--১১৪ তাদের পরীক্ষণ দলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এতে শতকরা ৮০ জন শিক্ষার্থী নিম্নবিত্ত পরিবারের এবং বাকীগুলো ছিল মধ্যবিত্ত পরিবারের।

নিয়ন্ত্রিত দল ঃ

১৩ জন বালক ও ১৩ জন বালিকা সমন্বয়ে এই দলটি গঠন করা হয়। শিক্ষার্থীদের বয়ঃসীমা ১৬—১৯ বৎসর এবং I. Q. ধরা হয় ৭৩—১১১, শতকরা ৭৬ জন শিক্ষার্থী নিম্নশ্রেণীভুক্ত পরিবারের, ১৬%মধ্যবিত্ত, ৪% উচ্চ বিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরীক্ষণ কার্যটি শ্রেণীকক্ষে সকালে সত্তর মিনিটের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছিল পরীক্ষণ দলের উপর। নিয়ন্ত্রিত দলের ক্লাশ বিকেলে ৬০ মিনিটের জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

শিক্ষক ঃ

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ২৩ বছর বয়স্কা স্নাতক ডিগ্রীধারী শিক্ষিকা মাধ্যমিক স্তরের নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের এক বৎসর শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তিনি পরীক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রিত এই উভয় দলকে নির্ধারিত বিষয় শ্রেণীতে পড়ান। উভয়দলের ক্লাশ পরিচালনায় তাঁকে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তবে এই বাধা কাটিয়ে উঠার জন্য তিনি সহকর্মীর সাহায্য নেন। দুই মাসের শিক্ষকতায় তিনি বেশ সমন্বয় সাধনে সক্ষম হন। যে সকল শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিম্নমানের ছিল তাঁর প্রচেষ্টায় সেসব শিক্ষার্থীর কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। শ্রেণীকক্ষের আচরণে যদি শৃংখলা বিধি প্রয়োগ করতেন তবে হয়ত তাদের এই উন্নয়ন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না।

ধারাবাহিকতা ঃ

পরীক্ষাকক্ষে নিয়ন্ত্রিত দলের প্রাক-জ্ঞান মূল্যায়ণ পূর্বক base line তৈরী করা হয়। দ্বিতীয় সপ্তাহে উভয় শ্রেণীর

শিক্ষার্থীদের কার্যবিধি ও আচরণ লক্ষ্য করা হয়। "অসংলগ্ন কথা এবং এদিক-ওদিক তাকানো"—এই জাতীয় গতিবিধি বেশী লক্ষ্য করা যায়। এতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর দৃষ্টিপাত করা হয়—

১. শিক্ষকের অনুমতি ব্যতীত কথা বলাকে অসংলগ্ন কথা ধরা হয়।

২. কোন কথা বলার জন্য হাত উঠিয়ে শিক্ষকের অনুমতি নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়।

৩. আলোচনা কালে কোন প্রকার কথা না বলার নির্দেশ ছিল।

৪. সম্মুখদিক থেকে ৯০ ডিগ্রী এদিক ওদিক তাকানোকে অনাকাঙ্খিত তাকান হিসেবে ধরা হয়েছিল।

সীমাবদ্ধতা ঃ

শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে অথবা বই ডেস্ক থেকে নেয়ার জন্য তাকানো উক্ত দুটির আওতাভুক্ত ছিল না।

পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ডিং ঃ

উভয় শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের আচরণবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য নিম্নে প্রদর্শিত ছক অনুযায়ী ফর্ম দেওয়া হয়। পরীক্ষণ দলের ফর্মে ৭০টি এবং নিয়ন্ত্রিত দলের ফর্মে ৬০টি ঘর ছিল। উল্লেখিত আচরণ বিধিগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রতি মিনিটে শিক্ষার্থীদের আচরণ সমূহ পর্যবেক্ষণ করা হতো এবং ২৫ মিনিট অন্তর অন্তর নির্ধারিত ফর্মে শিক্ষার্থীদের আচরণ রেকর্ড করা হতো। প্রত্যেকদিন এইভাবে একই জাতীয় আচরণ সংখ্যা নির্ণয় করে তাকে বিরতি সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে আচরণকে শতকরা হারে প্রকাশ করা হতো।

Minute No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Talking															
Turning															

চিত্র—১০

Dhaka University Institutional Repository

সময় জ্ঞাপন :

দেয়াল ঘড়ি দ্বারা সময় নির্ধারণ করা হতো। শ্রেণী শিক্ষক নিজে রেকর্ডিং এর কাজ সমাধা করতেন এবং সপ্তাহে দুইদিন গবেষকগণ তা পরিদর্শন করতেন। শিক্ষককে সাহায্য করার জন্য কিছু সংখ্যক পর্যবেক্ষক ছিলেন। এ'রা সময় সময় ক্লাশ পর্যবেক্ষণ করতেন এবং শিক্ষককে রেকর্ডিং এ সাহায্য করতেন।

১. পরীক্ষণ দলে কথা বলার অভ্যাস ছিল—৯০.৪৯%
২. নিয়ন্ত্রিত দলে কথা বলার অভ্যাস ছিল—৮৯.৪৯%
৩. এদিক-ওদিক তাকানোর অভ্যাস পরীক্ষণ দলের ছিল—৯৪.২৭%
৪. নিয়ন্ত্রিত দলের এদিক-ওদিক তাকানোর অভ্যাস ছিল ৯০.৯৮%

শিক্ষকের আচরণ :

শিক্ষার্থীদের ভর্ৎসনা, উৎসাহ (পুরস্কার) সূচক বাক্য দ্বয়ের ব্যবহার সময়ের সঙ্গে রেকর্ড করা হয়। এতে দেখা যায়—

১. ভর্ৎসনামূলক আচরণ—পরীক্ষণ দলে—৯২.৭৮%
নিয়ন্ত্রিত ,,—৯৪.৮৪%
২. উৎসাহ সূচক উক্তি —পরীক্ষণ শ্রেণীতে—৯৮.৮৫%
নিয়ন্ত্রিত ,, —৯৭.৬৭%

পরীক্ষাচলাকালীন শর্তসমূহ :

প্রথমত :

২৮ দিনের দিন সর্বপ্রথম পরীক্ষণদলের সামাজিকতার উপর গুরুত্ব দিয়ে অসংলগ্ন কথা ও অসামাজিক ব্যবহার পরিহার করার জন্য শিক্ষক নির্দেশ দেন এবং প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের নাম ধরে তাকে বিভিন্ন সতর্কতা সূচক বাণীতে সাবধান করে দেন।

ছুটির পর স্কুলে অথবা ক্লাশ হতে বের করে দেয়া হবে অথবা অধ্যক্ষের নিকট তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হবে এই জাতীয় কোন কাজ না করার জন্য শিক্ষকের প্রতি নির্দেশ ছিল।

শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ভাবে উৎসাহ প্রদান করার জন্য বিভিন্ন সময়ে ক্লাশের পর ধন্যবাদান্তে ক্লাশ ত্যাগ করার নির্দেশ ছিল।

DHAKA METROPOLITON TEACHERS' TRAINING COLLEGE ★ DATE........

দ্বিতীয়ত :

প্রথম শর্তানুযায়ী ২৬ দিন ক্লাশ করার পর পরীক্ষণ ক্লাশে অসংলগ্ন আচরণ উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পায়। এইভাবে ২৮+২৬= ৫৪ দিন চলার পর নতুন ভাবে একটি base line ঠিক করা হয়। অনুরূপ ভাবে দ্বিতীয় সপ্তাহে তাকানোর পরীক্ষা করা হয়।

ফলাফল :

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য তথ্য সংগ্রহ না করায় কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীর অসংলগ্ন কথা বা তাকানো এই ত্রুটি সার্বিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

পর্যবেক্ষক এবং শিক্ষক :

উভয়ে এই মত পোষণ করেন যে প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থী 'অসংলগ্ন কথা' এবং এক তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী উভয় শ্রেণীতে এদিক-ওদিক তাকানো আচরণে জড়িত ছিল।

অসংলগ্ন কথা বলার আচরণ (Talking behavior) :

২৭ দিনের মধ্যে অসংলগ্ন কথা বলার ফলাফলের গড় দাঁড়ায়—

ক) পরীক্ষণমূলক দল — ২৫.৩০%
খ) নিয়ন্ত্রিত দল — ২২.৮১%

২৮ দিন পরীক্ষণমূলক শর্তসাপেক্ষে ক্লাশ হবার পর শিক্ষার্থীদের উক্ত ত্রুটি হ্রাস পেয়ে—

ক) পরীক্ষণ দল — ৫%
খ) নিয়ন্ত্রিত দল — পূর্ববৎ থাকে।

২৮ হতে ৬২ দিনের মাথায় চূড়ান্ত পরীক্ষায় দেখা যায় যে,

ক) নিয়ন্ত্রিত দলের উক্ত ত্রুটি — ২১.৫১%
খ) পরীক্ষণ দলের — ৫.০৪%

এদিক-ওদিক তাকানো (Turning behavior) :

এই আচরণ পরীক্ষার শেষ পর্যায়ে দেখা যায়—

Dhaka University Institutional Repository

ক, পরীক্ষণ দল — ৪.১১%
খ, নিয়ন্ত্রিত দল — ১৭.২২% ত্রুটি থাকে।

সম্পূর্ণ পরীক্ষণ প্রক্রিয়াটিতে রেকর্ডিং কাজটি খুব দুরূহ বিধায় শিক্ষক তাঁর সহকারীদের সহযোগিতায় কার্যটি সমাধা করেছিলেন এবং ফলাফলে দেখা যায়, শিক্ষার্থীদের ভর্ৎসনা, উৎসাহ এই উভয় প্রকার বলবৃদ্ধি (reinforcement) দ্বারা তাদের আচরণের পরিবর্তন সাধনে শিক্ষক সক্ষম হয়েছিলেন।

সুতরাং উপরোক্ত পরীক্ষণমূলক গবেষণা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে নিয়ন্ত্রিত দল অপেক্ষা পরীক্ষণ দলের ফলাফল অধিক সন্তোষজনক ছিল।*

শ্রেণীকক্ষে পরীক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগের সুবিধা ও অসুবিধাঃ

সুবিধা ঃ—

১. অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পৃথক গবেষণা বিভাগ থাকে যা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সকল বিশেষজ্ঞরা অতি সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা কার্যে উপাদানগুলোকে নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখে গবেষণা কার্য পরিচালনা করে থাকেন।

২. শ্রেণী-শিক্ষকদের জন্য ব্যবহারিক গবেষণা অধিকতর উপযুক্ত। পরিসংখ্যান-মূলক বিশ্লেষণের প্রয়োগ ছাড়াও পরীক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের উৎকর্ষতা অনুধাবন করা যায়। পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ বিবেচনা সাপেক্ষ।

৩. বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিসিদ্ধান্ত সংক্রান্ত গবেষণা কার্য (Inferential Studies) শিক্ষা বিস্তারের জন্য খুব প্রয়োজনীয়।

৪. শ্রেণী-কক্ষে গবেষণা কার্য পরিচালনা করার ফলে শিক্ষকরা শিক্ষাদান কৌশলে প্রভূত দিক্ষতা অর্জনে সুযোগ পেয়ে থাকেন।

* David R. Cook and N. Kenneth LaFleur, A Guide To Educational Research, Second Edition, Boston, Allyn and Bacon, INC, 1975 p. 163.

গবেষণার ধারাবাহিক পদ্ধতি বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, বিভিন্ন উপাদান নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে এবং নতুন শিক্ষাদান পদ্ধতির নির্ভুল মূল্যায়ণের মাধ্যমে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে সকলের জ্ঞান এবং পেশাগত অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

৫. শ্রেণী কক্ষ গবেষণার সুফল বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞগণ, উপদেষ্টাগণ ও শিক্ষা-প্রশাসকরা এই ধরনের তৎপরতাকে উৎসাহিত করে থাকেন।

অসুবিধা ঃ—

১. শ্রেণী কক্ষ গবেষণার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গঠিত নয় বলে পরিসংখ্যান মূলক কলাকৌশল প্রয়োগে বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত দল গঠন করাও খুব কঠিন।

২. শ্রেণীকক্ষে প্রভাবকারী উপাদান অনেক বেশী। সুতরাং এদের নিয়ন্ত্রণও কষ্টসাধ্য।

৩. পরীক্ষণমূলক গবেষণা লব্ধ ফলাফল সাধারণতঃ নির্ধারিত দলের বাইরে প্রয়োগ করা যায় না; যদি না তা অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী থেকে নির্বিচারে নির্বাচন পদ্ধতি দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে।

৪. নমুনা দল গঠন করা এবং পরিসংখ্যানমূলক কৌশল প্রয়োগ করার জন্য সুদক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষকের প্রয়োজন।

৫. শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের কার্যকারিতা এবং ফলাফল কোন একটি বিশেষ উপাদানের উপর আরোপ করা যায় না। কোন একটি উপাদানকে সহজে পৃথক করা যায় এমন অবস্থায়ও পরীক্ষণ পদ্ধতির ফলাফল অতি সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করতে হয়।

৬. শ্রেণীকক্ষে পরীক্ষণকার্য পরিচালনা করার ফলে একটি অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতির স্বয়ংক্রিয়তা এবং স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। শ্রেণীকক্ষে পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তগুলো প্রয়োগকৃত অভীক্ষার উপর নির্ভরশীল। আদর্শায়িত নয় এ ধরনের অভীক্ষা অতি সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োগ করা দরকার। পরিমাপ নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য করার জন্য যতদূর সম্ভব নানাধরনের আদর্শায়িত অভীক্ষা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

নমুনায়ন তত্ত্ব ও পদ্ধতি

পরিসংখ্যানে নমুনায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণার ক্ষেত্রে নমুনায়নের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। অন্যান্য সামাজিক গবেষণার মতো শিক্ষা গবেষণায় মানুষের সমস্যা নিয়ে গবেষণা করা হয়। বিভিন্ন দিক থেকে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তি থেকে পৃথক হয়ে থাকে। যেমন—বয়স, বুদ্ধিমত্তা, আর্থসামাজিক অবস্থা, মনোভাব ইত্যাদি। এ জাতীয় চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের জন্য এবং সমগ্র জনসাধারণকে নিয়ে গবেষণা করা কঠিন বলে শিক্ষা গবেষকগণ গবেষণার পূর্বে নমুনা নির্বাচন করে থাকেন। শুধু শিক্ষা গবেষণায় নয়, অন্যান্য মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রেও নমুনায়ন পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। অল্প সময়ে অধিক কাজ করার উদ্দেশ্যে পরিসংখ্যানবিদগণ এমন একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন যার দ্বারা স্বল্প সংখ্যক বিষয়ের উপর অনুসন্ধান সীমিত রেখেও বিস্তৃত পরিধির অধিক সংখ্যক বিষয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

নমুনায়ন হল এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে গবেষণা করার অভিপ্রায়ে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমগ্রকের ভেতর থেকে কিছু একক বেছে নেওয়া হয়। গবেষণার তথ্য সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন গবেষণার সব উপাদানকে একত্রে সমগ্রক বা তথ্য বিশ্ব বলে। অনেক সময় পুরা সমগ্রক থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণা করা কঠিন হয়। যখন পুরা সমগ্রক থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তখন বলা হয় শুমারী বা Census। এই শুমারী প্রনয়ের অসুবিধার কথা চিন্তা করে পরিসংখ্যানবিদগণ নমুনায়নের মতো একটি সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। নিম্নোক্ত উদাহরণের মাধ্যমে 'শুমারী' এবং নমুনায়নের পার্থক্য বোঝা যাবে। একজন বৈদ্যুতিক বাল্ব ব্যবসায়ী এক হাজারটি বাল্ব ক্রয় করার জন্য বাল্ব উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে গেলো। যদি প্রত্যেকটি বাল্ব ঐ ব্যবসায়ী কর্তৃক পরীক্ষিত হয় তবে তা হবে শুমারী। আর যদি এক হাজার

বাল্বের ভেতর থেকে কিছু সংখ্যক বাল্ব বেছে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন তা হবে নমুনায়ন। এই পরীক্ষিত বাল্বগুলো দিয়ে পরিমাপ করা যাবে অন্যান্য বাল্বগুলোর অবস্থা কি হতে পারে।

ব্যক্তি, সংখ্যা বা বস্তু হলো গবেষণার সমগ্রক। কোন ব্যক্তি বিশেষের বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা করা হলে ব্যক্তিই হবে এক্ষেত্রে সমগ্রক। আবার কোন এলাকার ঘর বাড়ী, স্কুলকলেজ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে হলে ঐ এলাকাধীন ঘর-বাড়ী, স্কুল-কলেজ এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানই হবে সমগ্রক। যেমন, কোন একটি উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার পাশের হার জানতে হলে অন্ততঃ গত দশ বা পাঁচ বছরের পাশ করা শিক্ষার্থীদের সমগ্রক হিসাবে গণ্য করতে হবে। আবার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস সম্বন্ধে জানতে হলে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রাবাসগুলোকে সমগ্রক হিসাবে গণ্য করা হবে।

গবেষণার সমগ্রক নির্বাচন করার সময় প্রথমতঃ দৃষ্টি দিতে হবে গবেণার তথ্যের উৎস কি এবং কার কাছ থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। দ্বিতীয়তঃ যাদের নিয়ে তথ্যবিশ্ব বা সমগ্রক নির্বাচন করা হয় তাদের সকলের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কিছু কিছু মিল আছে কিনা।

সমগ্রকের বৈশিষ্ট্যের প্রতীক হিসাবে সমগ্রকের যে অংশটিকে নমুনায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করার জন্য এবং সমগ্রক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নির্বাচন করা হয় তাকে বলে নমুনা। নমুনা সমগ্রকের এমন একটি অংশ যা গবেষণার জন্য বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে নির্বাচন করা হয়। নমুনা হলো যে-ক্ষুদ্র দলটির উপর অনুসন্ধান কার্য চালান হয় এবং যা ছোট পরিধিতে বিস্তৃত-পরিধির সমগ্রকের সব বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব স্বরূপ। যে পদ্ধতির সাহায্যে এই নমুনা নির্বাচন করা হয় সে পদ্ধতিকে বলা হয় নমুনায়ন পদ্ধতি আর নির্বাচিত দলটিকে বলা হয় নমুনা দল।

নমুনার বৈশিষ্ট্য :

নমুনা দলের ব্যক্তি, বিষয় এবং পদ্ধতি কি হবে তা নির্ভর করে গবেষক তাঁর গবেষণায় কি প্রকারের সার্বিকীকরণ (gene-

Dhaka University Institutional Repository

ralization) করবেন তার উপর।

মনে করা হোক গবেষক বাংলাদেশে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার মানের নিম্নগতি সম্পর্কে বিশদভাবে তথ্য সংগ্রহ করে সার্বিকীকরণ বা সাধারণ ধর্মী একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চান। এক্ষেত্রে সারা বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর আর্থসামাজিক এবং অবস্থানের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন এলাকার স্কুলগুলোকে নমুনা দলের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সচরাচর যে নমুনা দল আকার এবং এলাকার দিক থেকে ছোট, গবেষকগণ এধরনের নমুনা দল থেকে তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। সংগৃহীত তথ্যের ফলাফলের ভিত্তিতে সার্বিকীকরণ করা হয়। এতে নমুনা নির্বাচন অধিকতর সীমিত ভাবে হয়ে থাকে। সময়, শক্তি এবং ব্যয়ও কম হয়। যদি কোন নমুনা নির্বাচন অত্যধিক ছোট আকারের জনসংখ্যা, ছোট এলাকা থেকে নির্বাচিত হয় তাহলে গবেষণায় ফলাফল দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত দলের বাইরে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। যেভাবেই সার্বিকীকরণ করা হোক না কেন গবেষককে তার ভিত্তি কি তা নির্দেশ করতে হবে।

কোন একটি লোক সমাজের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য সমূহ নির্ধারণ করার পর এমনভাবে নমুনাদল নির্বাচন করা প্রয়োজন যে দল বৃহৎ দলটির প্রতিনিধিত্ব করবে সর্বতোভাবে। নমুনায়ন পদ্ধতির মোটামুটি তিনটি স্তর রয়েছে। যথাঃ— ক) সমগ্রক নির্বাচন, খ) সমগ্রক থেকে নমুনা নির্বাচন, গ) নির্বাচিত নমুনা দলের জানা বৈশিষ্ট্য থেকে সমগ্রকের অজানা বৈশিষ্ট্য সমূহ সম্পর্কে পরিসংখ্যান মূলক সিদ্ধান্ত, পরিসংখ্যানমূলক সিদ্ধান্ত থেকে পরিমান সম্পর্কে জানা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—আমরা চতুর্থ শ্রেণীর নয়শত শিক্ষার্থীর I. Q জানতে চাই। এই নয়শ শিক্ষার্থীর সকলকে বিশেষ কোন অভীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ণ করে ফলাফলের গড় বের করে I. Q জানতে পারি। এই নয়শ শিক্ষার্থীর সকলের পরীক্ষার ফলাফলের যে গড়াংক পাওয়া যায় তা হল পরিমান। মনে করা হোক, I. Q. নির্ধারণের জন্য চতুর্থ শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীকে পাওয়া গেল না। এক্ষেত্রে মূল্যায়ণের জন্য কিছু-সংখ্যক শিক্ষার্থী বেছে নিলাম। প্রথমে দেখা দরকার কোন শিক্ষার্থীকে নির্বাচন করা হবে। আমরা চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষকদের অনুরোধ করতে পারি যেসব শিক্ষার্থী স্বেচ্ছায় দলভুক্ত হতে চায়

তাদের নিয়ে দল গঠন করার জন্য। এই উপায়ে দল গঠন করা হলে তারা চতুর্থ শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষার্থী দ্বারা নির্বাচিত দল হবে। তারা হবে চতুর্থ শ্রেণীর স্বেচ্ছায় অন্তর্ভুক্ত দল। যারা স্বেচ্ছায় পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক তারা স্বভাবতই পরীক্ষা দিতে অনিচ্ছুক দলের চাইতে বুদ্ধিমত্তায় I. Q. ও দক্ষতায় অত্যধিক উঁচু হবে।

তাহলে শিক্ষকরা কি মোট শিক্ষার্থীর শতকরা হারের ভিত্তিতে কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী নির্বাচন করবেন? অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে শতকরা হারের ভিত্তিতে নমুনা নির্বাচন অসুবিধাজনক। গবেষকরা প্রায়ই নমুনা নির্বাচনে এই পদ্ধতি পরিহার করে থাকেন। আর একটি উপায়ে নমুনা নির্বাচন করা যেতে পারে তাহলো যেসব শ্রেণীকক্ষে সহজে যাওয়া যায় সে সকল শ্রেণীকক্ষ নির্বাচন করে তথ্য সংগ্রহের সময় যেসকল শিক্ষার্থীদের পাওয়া যায় তাদের নিয়ে দল গঠন করা। এভাবে গঠিত দল থেকে সংগৃহীত তথ্যের সার্বিকীকরণ করা হলে তা নির্ধারিত দলের বাইরে প্রযোজ্য হবে না।

নমুনায়নের প্রকারভেদ :

নমুনায়নের ভিত্তিতে সমগ্রকের বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি, ইত্যাদি সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান লাভই নমুনাভিত্তিক গবেষণার উদ্দেশ্য। সমগ্রক থেকে নমুনা গঠনের কয়েকটি পদ্ধতি আছে। নমুনা ভিত্তিক গবেষণার জন্য নমুনায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি ও তার প্রয়োগ বিধি সম্পর্কে গবেষকের প্রচুর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। নমুনা দল গঠনের সময় নমুনা দলে যাতে সমগ্রকের বৈশিষ্ট্য সমূহ বিদ্যমান থাকে ও গঠিত দল ঠিকভাবে সমগ্রকের প্রতিনিধিত্ব করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত দরকার। নির্বাচিত নমুনা দলে সমগ্রকের বৈশিষ্ট্য সমূহ বিদ্যমান থাকলে এবং নমুনা প্রতিনিধিত্বশীল হলে সেই নমুনা ভিত্তিক গবেষণার ফলাফল সমগ্রকের উপর প্রযোজ্য হয়। গবেষণার সুবিধার্থে এবং নিরপেক্ষ, সঠিক, প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা দল গঠনে যাতে কোন প্রকার বিঘ্নের সৃষ্টি না হয় সেজন্য পরিসংখ্যানবিদরা নমুনায়নের বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন। গবেষণার উদ্দেশ্য, তথ্যের প্রকৃতি, সময় এবং গবেষণার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের দিকে নজর রেখে নমুনায়ন পদ্ধতিগুলো থেকে যে কোন

Dhaka University Institutional Repository

একটি গবেষক বেছে নিতে পারেন।

সম্ভাবনা তত্ত্বের ভিত্তিতে নমুনায়ন পদ্ধতিকে সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা :—

১। সম্ভাবনা নমুনায়ন (Probability sampling)
২। নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন (Non-Probability sampling)

১। সম্ভাবনা নমুনায়ন :

সম্ভাবনা নমুনায়নে সমগ্রকের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক এককের নমুনাদলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সমান সম্ভাবনা থাকে। সমগ্রকের প্রতিটি এককের এই সম্ভাবনাকে পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভবপর হয় এবং গঠিত নমুনাদল প্রতিনিধিত্বমূলক হয়ে থাকে।

সম্ভাবনা নমুনায়ন কয়েক প্রকারের হতে পারে। যেমন—

ক) দৈবচয়িত নমুনায়ন (Random sampling)
খ) স্তরিত নমুনায়ন (Stratified sampling)
গ) নিয়ম ক্রমিক নমুনায়ন (Systematic sampling)
ঘ) গুচ্ছ নমুনায়ন (Cluster sampling)
ঙ) বহু পর্যায়ী নমুনায়ন (Multistage sampling)
চ) ভূমিগত নমুনায়ন (Area sampling)
ছ) ক্রমপর্যায়ী নমুনায়ন (Sequential sampling)

ক) দৈব চয়িত নমুনায়ন :

যে নমুনায়ন পদ্ধতিতে সমগ্রকের প্রতিটি এককের নির্বাচিত হওয়ার সমান সম্ভাবনা ও দলভুক্ত হবার সমান সুযোগ থাকে এবং প্রত্যেক পছন্দই একটি অপরটি থেকে আলাদা তাকে বলা হয় দৈবচয়িত নমুনায়ন। দৈব চয়ন করার বিবিধ উপায় আছে। মনে করি, কোন একটি স্থানের ১০ম শ্রেণীর ৬০০ জন শিক্ষার্থী থেকে ২৫ জনের একটি নমুনা দল গঠন করব—সমগ্রসম্ভাব্য ভাবে। এক্ষেত্রে তাশ পরকাইয়ে বা লটারী করে নমুনা গ্রহণ করা যায়, কিন্তু তাতে যেকোন ভাবেই হোক পক্ষপাতিত্ব থেকে যায়। এই পক্ষপাতিত্ব

দূর করতে অনেক প্রকার নির্বিচারী বা দৈব ঘটিত সংখ্যা তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। দৈবসংখ্যা সারণী বা Random Number Table এদের মধ্যে অন্যতম। এই দৈব সংখ্যা সারণী থেকে ২৫ জনের একটি তালিকা নিয়ে দল গঠন করলেই দৈবচয়িত নমুনায়ন হবে।

দৈবচয়িত নমুনায়ন আবার সীমিত এবং অবাধ দৈবচয়িত হতে পারে। স্বল্প সময়ে এবং স্বল্প ব্যয়ে যদি কোন অনুসন্ধান কর্ম পরিচালনা করা হয় তাহলে সীমিত দৈবচয়িত নমুনায়ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে দল গঠন করে গবেষণা করা যায়। কোন গবেষনার আর্থিক এবং সময়ের স্বল্পতা না থাকলে অবাধ দৈবচয়িত নমুনায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে দল গঠন করা হয়। এই পদ্ধতি অধিকতর বিজ্ঞান সম্মত এবং দল গঠনে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব হবার সম্ভাবনা থাকেনা।

খ) স্তরিত নমুনায়ন :

এই পদ্ধতিতে সমগ্রক বা তথ্য বিশ্বকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই ভাগগুলোকে উপসমগ্রক এবং প্রতিটি ভাগকে স্তর বলা হয়। যেমন, একটি বিশেষ বস্তি এলাকার বাসিন্দাদের আয়ের হিসাব করা হবে। এই লোকগোষ্ঠিকে আর্থ-সামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত করা হলো :—

দক্ষ শ্রমিক—২৫%
অদক্ষ শ্রমিক—৫০%
পেশাজীবি শ্রমিক—১৫%
দোকানদার—১০%

এইভাবে প্রত্যেকটি উপবিভাগ থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এই উপবিভাগের মাধ্যমে দল গঠন করাকে স্তরিত নমুনায়ন বলে।

গ) নিয়মক্রমিক নমুনায়ন :

এই প্রক্রিয়ায় তথ্য বিশ্বকে N/n (N = সমগ্রকের সংখ্যা; n = নমুনা সংখ্যা) অংশে বিভক্ত করা হয়। যদি k = N/n,

Dhaka University Institutional Repository

k একটি আসন্নপূর্ণ সংখ্যা। এখন ১ থেকে k এর মধ্যে একটি random number নির্বাচন করতে হবে। তারপর তা থেকে k সমদূরবর্তী সংখ্যা পর পর নিয়ে n সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে। যদি প্রথম নির্বাচিত সংখ্যা a হয়, তাহলে পরবর্তী সংখ্যাগুলো হবে a+k, a+2k, a+3k ইত্যাদি। নিরমক্রমিক নমুনায়ন সহজসাধ্য এবং এতে সমুদয় তালিকার প্রায় সকল অংশ থেকেই নমুনা গ্রহণ করা হয়, আর ১ম সংখ্যাটি যখন নির্বিচারি বা দৈবক্রমে পাওয়া গেছে এতে কিছুটা নির্বিচারি দৈবগুণও রয়েছে।

ঘ গুচ্ছ নমুনায়ন ঃ

এই প্রকার নমুনায়ন দৈবচয়িত নমুনায়নের অন্য আর একটি রূপ। প্রকৃতপক্ষে সমগ্রক যখন বৃহদাকারের হয় এবং ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে থাকে তখন এই প্রকার নমুনায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। যদি কোন গবেষণার জন্য দেশের সকল প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়ে নমুনাদল গঠন করার প্রয়োজন হয়, সেটা হবে একটা কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। এক্ষেত্রে যদি প্রত্যেক জেলা থেকে কিছু স্কুল বেছে নিয়ে সেইসব স্কুলের শিক্ষকদের নিয়ে দল গঠন করা হয় সেটা হবে সহজসাধ্য। এই প্রকার নমুনায়নকে বলা হয় গুচ্ছ নমুনায়ন।

বহুপর্যায়ী নমুনায়ন ঃ

বহুপর্যায়ী নমুনায়নের পদ্ধতি হলো পর্যায়ক্রমে নমুনা একক নির্বাচন করা। অনেক সময় প্রথমে একটি নমুনা নিয়ে, পরে আবার ঐ নমুনা থেকে নমুনা নেওয়ার প্রয়োজন হয়। এরূপ চয়নকে পর্যায়ী চয়ন বলে। প্রথম পর্যায়ে চয়িত অংশগুলোকে প্রাথমিক চয়ন (primary sampling unit), দ্বিতীয় পর্যায়ে চয়িত অংশগুলোকে উপচয়ন একক বা দ্বিতীয় পর্যায়ী একক (second stage unit) বলে। দ্বিতীয় পর্যায়েই চয়ন শেষ হতে পারে, আবার তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি বহুপর্যায়ী চয়নও হতে পারে। শেষ পর্যায়ে চয়িত অংশকে চূড়ান্ত চয়ন একক (ultimate sampling unit) বলা হয়। প্রাথমিক চয়ন এককগুলোর আয়তন যথা-সম্ভব সমান হলে নমুনা গ্রহণে সুবিধা হয়। বহুবিস্তৃত ও বড়

ধরনের কোন গবেষণা কর্মে এই নমুনায়ন বেশ গ্রহণযোগ্য।

চ) ভূমিগত নমুনায়ন ঃ

কৃষি সংক্রান্ত জরীপ কর্মের জন্য যখন সমগ্র দেশ ভিত্তিক জরীপ কার্য পরিচালনা করার প্রয়োজন হয় তখন ভূমিগত নমুনায়ন পদ্ধতি অত্যধিক ব্যবহার করা হয়। সচরাচর দেশের একটি মানচিত্রে কেন্দ্রবিন্দু স্থির করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে দৈবচয়িতভাবে এই বিন্দুর মাধ্যমে বিভিন্ন দিকে রেখা অংকন করা হয়। যে সকল স্থান এইসব রেখার মধ্যে পরে সেগুলো নিয়ে নমুনাদল গঠন করা হয় এবং এই দল থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়।

ছ) ক্রমপর্যায়ী নমুনায়ন ঃ

শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোন দ্রব্যের মান নির্ণয় করার জন্য যে নমুনা চয়ন করা হয় তাকে ক্রমপর্যায়ী নমুনায়ন বলা হয়। এটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যানে প্রযোজ্য। উৎপাদিত শিল্প দ্রব্যের গুণগত মান নির্ণয় করার জন্য এ জাতীয় নমুনায়ন বহুল ব্যবহৃত হয়।

২. নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন ঃ

যে সব গবেষণায় সম্ভাবনা নমুনায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না, সে সব ক্ষেত্রে গবেষক নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে নমুনাদল গঠন করে থাকেন। নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন দুই প্রকার। যথা ঃ—

ক) আকস্মিক নমুনায়ন (Accidental Sampling)

খ) উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন (Purposive Sampling)

ক) আকস্মিক নমুনায়ন ঃ

গবেষক অনেক সময় নমুনায়নের বিশেষ কোন পদ্ধতি অনুসরণ না করে তাঁর নিজের সুবিধা অনুযায়ী, ইচ্ছা অনুযায়ী এবং যা কাছে পাওয়া যায় সেগুলোকে নমুনা হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। এই ধরনের নমুনা প্রতিনিধিত্বশীল এবং বিজ্ঞানসম্মত না হলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ গবেষণার উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

খ) উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন ঃ

এই পদ্ধতিতে নমুনা নির্বাচন করতে সম্ভাবনা তত্ত্ব ব্যবহার করার

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন হয় না। গবেষক নিজের পছন্দ বা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করে দল গঠন করেন। এই পদ্ধতিকে বিচার নমুনায়নও বলা হয়। কারণ এ ক্ষেত্রে নির্বাচনকারীর বিচার বুদ্ধিই হলো নমুনা নির্বাচনের ভিত্তি। সংগ্রহীত তথ্যগুলোতে যাতে কোন প্রকার ভাব প্রবণতা বা পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ না পায় সে জন্য গবেষককে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হয়। বিচার বিবেচনা করে এবং যুক্তি প্রয়োগ করে নমুনাদল গঠন করতে হয়।

নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন যদিও বহুল ব্যবহৃত তবে এই নমুনায়নের সাহায্যে সীমিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সার্বিকীকরণের ক্ষেত্রে এই নমুনায়ন মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

নমুনাদলের আকৃতি নির্ধারণ

ক) গবেষণার প্রকৃতির উপর নির্বাচিত নমুনাদলের অন্তর্ভুক্তি নমুনার সংখ্যা নির্ভর করে।

খ) বর্ণনামূলক গবেষণার জন্য তথ্য বিশ্ব থেকে শতকরা ১০ জনকে নিয়ে নমুনাদল গঠন করা যেতে পারে।

গ) সীমিত আকারের বা ছোট তথ্য বিশ্বের জন্য শতকরা কুড়ি জনকে নিয়ে নমুনাদল গঠন করা যায়।

ঘ) সহ-সম্পর্কিত গবেষণার জন্য কম পক্ষে ৩০ জন শিক্ষার্থীর প্রয়োজন হবে।

ঙ) কঠোর নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় কোন পরীক্ষণমূলক গবেষণা পরিচালিত হলে প্রতিটি নমুনাদলে (নিয়ন্ত্রিত এবং পরীক্ষণমূলক দল) ১৫ জন শিক্ষার্থীই যথেষ্ট।

বিভিন্ন প্রকার নমুনায়ন পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে প্রতিটি প্রক্রিয়া ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা আছে। একটি সঠিক প্রতিনিধিত্বশীল নমুনাদল গঠন করা খুব কঠিন। নমুনায়নের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে সাধারণ সম্ভাবনা নমুনায়ন অথবা স্তরিত নমুনায়ন পদ্ধতি অধিকতর উপযুক্ত। দৈবচয়িত পদ্ধতি অন্যান্য নমুনায়ন পদ্ধতির চেয়ে সহজ ও বৈজ্ঞানিক। কখনও কখনও গুচ্ছ নমুনায়ন বা নিয়মক্রমিক নমুনায়নও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

দশম অধ্যায়

তথ্য সংগ্রাহক উপকরণ

গবেষণা তথ্য সংগ্রহের জন্য নানা ধরনের পদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য বিশেষ ধরনের উপকরণ রয়েছে। এক একটি উপকরণ এক একটি পদ্ধতির জন্য বিশেষ ভাবে উপযুক্ত। এই সব উপকরণের প্রত্যেকটিরই এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কোন কোন উপকরণের সাহায্যে গুণগত তথ্য আবার কোন কোন উপকরণের সাহায্যে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তথ্যের পরিমাণগত ও পরিসংখ্যানগত বিবরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সংগৃহীত তথ্যকে পরিমাণে প্রকাশ করা, তথ্যের পরিসংখ্যানগত বিবরণ দেওয়া ক্ষেত্রভেদে বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যদিও উত্তরদাতার মতামতকে কোন কোন ক্ষেত্রে পৌনঃপুন্য বা ফ্রিকোয়েন্সী, শতকরা হার, স্কোর কিম্বা অন্য কোন উপায়ে প্রকাশ করা যায় না তথাপি অধিকাংশ তথ্যকে পরিমাণে প্রকাশ করে অধিকতর অর্থবহ করা যায়। কোন কোন উপকরণের সাহায্যে একটি বিশেষ ক্ষেত্রে কোন বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি নির্ধারণ করা যায়। আবার কোনটার সাহায্যে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা যায়, যার দ্বারা কোন পরিস্থিতিতে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্য ও উপাদানসমূহের মধ্যে তুলনা করা অথবা সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করা হয়। কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যের পরিমাণ দ্বারা উক্ত বৈশিষ্ট্যের বিবরণীকে স্পষ্টতর করা যায়। কারণ এর দ্বারা কোন বৈশিষ্ট্য কি, কেবল মাত্র এই প্রশ্নের উত্তরই নয় বরং তা কি পরিমাণে বিদ্যমান তাও জানা যায়।

সংগৃহীত তথ্যকে পরিমাণে প্রকাশ করার জন্য নানা প্রকার পরিসংখ্যান মূলক পদ্ধতি আছে। যেমন, শতকরা, পৌনঃপুন্যের সংখ্যা, সারিবিন্যাস, সমষ্টি-মূলক বণ্টন, ক্রম সমষ্টি মূলক বণ্টন, মেধাভিত্তিক অবস্থান, জোড়ায় জোড়ায় তুলনা, আদর্শায়িত মান নির্ধারণ, কোন স্কেলের স্কোর মান নির্ধারণ দ্বারা তথ্যকে অধিকতর উপযোগী ও অর্থবহ করা যেতে পারে। এই সব উপকরণের তুলনামূলক উপ-

Dhaka University Institutional Repository

যোগ্যতা ও এদের ব্যবহার একটি উদাহরণ দিয়ে প্রকাশ করা যায়। যেমন, কোন রাজমিস্ত্রীকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়—'কোন যন্ত্রটি আপনার জন্য অধিকতর প্রয়োজনীয়, হাতুড়ী না হাত করাত ? এই প্রশ্নের জবাব কি হবে সহজেই অনুমেয়। ঠিক একই ভাবে যদি প্রশ্ন করা হয় কোন উপকরণটি কোন বিশেষ গবেষণার জন্য ব্যবহার করা হবে ? এর উত্তরও অনুরূপ হবে। অর্থাৎ যখন যার ব্যবহার অপরিহার্য ঠিক তখনই সেটি ব্যবহার করতে হবে।

শিক্ষা গবেষণার বেশীর ভাগ তথ্য সংগ্রাহক উপকরণ প্রশ্ন আকারে হয়ে থাকে। এই গবেষণায় মানুষের আচার-আচরণ পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে এক প্রকার পত্র ব্যবহার করা হয়। এই পত্রগুলোকে অনুসন্ধানকারী পত্র বা ইনকোয়ারী ফর্ম বলা হয়। অর্থাৎ মানুষের আচার-আচরণ পরিমাপ করার জন্য লিখিত আকারে যে পত্র ব্যবহার করা হয় তাকে অনুসন্ধানকারী পত্র বলা হয়। এই পত্র নানা ধরনের হতে পারে। যেমন :—

১। তালিকা (Schedule)
২। ইনভেনটরী (Inventory)
৩। প্রশ্নমালা (Questionnaire)
৪। মতামত সংগ্রহকারী পত্র (Opinionnaire)

এছাড়া শিক্ষা গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আরও কিছু পদ্ধতি রয়েছে। যেমন :—

৫। পর্যবেক্ষণ (Observation)
৬। সাক্ষাৎকার (Interview)
৭। সমাজমিতি (Sociometry)
৮। মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা (Psychological tests)

১. তালিকা :

তালিকা হচ্ছে অনেকগুলো উক্তি সম্বলিত একটি প্রশ্নমালা। প্রশ্নকারীর উপস্থিতিতে এটি পূরণ করা হয়। কখনও কখনও প্রশ্নকারী নিজেই উত্তরদাতার সম্মুখে পূরণ করে থাকেন। সচরাচর ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করা হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ঘটনা জড়িত তথ্য

সংগ্রহ করা হয়।

সুবিধা :—

ক. গবেষণার উদ্দেশ্যে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করা যায়।
খ. যথাযথ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয়।
গ. প্রয়োজন বোধে উক্তিগুলোর অর্থ উত্তরদাতার নিকট স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।
ঘ. উত্তরদাতাকে কাছে পাওয়া যায়। ফলে তালিকায় ব্যবহৃত প্রত্যেকটি উক্তির জবাব সংগ্রহ করা সহজতর ও সম্ভবপর হয়।
ঙ. পূর্ণাঙ্গ ও প্রয়োগশীল ফলাফল পাওয়া যায়।
চ. সময় ও অর্থ ব্যয় কম হয়।

অসুবিধা :—

ক. অনেক সময় সঠিক উত্তরদাতাকে পাওয়া যায় না।
খ. ক্ষেত্র বিশেষে সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ হয়ে পড়ে।

২. ইনভেনটরী বা বিশেষ প্রকারের তালিকা :

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করা হয়, বিশেষতঃ শিল্প প্রতিষ্ঠানে। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে কি আছে না আছে তার হিসাব রক্ষণের জন্য এই ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং এই বিশেষ প্রকারের তালিকার সাহায্যে তথ্য সংগৃহীত হয়। ঘটনা জড়িত তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং পরিমাণগত তথ্যের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

৩. প্রশ্নমালা :

সুনির্দিষ্ট ও পরস্পর সম্পর্কিত কতগুলো প্রশ্নের সমন্বয়ে গঠিত যে প্রশ্ন পত্র ডাকযোগে বা অন্য কোন উপায়ে উত্তরদাতার নিকট তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয় তাকে প্রশ্নমালা বলে। প্রশ্নমালা এবং সাক্ষাৎকারের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। উত্তরের সাহায্যে উত্তরদাতার অনুভূতি, বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা এবং কার্য কলাপ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তবে প্রশ্নমালা সম্ভবতঃ সর্বাধিক ব্যবহৃত গবে-

Dhaka University Institutional Repository

বড় আকারের জনগোষ্ঠি থেকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রশ্নমালা ব্যবহৃত হয়। সচরাচর ডাকযোগে প্রেরিত হয়। উত্তরদাতা এটা পূরণ করে গবেষকের কাছে পাঠিয়ে দেয়। এর সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে পরিমাণগত এবং গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সমাজ বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিজ্ঞানী এই পদ্ধতির সাহায্যে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। এটা তথ্য সংগ্রহের একটি সহজ উপকরণ। প্রশ্নমালা এমন ভাবে তৈরী করা হয় যাতে উত্তরদাতা প্রশ্নকারীর সাহায্য ব্যতীত উত্তর দিতে পারেন। এর ভাষা সহজ ও বোধগম্য হওয়া উচিত। ঠিক ভাবে তৈরী করতে পারলে প্রশ্নমালাকে একটি উন্নতমানের তথ্য সংগ্রহকারী পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা যায়। তবে প্রশ্নমালা দীর্ঘ হলে সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ বাস্তব ক্ষের থেকে ঘটনা জড়িত তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

প্রশ্নমালা দুই প্রকার। যথা ঃ—

১। উন্মুক্ত প্রশ্নমালা (The Open form)
২। নির্ধারিত প্রশ্নমালা (The Closed form)

১. উন্মুক্ত প্রশ্নমালাঃ

এই ধরনের প্রশ্নমালায় উত্তরদাতা নিজের ভাষায় নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী উত্তরদান করে থাকে। উত্তরদানের ক্ষেত্রে উত্তরদাতার অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে। উন্মুক্ত প্রশ্নমালায় উত্তর ও উত্তর সংকেত কিছুই দেওয়া থাকে না এবং যে কোন প্রশ্নের উত্তরের জন্য গভীর জ্ঞানের দরকার। ফলে এইসব তথ্যের বিন্যাস, বিশ্লেষণ ও সংক্ষিপ্তকরণের জন্য যথেষ্ট সময় ও শ্রমের প্রয়োজন।

উদাহরণ—গবেষণা কাকে বলে ?

২. নির্ধারিত প্রশ্নমালা ঃ

যেসকল প্রশ্নমালায় টিক চিহ্ন, 'হাঁ' বা 'না', সংক্ষিপ্ত উত্তর, অথবা প্রত্যেকটি প্রশ্নে প্রদত্ত উত্তরগুলোর একটিতে চিহ্ন দিয়ে

উত্তর দেওয়া যায় তাকে নির্ধারিত প্রশ্নমালা বা closed form বলা হয়। নির্ধারিত প্রশ্নমালায় এ ব্যবস্থাও রাখা যেতে পারে যাতে প্রদত্ত উত্তরগুলো ছাড়াও প্রয়োজন বোধে উত্তরদাতা নিজের ভাষায় অন্যকোন উত্তরও সংযোজন করতে পারেন। এর ফলে উত্তরদাতা হয়ত এমন কোন উত্তর দিতে পারেন যা প্রশ্নকর্তা আদৌ চিন্তা করেন নি।

কতগুলো নির্দিষ্ট ধরনের তথ্যের জন্য নির্ধারিত প্রশ্নমালা অত্যন্ত উপযুক্ত। এটা অল্প সময়ে এবং সহজে পূরণ করা যায় এবং উত্তরদাতাকে বিষয়বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট করে। এই প্রশ্নমালার সাহায্যে ঘটনা জড়িত তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং এইসব তথ্যকে সহজে তালিকা আকারে সাজানো ও বিশ্লেষণ করা যায়।

উদাহরণ—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির যে প্রয়োগে নতুন জ্ঞান বা তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করার আনুষ্ঠানিক প্রচেষ্টা করা হয় তাকে বলা যায়—

ক. পর্যবেক্ষণ।
খ. পরীক্ষণ।
গ. সমস্যা নির্ধারণ।
ঘ. গবেষণা।

মিশ্র প্রশ্নমালা (The Mixed form) ঃ

যে প্রশ্নমালায় নির্ধারিত ও উন্মুক্ত এই দুই ধরনের প্রশ্ন দেওয়া থাকে তাকে মিশ্র প্রশ্নমালা বলা হয়। প্রত্যেক ধরনের প্রশ্নমালার দোষগুণ আছে। প্রশ্ন তৈরী করার পূর্বে প্রশ্নকারী বিবেচনা করেন কোন ধরনের প্রশ্নের সাহায্যে তার গবেষণার জন্য আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।

তথ্য সংগ্রহকারী উপকরণ হিসাবে প্রশ্নমালা সর্বাধিক ব্যবহৃত ও সমালোচিত হয়ে থাকে। সমালোচনার কারণ প্রশ্নমালার অপব্যবহার। ভাল প্রশ্নমালা তৈরী করতে যথেষ্ট সময়, শক্তি ও ধৈর্যের দরকার। দীর্ঘ প্রশ্নমালার সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না এবং পূরণ করতে যথেষ্ট সময় ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন। ত্রুটিপূর্ণ প্রশ্নমালা উত্তরদাতার জন্য খুব বিরক্তিকর এবং তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। প্রশ্নমালা অত্যন্ত দীর্ঘ, বিষয়বস্তু গুরুত্বহীন, প্রশ্নের

Dhaka University Institutional Repository

শব্দচয়ন ত্রুটিপূর্ণ এবং ত্রুটিপূর্ণ আকারে সংগঠিত হলে সাধারণতঃ অতি অল্প সংখ্যক প্রশ্নমালা পূরণ হয়ে ফেরৎ আসে। অনেক সময় এই অল্প সংখ্যক প্রশ্নমালার উপর ভিত্তি করে গবেষণা কার্য সমাধা করতে হয়। কিন্তু যদি সব প্রশ্নমালা পূরণ হয়ে ফেরৎ আসে তাহলে গবেষণার ফলাফল সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।

প্রশ্নমালার বৈশিষ্ট্য—

১. প্রশ্নমালা যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত, সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রশ্নপত্রে টেকনিক্যাল শব্দাবলী ব্যবহার না করাই শ্রেয়।

২. প্রশ্নপত্রে প্রশ্নগুলো ক্রম অনুসারে সাজানো দরকার যাতে সাধারণ থেকে বিশেষ এবং সহজ থেকে কঠিনের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। এতে উত্তরদাতার উত্তর প্রদানে আগ্রহ জন্মাবে।

৩. প্রশ্নমালা এমনভাবে প্রস্তুত করা এবং শ্রেণীবিভাগ করা প্রয়োজন যাতে প্রাপ্ত তথ্যাদি ছকে বিন্যস্ত, বিশ্লেষণ এবং সহজে ছকবদ্ধ করা যায়।

৪. প্রশ্নমালা আকর্ষণীয় হওয়া দরকার এবং প্রত্যেকটি প্রশ্ন স্পষ্টাক্ষরে সুবিন্যস্ত ভাবে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

৫. গবেষণার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হলে সঠিক উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। এক্ষেত্রে উত্তরদাতা তার সময়ের অপচয় বলে মনে করেন না। প্রশ্নমালার কোন একটি স্থানে অথবা ভিন্ন কাগজে গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়টির তাৎপর্য উল্লেখ করা যেতে পারে।

৬. প্রশ্নমালায় কোন প্রকার ভাব প্রবণ ও আবেগ উদ্দীপক শব্দ ব্যবহার না করাই শ্রেয়। এটি এমন ভাবে প্রণয়ন করা যেতে পারে যাতে উত্তরদাতার কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করার অবকাশ না থাকে।

৭. প্রশ্নমালায় সঠিক এবং সম্পূর্ণ নির্দেশ থাকবে। গুরুত্বপূর্ণ শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া, প্রশ্নগুলো সহজ, সঠিক এবং সম্ভাব্য শব্দ দ্বারা গঠন করা এবং মনোবিজ্ঞান সম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিরক্তিকর ও দ্বিধাযুক্ত প্রশ্নগুলো বর্জন করা যেতে পারে।

৮. সংগঠিত প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে গবেষক অতি সতর্কতার সঙ্গে সম্ভাব্য উত্তর প্রশ্নের সাথে লিপিবদ্ধ করবেন যাতে উত্তরদাতা সেগুলোর মধ্যে তার উত্তর সীমাবদ্ধ রাখেন।

প্রশ্নমালার সুবিধা—

১. প্রশ্নমালার প্রধান সুবিধা হল এটা কম ব্যয় সাপেক্ষ, ডাকযোগে ও লোক মারফত যে কোন স্থানে প্রেরণ করা যায়।

২. থিসিস, অভিসন্দর্ভ (dissertation) এবং সকল প্রকার গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রশ্নমালা কেন এত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় তা বোঝা কঠিন নয়। প্রথমতঃ প্রশ্নমালা সহজ এবং দ্বিতীয়তঃ, প্রশ্নমালার সাহায্যে অধিক সংখ্যক ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

৩. তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে একই প্রশ্নপত্র প্রত্যেক উত্তরদাতার নিকট প্রেরণ করা হয়। ফলে সংগৃহীত তথ্যাদি সাক্ষাৎকারের সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যাদির চাইতে অধিকতর তুলনামূলক ও নির্ভরশীল হয়।

৪. প্রশ্নমালার প্রশ্নগুলো আদর্শায়িত করা হলে অধিকতর ফলপ্রসূ হয়। কারণ আদর্শায়িত অভীক্ষা প্রাচীন অভীক্ষাগুলোর তুলনায় অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য, কার্যকর ও মুক্ত।

৫. একটি বড় এলাকার জনসাধারণ থেকে প্রশ্নমালার সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্র অত্যধিক বৃহৎ হলে অনেক সময় নমুনায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে নমুনা দল থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উত্তরদাতাকে কাছে পাওয়া না গেলে এবং বড় এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন হলে ডাকযোগে প্রশ্নপত্র প্রেরণ করা যেতে পারে।

৬. সাক্ষাৎকার বা অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করার একটি প্রধান অসুবিধা হল যে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে এই ধরনের পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা থাকে না।

৭. সাক্ষাৎকার পদ্ধতির জন্য সাক্ষাৎকারীর দক্ষতা এবং কিছু প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে। কিন্তু প্রশ্নমালার সাহায্যে তথ্য সংগ্রহের

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে এসবের প্রয়োজন হয় না। উত্তরদাতাকেও ব্যক্তিগত ভাবে প্রশ্নকারীর নিকট উপস্থিত থাকতে হয় না।

৮. অনেক সময় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগৃহীত হলে কোন কোন প্রশ্নের জবাব উত্তরদাতা লজ্জা ও সংকোচের দরুণ সরাসরি দিতে পারে না। সেক্ষেত্রে প্রশ্নপত্রের সাহায্যে উক্ত তথ্য সংগৃহীত হলে উত্তরদাতা দ্বিধাহীন চিত্তে উত্তর দিতে পারেন। বিশেষতঃ যেসব প্রশ্নমালায় উত্তরদাতার নাম লেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কাজেই সেক্ষেত্রে তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। গবেষণার তথ্য সংগ্রহকারী বিভিন্ন উপকরণ ও পদ্ধতির যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য যেসব গবেষণাকার্য পরিচালিত হয়েছে তাতে দেখা গেছে এ ধারণা সত্য।

৯. প্রশ্নমালা তথ্য সংগ্রহের একটি সহজ উপায়। ঠিকভাবে তৈরী হলে এটাকে উন্নত মানের পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা যায়।

১০. শিক্ষাবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা এর সাহায্যে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। গবেষণার এই দুই ক্ষেত্র বিশাল এবং জটিল। এই দুই ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ অন্যান্য পদ্ধতির চাইতে শ্রেয়ঃ বলে গণ্য করা হয়।

প্রশ্নমালার অসুবিধা—

১. প্রয়োজন অনুসারে উত্তরদাতার প্রেরণা যোগান যায় না। কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উত্তরদাতাকে কাছে পাওয়া যায় না, ফলে গবেষণার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, প্রশ্নবিশেষের অর্থ ও ব্যাখ্যা খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ করা যায় না।

২. এই পদ্ধতির জন্য উত্তরদাতাকে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি হওয়া দরকার। অশিক্ষিত জনগোষ্ঠির মধ্যে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় না। এমন কি গ্রামের যেসব এলাকায় শিক্ষিত লোকের হার কম, সেসব এলাকায়ও এই পদ্ধতি তেমন ফলপ্রসূ নয়।

৩. গবেষণার এলাকা বিস্তৃত হলে অনেক সময় নমুনাদল গঠন করার প্রয়োজন হয়। সঠিক নমুনাদল গঠন করা কঠিন। অনেক ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব ও ভারপ্রবণতার প্রভাব বিস্তার করার সম্ভাবনা থাকে। ফলে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য হয়।

৪. উত্তরদাতার নিকট প্রেরিত সব প্রশ্নপত্র ঠিকভাবে পূরণকৃত হবার পর যথাযথ সময়ে গবেষকের নিকট ফেরৎ আসা উচিৎ। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, অনেক প্রশ্নপত্রই ফেরৎ আসে না। এমনকি ডাকযোগে প্রেরিত প্রশ্নমালার মধ্যে ডাক টিকেটসহ ঠিকানা সম্বলিত খাম থাকলেও উত্তর পাওয়া যায় না।

প্রশ্নমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগ প্রণালী ঃ

একটি ভাল প্রশ্নমালা প্রণয়ন করার জন্য যথেষ্ট দক্ষতা, শক্তি, ধৈর্য ও কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন। প্রশ্নমালা সহজ বোধগম্য এবং যথাযথ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহলে সঠিক উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রশ্নমালার পরিকল্পনা গ্রহণ এবং প্রণয়ন করার প্রাক্কালে বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে সকল প্রকার সম্ভাব্য সাহায্য গ্রহণ করা দরকার। অভিজ্ঞ ও পারদর্শীলোকের দ্বারা প্রণয়নকৃত প্রশ্নমালার আলোকে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা এবং তাঁদের মতামত যাচাই করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রশ্নমালা প্রণয়ন করার সময় গবেষককে সচেতন থাকতে হবে যে, তিনি যেন তাঁর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে বিচ্যুত না হন। গবেষক কি ধরনের তথ্য সংগ্রহ করবেন, কি প্রকারে সেই তথ্যকে বিন্যাস ও বিশ্লেষণ করবেন সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। গবেষণার উদ্দেশ্য সামনে রেখে গবেষককে ধারাবাহিকভাবে অগ্রসর হতে হবে। এছাড়া প্রশ্নমালার বিশুদ্ধতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে পরীক্ষামূলকভাবে অল্প কয়েকজন শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

মতামত সংগ্রহকারী পত্র ঃ

যে প্রশ্নমালার কেবল মাত্র উদ্দেশ্য থাকে মতামত সংগ্রহ করা বা মনোভাব যাচাই করা তাকে মতামত সংগ্রহকারী পত্র বা Opinionnaire বলা হয়। কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন একটি বিষয় সম্পর্কে কি অনুভব করেন বা তাঁর বিশ্বাস কি সেটাই হলো তাঁর মনোভাব। মনোভাব বর্ণনা এবং পরিমাপ করা খুব কঠিন। অনেক সময় কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ বিষয় সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে যা বিশ্বাস করেন

Dhaka University Institutional Repository

তা গোপন রেখে সামাজিকতার ভয়ে যা গ্রহণ যোগ্য তা উত্তর দিয়ে থাকেন। এটি মতামতের একটি ক্ষেত্র বিশেষ। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বা কতগুলো উক্তির প্রতি উত্তরদাতার প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করে তাঁর মতামতের একটি নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

এই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাঁর প্রকৃত মনোভাব যাচাই করা হয়। উত্তরদাতার বাহ্যত প্রকাশিত মনোভাব দ্বারা তাঁর প্রকৃত মনোভাব নির্ধারণ করা খুব ত্রুটিপূর্ণ। কোন ব্যক্তি তাঁর প্রকৃত মনোভাব গোপন রেখে সমাজে গ্রহণযোগ্য মতামত প্রকাশ করতে পারেন। আবার এমনও হতে পারে যে কোন ব্যক্তি সামাজিক সমস্যাবলী সম্পর্কে অবগত নাও হতে পারেন। হয়তবা এই ধরনের সমস্যা সম্পর্কে গভীরভাবে তিনি চিন্তা করেন নি। বাস্তব পরিস্থিতির সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তিই তার প্রতিক্রিয়া বা অভিমত সম্পর্কে সজাগ থাকেন না। আচার আচরণ থেকেও সঠিক মনোভাব যাচাই করা যায় না। মনোভাব নির্ধারণের সুনিশ্চিত কোন পদ্ধতি না থাকলেও অনেক সময় প্রকৃত মনোভাবের অতি কাছে পৌঁছান সম্ভবপর হয়।

এইসব দোষত্রুটির কথা চিন্তা ভাবনা করে সমাজতত্ত্ববিদ এবং মনোবিদগণ মনোভাব নির্ধারণের কয়েকটি পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। যেমন,—

১. প্রত্যক্ষ প্রশ্নের মাধ্যমে ব্যক্তি বিশেষের কোন বিষয় সম্পর্কে অভিমত যাচাই করা। এই উদ্দেশ্যে তালিকা অথবা প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মৌখিক উত্তর সংগ্রহ করেও অভিমত যাচাই করা যায়।

২. যে সকল উক্তির সঙ্গে উত্তরদাতা একমত সেগুলোর নীচে চিহ্নিত করা।

৩. কোন মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ের প্রতি তাঁর সম্মতি অসম্মতির মাত্রা উক্তিমালার মাধ্যমে নির্দেশ করা যায়।

৪. বিশেষ কোন প্রতিফলন কৌশল ব্যবহার করা যার দ্বারা উত্তরদাতার অজ্ঞাতেই তাঁর প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ পায়।

মনোভাব নির্ধারণের পদ্ধতিগুলোর মধ্যে নিম্নের দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং এদের প্রচলনও অত্যন্ত ব্যাপক। যেমন,—

১. থার্স্টোন পদ্ধতি
২. লিকার্ট মনোভাব মানক বা পদ্ধতি

১. থার্স্টোন পদ্ধতি ঃ

মনোবিজ্ঞানী থার্স্টোন মনোভাব পরিমাপের জন্য যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন তাকে থার্স্টোন পদ্ধতি বা মানক বলা হয়। মনোভাব মানক প্রণয়ন খুবই জটিল। এই পদ্ধতির প্রশ্নপত্রে কোন দল, প্রতিষ্ঠান, ভাবধারা বা রীতিনীতি সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করে কুড়ি অথবা ততোধিক উক্তি থাকে। এই প্রশ্নমালা পঞ্চাশ জন বা এর বেশী বিচারকের কাছে উপস্থাপন করা হয়। তাঁরা এগুলোকে মানের ক্রম অনুসারে ১ থেকে ১১টি দলে বিভক্ত করে থাকেন। এইভাবে প্রতিটি উক্তির একটি যৌগিক ক্রম বের করা হয়। বিশেষ কোন উক্তির যৌগিকক্রম নিয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে সেটা বর্জন করা হয়। গ্রহণযোগ্য প্রতিটি উক্তির জন্য মধ্যক স্কেল মাপ (Median scale value) ধার্য করা হয়। তারপর যে সকল উক্তির সঙ্গে তাঁরা একমত সেগুলো চিহ্নিত করার জন্য প্রশ্নমালাটি উত্তরদাতার নিকট প্রেরিত হয়। প্রকৃত মনোভাব এই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়।

মূলতঃ উত্তরদাতা যে মনোভাব বাহ্যিকভাবে প্রকাশ করেন তা থেকে প্রকৃত মনোভাব নির্ধারণ করা ত্রুটিপূর্ণ। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে যে অনেক সময় ব্যক্তি তার প্রকৃত মনোভাব গোপন রেখে সমাজে গ্রহণযোগ্য অভিমত ব্যক্ত করে থাকে। আবার এমনও দেখা যায় কোন ব্যক্তি সামাজিক কোন সমস্যা সম্পর্কে তার নিজস্ব অভিমত কি সে সম্পর্কে সচেতন নন। হয়ত তিনি সমস্যা সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা করেন নি। আবার কখনও কখনও বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন না হলে কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া বা অভিমত বুঝা যায়।

২. লিকার্ট মনোভাব মানক বা পদ্ধতি ঃ

মতামত নিরূপনের দ্বিতীয় পদ্ধতি হল "লিকার্ট সামেটেড রেটিংস" পদ্ধতি যাতে প্যানেলকৃত বিচারক মন্ডলী ছাড়াও থার্স্টোন পদ্ধতির ফল লাভ করা সম্ভব। এই দুই পদ্ধতির মধ্যে সহগতির

Dhaka University Institutional Repository

সহজাংক প্রায় + ৯২ পাওয়া গেছে। এই পদ্ধতিটি শিক্ষার্থীদের জন্য অতি সম্ভাবনাময়, কারণ এটি সহজে এবং অপেক্ষাকৃত কম সময়ে প্রস্তুত করা যায়।

লিকার্ট পদ্ধতির প্রথম পদক্ষেপ হল বিভিন্ন মতামত যুক্ত কতগুলো উক্তি সংকলন করা। উক্তিগুলোর সত্যতা অপরিহার্য নয়। যদি এগুলো বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তির মতামত প্রকাশ করে তাহলে ব্যবহার করা যেতে পারে। কোন একটি সুনির্দিষ্ট মতামতে যদি নির্দিষ্ট পক্ষ বিপক্ষ থাকে তবে এটা সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। পক্ষ ও বিপক্ষ মতামতের সংখ্যা প্রায় কাছাকাছি থাকা বাঞ্ছনীয়। বিবরণী বা উক্তিগুলো সংকলনের পর প্রাথমিক ভাবে যাচাইয়ের জন্য কতিপয় ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে যে সকল উক্তি সমগ্র প্রশ্নমালার সাথে উচ্চ সহগতি সম্পন্ন সেই উক্তিগুলোই গৃহীত হয়। আন্তঃসহগতির এই নির্বাচন সন্দেহজনক উক্তি বা বিবরণীকে বর্জন করতে সহায়তা করে।

একটি একক প্রশ্ন বিশিষ্ট মতামত সংগ্রহকারী পত্রের উদাহরণ দেওয়া গেল।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রতি মনোভাব নির্ধারণ স্কেল।

(নীচের উক্তিগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কে যথাস্থানে টিক চিহ্ন দিয়ে আপনার সুনিশ্চিত মতামত ব্যক্ত করুন)।

ক, এই উক্তিটির সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত
খ, এই উক্তিটির সাথে আমি একমত
গ, এই উক্তিটি সম্পর্কে আমি নিরপেক্ষ
ঘ, এই উক্তিটির সাথে আমি একমত নই
ঙ, এই উক্তিটির সাথে মোটেই একমত নই

	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
১.					
২.					

১. মানব জাতির শিক্ষার ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানা না থাকলে উপযুক্ত শিক্ষক হওয়া যায় না এবং শিক্ষাদান কার্যে জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত হয় না। সুতরাং প্রশিক্ষণে শিক্ষার অতীত ও বর্তমান ইতিহাসের একটি বিশেষ স্থান থাকা দরকার।

২. শিক্ষকতা আনন্দদায়ক নয় বলে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি শিক্ষকতা পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে আগ্রহী হন না।

৩. শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রচলিত সময়সীমা আরও দীর্ঘ হওয়া উচিত।

৪. শিক্ষার বিষয় বস্তু বাস্তব জীবনের সাথে সংগতি রেখে নির্বাচন করা উচিত।

৫. শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকের বেশী মেলামেশা করা উচিত নয়, কারণ এতে শিক্ষকের মর্যাদার হানি হয়।

	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
১.					
২.					
৩.					
৪.					
৫.					

চিত্র—১১

মূলতঃ এই কৌশলটির সাহায্যে বিতর্কমূলক বিষয় সম্পর্কে মতামতের পরিমাণ নির্ধারণ করা যেতে পারে। বিভিন্ন উপায়ে এই ধরনের স্কেলের বিশ্লেষণ করা যায়। প্রত্যেকটি উক্তির উত্তরের শতকরা হারের সাহায্যে মতামতের পরিমাণ নির্ণয় করা না গেলেও একে সহজভাবে বর্ণনা করা যায়। যেমন, চারজন শিক্ষকের মধ্যে তিনজন এই উক্তিটি সমর্থন করেন অর্থাৎ শতকরা ৮০ জন শিক্ষক এই উক্তিটির সাথে একমত পোষণ করেন।

প্রকৃতপক্ষে লিকার্ট স্কেলের প্রতিটি উক্তির জন্য এক একটি মানক মূল্য নির্ণয় করা হয়ে থাকে। অনুকূল অভিমতের জন্য স্কেলের এক প্রান্ত থেকে আরম্ভ করে নিম্নোক্ত মানক মূল্য ধার্য করা হয়।

মূল্যায়নের মাপকাঠি

ক, সম্পূর্ণ একমত——৫
খ, একমত ——৪
গ, নিরপেক্ষ ——৩
ঘ, একমত নই ——২
ঙ, মোটেই একমত নই——১

প্রতিকূল অভিমতের জন্য উক্তিগুলোর নিম্নোক্ত মানক মূল্য ধার্য করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

ক, সম্পূর্ণ একমত ——১
খ, একমত ——২
গ, নিরপেক্ষ ——৩
ঘ, একমত নই ——৪
ঙ, মোটেই একমত নই—৫

প্রদত্ত কোন একটি বিষয়ে সকল উক্তি থেকে প্রাপ্ত স্কোর সমষ্টি দ্বারা উত্তরদাতার অনুকূলে তাঁর মনোভাবের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। যদি কোন প্রশ্নমালায় সর্বমোট দশটি উক্তি থাকে তাহলে নিম্নোক্ত স্কোর মান(Score value) দ্বারা মনোভাবের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা যায়।

৩০×৫=১৫০ অনুকূলে মনোভাবের সর্বোচ্চ পরিমাণ।
৩০×৩=৯০ নিরপেক্ষ মনোভাব
৩০×১=৩০ প্রতিকূলে মনোভাবের সর্বোচ্চ পরিমাণ।

কোন উত্তরদাতার স্কোর সমষ্টি ৩০ থেকে ১৫০ এর মধ্যে থাকবে। অনুকূলে মনোভাবের জন্য স্কোর সমষ্টি ৯০ এর অধিক হতে হবে। প্রতিকূলে মনোভাবের জন্য স্কোর সমষ্টি ৯০ এর কম হতে হবে।

পর্যবেক্ষণ

তথ্য সংগ্রাহক উপকরণ হিসাবে পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্ণনামূলক গবেষণায় এর বিশেষ অবদান রয়েছে। মূলতঃ পর্যবেক্ষণ সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তি। একে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের একটি প্রধান সোপানও বলা যেতে পারে। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি যখন কোন গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে সুশৃংখল ভাবে ও সুপরিকল্পিত ভাবে ব্যবহৃত হয়, এর দ্বারা সংগৃহীত তথ্য যখন সুষ্ঠভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়, এবং তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও সঠিকতা নির্ধারণের জন্য যখন তাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তখনই পর্যবেক্ষণকে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা যায়। এই উদ্দেশ্যে কোন বিশেষ বস্তু বা বিষয় গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পর্যবেক্ষণ

পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ এই দুই প্রকারে করা যায়। কোন কোন তথ্য প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ধারাবাহিক ভাবে, সুপরিকল্পিত ভাবে এবং সুশৃংখলভাবে সংগ্রহ করা যায়। যেমন,—কোন বাস্তব বিষয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হলে তা সহজসাধ্য হয়। অনেক সময় গণনা এবং পরিমাপের সাহায্যে বাস্তব বিষয় থেকে সহজে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। কোন একটি স্কুল দালানের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করতে হলে দালানটি কি দিয়ে তৈরী করা হয়েছে, কয়টি কামরা, কামরাগুলোর আকৃতি কি ধরনের এবং দালানে সংরক্ষিত আসবাব পত্রের সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্য কি ইত্যাদি প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সহজে সংগ্রহ করা সম্ভবপর। প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ সাধারণতঃ গণনা ও পরিমাপের সাহায্যেই করা হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষের আচার-আচরণ থেকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন। মানুষের আচরণ জটিল ও পরিবর্তনশীল। প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের সাহায্যে মানুষের আচার আচরণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর না হলে অনেক সময় পরোক্ষ ভাবে সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়। সম্প্রতি এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। যেমন, থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার, লাইট মিটার, স্টপ ওয়াচ, টেপরেকর্ডার, চলচ্চিত্রের ক্যামেরা, ক্যাসেট, বাইনোকুলার, ফটোগ্রাফী, অডিওমিটার ইত্যাদির প্রচলন অত্যধিক।

পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদির নির্ভুল লিপিবদ্ধ করণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। যেমন,

১. তালিকা পরীক্ষা হ্যাঁ, না,

এটি একটি সহজ পদ্ধতি। অনেকগুলো পূর্ব-নির্ধারিত পদ বা উক্তির সমন্বয়ে এই তালিকা প্রস্তুত করা হয়। তালিকায় কোন একটি বিশেষ উক্তি উল্লেখিত বা অনুল্লেখিত রয়েছে তা 'হ্যাঁ' বা 'না' সূচক শব্দের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এই তালিকায় কোন একটি বিষয়ের বৈশিষ্ট্য সমূহের বিবরণ দেওয়া থাকে। অনেক সময় গ্রাহকদের সুবিধার্থে একটি বাড়ী বা গাড়ী বিক্রয় করার জন্য এই ধরনের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। গ্রাহকরা এই তালিকায় উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। কোন সংখ্যা বা শব্দের সাহায্যে উক্তি সংযোজন

Dhaka University Institutional Repository

করা যায়।

২. স্কোর কার্ড—বিস্তৃত এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, বই বা কামরার সংখ্যা।

৩. 'স্কেল্ড স্পেসিমেন'—অর্থাৎ ডাইকের হাতের লেখা বা অন্য হাতের লেখা পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৪. রেটিং স্কেল—কোন ব্যক্তি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণের ফলাফলকে সুসংহত ভাবে প্রকাশ করা হয়। সাধারণতঃ ব্যক্তির যে কোন একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে বিভিন্ন মাত্রার সাহায্যে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এটাই হল স্কেল। এই স্কেল পর্যবেক্ষণ করে স্কেলে ব্যক্তির অবস্থান নির্ণয় করা যায়। যেমন. অধিকতর শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, মোটামুটি শ্রেষ্ঠ, মোটেই শ্রেষ্ঠ নয়, নিকৃষ্ট ইত্যাদি মাত্রানুযায়ী কোন ব্যক্তির গুণাবলীর পাঁচ মাত্রা স্কেল প্রস্তুত করা যায়। এই স্কেল তিন মাত্রা বা সাত মাত্রারও হতে পারে। রেটিং স্কেলের সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যাদি নির্ভরযোগ্য করার উদ্দেশ্যে মাত্র একজন পর্যবেক্ষকের রেটিং এর উপর নির্ভর না করে একের অধিক পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারে এবং তা গড়ে ৮ জন হলে লব্ধ ফলাফলকে নির্ভর যোগ্য বলা যেতে পারে

৫. দলিল বিশ্লেষণ—ধারাবাহিক ভাবে দলিল পত্রের বিশ্লেষণ করে তথ্য সংগ্রহ করা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ।

৬. তালিকা প্রস্তুত করণ—পর্যবেক্ষিত তথ্যাদি থেকে অপ্রয়োজনীয় এবং অপ্রাসঙ্গিক তথ্য বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্য ধারাবাহিক ভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্য সংগৃহীত তথ্যের একটি অনুসূচী বা তালিকা প্রস্তুত করা আবশ্যক।

৭. চিত্র গ্রহণ ও মানচিত্র প্রস্তুত করণ—সংগৃহীত তথ্যাদি বর্ণনা করার সময় প্রয়োজন অনুসারে বর্ণিত বিষয়ের চিত্র দেওয়া যেতে পারে। চিত্রের মাধ্যমে বর্ণিত বিষয় অধিকতর গ্রহণযোগ্য, প্রাণবন্ত এবং সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোন একটি বিশেষ দল বা এলাকা থেকে পর্যবেক্ষণের সাহায্যে তথ্য সংগৃহীত হলে সে এলাকা বা সে বিশেষ দলটির অবস্থানের একটি ভৌগলিক বা প্রাকৃতিক মানচিত্র ব্যবহার করা যেতে পারে, যার সাহায্যে এলাকা বা দলটি সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার এবং সুস্পষ্ট হয়।

এছাড়া নির্ভুল লিপিবদ্ধকরণের জন্য গবেষকের পর্যবেক্ষণের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি সজাগ থাকা প্রয়োজন। যেমন,—

১. পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত ধারাবাহিক ও সুনির্ধারিত।

২. সংগৃহীত তথ্যাদি যতদূর সম্ভব পরিমাণগত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩. কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্র থেকে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে গবেষণা করা যুক্তি সঙ্গত। ক্ষেত্র বিস্তৃত হলে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না। কারণ এই উপায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন।

৪. পর্যবেক্ষণের পর পরই তথ্যাদির রেকর্ড করা বা নোট গ্রহণ করা সমীচীন। স্মরণ শক্তির উপর নির্ভর না করে যতদূর সম্ভব বিস্তারিত ভাবে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। সময়ের ব্যবধানে তথ্যাদির নির্ভরযোগ্যতা ও নির্ভুলতা ক্ষুন্ন হতে পারে।

গবেষণার তথ্য সংগ্রহকারী উপকরণ হিসেবে বিভিন্ন প্রকারের পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন,—

১. সংগঠিত পর্যবেক্ষন
২. অসংগঠিত পর্যবেক্ষণ
৩. নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ
৪. অনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ

১. সংগঠিত পর্যবেক্ষণ ঃ

এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য গবেষণার পূর্বেই একটি সুষ্ঠ ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার প্রয়োজন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী গবেষক সুশৃংখল ভাবে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং গবেষণার উদ্দেশ্য, ক্ষেত্র, পরিধি ও আবশ্যকীয় তথ্যাদি সম্পর্কে অত্যধিক সচেতন থাকেন। এই পর্যবেক্ষণকে বিশেষ কোন ঘটনা, বিষয় বা আচার আচরণের মধ্যে সীমিত রাখা হয়। কার্য-কারণ সম্পর্কিত অনুমান যাচাই বা বর্ণনা করার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২—অসংগঠিত পর্যবেক্ষণ ঃ

এতে সরাসরি অংশ গ্রহণ করে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়। মূলতঃ গবেষক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে থাকেন। এটি সংগঠিত পর্যবেক্ষনের মতো ধারাবাহিক বা সুশৃংখল নয়। সাধারণতঃ কোন দল, জাতি, উপজাতি বা সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, আচার আচরণ, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য এই প্রক্রিয়ায় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে গবেষককে এই শ্রেণীর লোকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে মেলামেশা করতে হয় ও তাদের সঙ্গে কিছুকাল অবস্থান করতে হয়। এ জাতীয় পর্যবেক্ষণ সীমিত আকারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। বিস্তৃত এলাকায় এর প্রয়োগ সম্ভবপর নয়।

৩· নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ ঃ

এই পদ্ধতিতে একটি নিয়ন্ত্রিত, কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় এবং মানুষ এই পরিবেশে কি প্রকার আচরণ করে থাকে তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রনাধীনে রাখা হয় না। নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ শিশুদের ব্যবহার পর্যবেক্ষণের জন্য অধিক প্রযোজ্য। পরীক্ষণ পদ্ধতির পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী এ ধরনের পর্যবেক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

৪· অনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ ঃ

স্বাভাবিক পরিবেশে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এতে কোন প্রকার নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয় না। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় প্রকারেই অনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ করা যায়।

পর্যবেক্ষণের সুবিধা—

১· সকল স্তরের ব্যক্তির বিশেষতঃ শিশুদের আচার আচরণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়।

২· পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গবেষক যদি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে তথ্য সংগ্রহ করেন তাহলে সংগৃহীত তথ্যাদি নির্ভরযোগ্য ও সঠিক হয়ে থাকে।

৩· শিক্ষা গবেষণায় এর গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদির সুষ্ঠ বিশ্লেষণ করে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের গুণগত ও পরিমাণগত দিক উদ্ঘাটন করা যায়। নানাবিধ দোষত্রুটি নিরীক্ষণ করে সেগুলো দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪· ক্ষেত্র বিশেষে কম খরচে ও কম সময়ে পরিচালনা করা যায়।

পর্যবেক্ষণের অসুবিধা—

১· কখনও কখনও প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকারের তুলনায় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। বিশেষতঃ নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে, যখন পরিমেয় তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার আধুনিক পরিমাপক যন্ত্রপাতি যেমন, গতিবিধি লিপিবদ্ধ কারক যন্ত্র, ফিল্ম, শব্দ ধারক যন্ত্র, ক্যাসেট, ক্যামেরা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

২. ঘটনার স্থায়িত্বের উপর গবেষককে অত্যধিক নির্ভরশীল হতে হয়। ফলে স্বল্পকালস্থায়ী ঘটনা সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা সহজ সাধ্য নয়।

৩. এই পদ্ধতি সকল প্রকার গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না।

৪. সরাসরি পর্যবেক্ষণ অনেক সময় বাধাগ্রস্থ হয় এবং পূর্ণ সহযোগিতার অভাবে সংগৃহীত তথ্যাদি নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে।

সাক্ষাৎকার

ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ করে মৌখিক প্রশ্নমালার সাহায্যে তার আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করাকে সাক্ষাৎকার বলা হয়। শিক্ষা গবেষণার আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ করার এটি একটি পদ্ধতি। এক বা একের অধিক উত্তরদাতার কাছ থেকে সরাসরি উত্তর সংগ্রহ করার একটি নির্ভরযোগ্য এবং যথার্থ পদ্ধতি বলেও সাক্ষাৎকারকে গণ্য করা যায়। যেকোন প্রকার সামনা সামনি কথোপকথনকে একপ্রকার সাক্ষাৎকার বলা যেতে পারে। গবেষণায় সাক্ষাৎকার কেবলমাত্র কথা বলার চাইতেও অধিক। এখানে সাক্ষাৎকার বলতে উদ্দেশ্যমূলক আলাপ-আলোচনা বুঝায়। প্রয়োজনীয়

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গবেষক সাক্ষাৎকারীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে থাকেন। এক বা ততোধিক উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করার জন্য সাক্ষাৎকার একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। সংগৃহীত তথ্যাদির দ্বারা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি, আশা-আকাংখা, আচার-আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা লাভ করা যায়।

অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ-সমূহে তথ্যানুসন্ধানের জন্য সাক্ষাৎকারকে একটি উপযুক্ত পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা হয়। এই সকল দেশে শিক্ষিত মানুষের হার এত কম যে তথ্য সংগ্রহের অন্যান্য পদ্ধতির চাইতে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সমস্যাবলী সমাধানের জন্য প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করা সহজ হয়। পারদর্শী ব্যক্তির দ্বারা সাক্ষাৎকার গৃহীত হলে তাকে একটি উন্নতমানের পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা যায়। মানুষ লেখার চাইতে কথা বলতে বেশী ভালবাসে কাজেই কথাবার্তার মাধ্যমে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর।

তথ্য সংগ্রহে সাক্ষাৎকারীর ভূমিকা—

কথোপকথনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হয়। কেবল মাত্র পর্যবেক্ষণ এবং উত্তর সমূহ সংগ্রহ করাই যথেষ্ট নয়, উত্তরদাতার সহযোগিতাও একান্তভাবে প্রয়োজন। সংগঠিত বা আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার পদ্ধতির জন্য সাক্ষাৎ গ্রহণকারীর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক প্রশ্ন করার কলা কৌশল সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এবিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হলে আরও ভাল হয়। অসংগঠিত বা অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারের জন্য অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়। এজন্য সাক্ষাৎ গ্রহণকারীর ধৈর্য থাকা দরকার এবং কি প্রকারে উত্তররাতার প্রেরণা জাগাতে হয় সে বিষয়েও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কথোপকথনের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করতে নানা প্রকার ভুল ভ্রান্তি দেখা দেয়। এজন্য নিম্নলিখিত বিষয়ে সাক্ষাৎ গ্রহণ কারীকে অত্যধিক সচেতন থাকতে হয়।

১. প্রশ্ন করায় ভুল ভ্রান্তি—

প্রশ্ন করার সময় উদ্দেশ্যের প্রতি নজর না রেখে প্রশ্ন করলে

সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না এবং ভুল ভ্রান্তি দেখা দেয়। প্রশ্নের ধরনের উপর উত্তর কমবেশী নির্ভরশীল। প্রশ্ন নানা প্রকারে করা যেতে পারে। যেমন, সীমিত উত্তর প্রশ্ন, যেখানে প্রশ্নকারী পূর্বেই উত্তরদাতার উত্তর সীমিত করে দেয়। অপরদিকে, ইচ্ছা অনুযায়ী উত্তরদান সাক্ষাৎকার পদ্ধতির ক্ষেত্রে উত্তরদাতা নিজেই তার জবাবের সীমা নির্ধারণ করে থাকে। সাধারণতঃ এই ক্ষেত্রে জবাব একটু বড় ধরনের হয়। আত্মরক্ষার্থে উত্তরদান সাক্ষাৎকার পদ্ধতির জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং উত্তরদাতার সমস্যা সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তিকে বুঝায়।

২. বুঝানোর ভুল ভ্রান্তি—

এই ধরনের ভুল সচরাচর হয় যখন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী পূর্বেই অনুধাবন করেন কি ধরনের উত্তর পাওয়া যাবে, উত্তর প্রদানকারীকে উত্তরদানের জন্য প্রয়োজনীয় সময় দেওয়া হয় না এবং অশুদ্ধ উত্তর সম্পর্কে উত্তরদাতাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় না। এ সকল ভুল ভ্রান্তি এড়ানোর জন্য সাক্ষাৎগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া দরকার।

৩. প্রেরণার ভুল ভ্রান্তি—

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী যদি উত্তরদাতাকে তার সাধ্যমত এবং ক্ষমতা অনুযায়ী সঠিক উত্তরদানের জন্য অনুপ্রাণিত করতে না পারেন এবং প্রেরণা জোগাতে না পারেন তাহলে দেখা যায় উত্তরদাতা সহযোগিতা করছে না। অনেক গবেষণা পরিকল্পনার তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য উত্তরদাতাকে দুই বা ততোধিক বার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার নির্দেশ দান করা থাকে। যদি উত্তরদাতার কাছে প্রথমবারই একঘেয়ে ও অর্থহীন মনে হয় বা প্রশ্নকারীর সঙ্গে একমত না হয় তাহলে তারা দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকারে অংশ গ্রহণ নাও করতে পারে।

৪. লিপিবদ্ধকরণে ভুল ভ্রান্তি—

সংগৃহীত তথ্য ঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা না হলে, কোন তথ্য বাদ পড়ে গেলে বা কোন তথ্য ভুল বিশ্লেষিত হলে এধরনের ভুল ভ্রান্তি দেখা দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকার গ্রহণের বেশ কিছু সময়ের পর তথ্যকে লিপিবদ্ধ করা হলে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ স্মরণশক্তি থেকে উত্তর সমূহ লিপিবদ্ধ করা সহজ সাধ্য নয়। সাক্ষাৎকারের জন্য 'মাইক্রোফোন' ব্যবহৃত হলে তা উত্তরদাতার উপর কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তাও সঠিক ভাবে বলা যায় না। অনেক সময় দেখা গেছে উত্তরদাতাকে বিভ্রান্ত করে দেয়।

অসংগঠিত বা অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারের জন্য টেপরেকর্ডিং প্রয়োজনীয়, তবে সাক্ষাৎকার যতই সংগঠিত এবং আনুষ্ঠানিক হতে থাকে রেকর্ডিং ততই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তথ্য লিপিবদ্ধ করনের ভুল ভ্রান্তি এড়ানোর উপায় হচ্ছে সাক্ষাৎকারের সময় ছোট ছোট নোট আকারে সংগৃহীত তথ্যকে লিপিবদ্ধ করা।

মূলতঃ সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নিজস্ব প্রভাব বর্জিত করার চেষ্টা করা, প্রশ্নগুলোর প্রকৃতি সুনির্দিষ্ট করা এবং প্রশ্ন করার পদ্ধতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করার মাধ্যমে সাক্ষাৎকার পদ্ধতিকে একটি উন্নত মানের তথ্য সংগ্রাহক পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা যায়।

সাক্ষাৎকারের সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা—

১. সাক্ষাৎকার একটি অধিকতর পরিবর্তনশীল ও নমনীয় অনুসন্ধান পদ্ধতি। অনুসন্ধানকারী প্রয়োজন অনুসারে প্রশ্নের পদ্ধতি, সংখ্যা, সময়, পরিকল্পনা ইত্যাদি পরিবর্তন করতে পারেন।

২. অনুমিত সিদ্ধান্ত প্রমাণ করার জন্য যদি কখনও কোন নিরক্ষর ব্যক্তি বা কোন ছোট ছেলে মেয়ের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয় তাহলে সাক্ষাৎ পদ্ধতিকে অধিকতর উপযুক্ত বলে মনে করা যেতে পারে।

৩. এই পদ্ধতিতে অনুসন্ধানকারী উত্তরদাতার উত্তর এবং উত্তরদানের পদ্ধতি এই উভয় বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করে থাকেন।

৪. ব্যক্তিগত মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস,—এই পর্যায়ের তথ্যাদি সংগ্রহ করার জন্য এর যথেষ্ট কার্যকারিতা রয়েছে।

৫. সাক্ষাৎকার প্রেরণা জোগায়। সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে

উত্তরদাতার মনে স্পষ্ট ধারণা জন্মালে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই তিনি খোলাখুলি ও পরিস্কার উত্তর দান করে থাকেন।

৬. সাক্ষাৎকারের বিভিন্ন কলা কৌশল সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর আয়ত্বাধীনে থাকলে এই পদ্ধতি অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয় এবং অনেক সময় সুপ্ত তথ্যাদিরও সন্ধান পাওয়া যায়।

৭. উত্তরদাতা প্রশ্নাবলীর যথার্থ উত্তর দিতে প্রস্তুত আছেন কিনা, সে বিষয়ে সাক্ষাৎ গ্রহণকারীকে সচেতন থাকতে হবে। উত্তরদাতার সময়, শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ইত্যাদি যাচাই করে তথ্য সংগৃহীত হলে, নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর।

৮. সাক্ষাৎকারের প্রশ্নাবলী সুচিন্তিত এবং সুসংগঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এজন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর গবেষণার বিষয়ে বিশেষতঃ প্রশ্নকরণের নিয়মাবলী, প্রশ্নের ব্যাখ্যা, গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সাক্ষাৎ গ্রহণকারীর মাধ্যমে সাক্ষাৎকার পরিচালিত হলে সাক্ষাৎকারের অসুবিধাসমূহ দূর করা সহজ হয় এবং অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় এর প্রয়োগ বেশী হতে পারে।

অসুবিধা—

১. সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর ব্যক্তিগত প্রভাব সাক্ষাৎকারের ফলাফলকে প্রচুর পরিমাণে প্রভাবিত করে এবং পরিমাপকের নিজস্ব প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া পক্ষপাতিত্বেরও সম্ভাবনা থাকে।

২. তথ্য সংগ্রহকারী অন্যান্য উপকরণের মতো সাক্ষাৎকার একটি মূল্যায়ণ নির্ণায়ক। সাক্ষাৎকারের নমনীয়তার যেমন সুবিধা রয়েছে তেমনি অসংগঠিত সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে এর অসুবিধাও বিদ্যমান। কোন কোন অসংগঠিত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদির সংক্ষিপ্তকরণ, মূল্যায়ণ, শ্রেণীবিভাগ এবং বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়।

৩. অনেক সময় উত্তরদাতা লজ্জা এবং সংকোচের জন্য তার নিজের সমস্যা খোলাখুলি ভাবে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে দ্বিধা এবং সংকোচ বোধ করেন। যার জন্য সঠিক উত্তর না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার উত্তর প্রদানকারীর উত্তরগুলো সত্য বা মিথ্যা হওয়া সম্পূর্ণরূপে সাক্ষাৎ গ্রহণকারীর উপর নির্ভর করে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে একজন দক্ষ এবং পারদর্শী ব্যক্তি হতে হয় যা প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করা যায় বটে, কিন্তু এটা মোটেই সহজ সাধ্য নয়।

৫. অনেক সময় গবেষক সঠিক তথ্য সংগ্রহকারী পদ্ধতি ব্যবহার না করে অল্প সময়ে তথ্য সংগ্রহ করার লক্ষ্যে সাক্ষাৎকার ব্যবহার করে থাকেন। যেমন, একজন অনুসন্ধানকারীর কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর শিক্ষার্থীর প্রত্যেকে একটি বিশেষ সময়ে লাইব্রেরী থেকে কয়টি পুস্তক পড়েছে জানা দরকার। এক্ষেত্রে তিনি শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করে তথ্য অনুসন্ধান করতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে লাইব্রেরীতে যদি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নামে কোন রেকর্ড থাকে তাহলে সেটা ব্যবহার করাই প্রয়োজন। অধিক পরিশ্রমের পরিবর্তে এবং সময় বাঁচানোর উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎকারের প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নয়।

৭. সমাজমিতিমূলক পদ্ধতি (Sociometric Method)

সামাজিক সংগঠনের রূপ এবং সমাজে ব্যক্তি বিশেষের স্থান নিরূপনের জন্য নানা পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এরমধ্যে সমাজমিতিমূলক পদ্ধতি অন্যতম। জীবন ধারণের প্রচেষ্টা এবং পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে সামাজিক শক্তিগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি দলের এক ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্ক, এক ব্যক্তির প্রতি অন্য ব্যক্তির আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, দলের ব্যক্তিত্ব (Syntality) এবং ব্যক্তির প্রতি — সমাজমিতি মূলক পদ্ধতির সাহায্যে জানা যায়। একটি দলের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিরাজমান সামাজিক সম্পর্ক একটি চিত্রের মাধ্যমে দেখানো যায়। এই চিত্রটি 'সোসিওগ্রাম' নামে পরিচিত। সমাজবিজ্ঞানী জে. এল. মোরেনো (J. L. Moreno) এই পদ্ধতির প্রবর্তক।

স্কুলের কোন বিশেষ শ্রেণীর 'সোসিওগ্রাম' তৈরী করতে হলে কোন একটি বিশেষ কাজের জন্য ক্লাসের প্রত্যেকটি ছাত্রকে তার পছন্দমত সঙ্গী বেছে নিতে বলা হল। তাদের পছন্দের উপর ভিত্তি করে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি চিত্ররূপ দেওয়া যেতে পারে। চিত্রটি নিম্নরূপ—

চিত্র—১২
সোসিওগ্রামের একটি রূপ

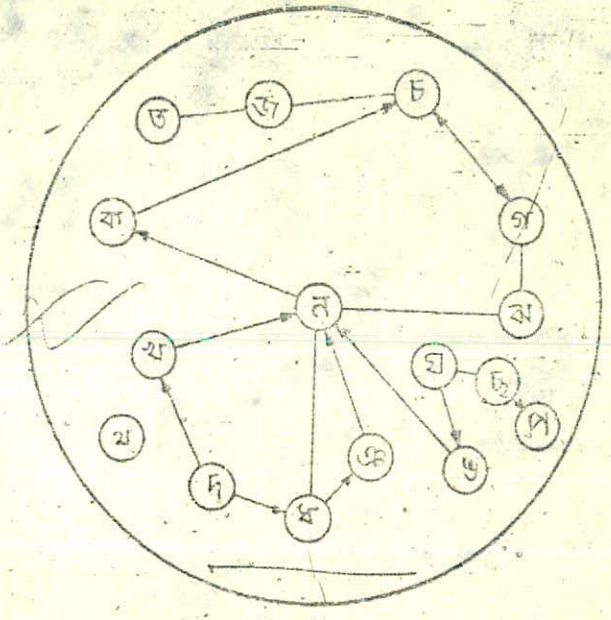

— সরলরেখা ও তীরের সাহায্যে ছাত্রদের পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝায়। এই চিত্র থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে—তীর দিয়ে দু'টি ছাত্রের মধ্যে যুক্ত থাকলে, যে ছাত্রটির প্রতি তীরটি উদ্দিষ্ট তাকে অন্য ছাত্রটি পছন্দ করে, কিন্তু সেই ছাত্রটিকে এই ছাত্রটি পছন্দ করে না। যেমন, সোসিওগ্রামটিতে দেখা যায়, 'ক', 'চ' কে পছন্দ করে, কিন্তু 'চ' 'ক' কে পছন্দ করে না। আবার একটি সরলরেখা দ্বারা দু'টি ছাত্রের নাম সংযুক্ত থাকলে এই বোঝাবে যে, ছাত্র দু'জনই পরস্পর পরস্পরকে পছন্দ করে। যেমন, 'জ' 'ত' কে পছন্দ করে এবং 'ত' 'জ' কে পছন্দ করে। 'ন' কে অনেক ছাত্ররাই পছন্দ করে, কাজেই সে হল জনপ্রিয় আর 'থ' কে কেউ পছন্দ করে না, কাজেই সে হল পরিত্যক্ত ছাত্র।

শিক্ষা গবেষণায় 'সোসিও গ্রাম' অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এর সাহায্যে প্রচুর গুরুত্ব পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

৪. মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা (Psychological Test)

মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা হল ব্যক্তির আচরণের নৈর্ব্যক্তিক ও আদর্শায়িত পরিমাপ বিশেষ। ব্যক্তির আচরণ মানসিক ও দৈহিক কাজের মিশ্রণ। সকল প্রকার অভীক্ষার সাহায্যে ব্যক্তির আচার আচরণ পরিমাপ করা হয়। এই পরিমাপ থেকে তার মানসিক অবস্থা এবং এই অবস্থার মাত্রাও জানা যায়। শিক্ষাশ্রয়ী সকল অভীক্ষাই মনোবিজ্ঞান সম্মত, কারণ শিক্ষা মানুষের মনোবৃত্তির পরিবর্তন সাধন করে।

মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলী—

মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষাগুলো এক শ্রেণীর পরিমাপক যন্ত্র। এগুলোর সাহায্যে ব্যক্তির আচার আচরণ পরিমাপ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পদার্থ বিজ্ঞানের ন্যায় সুষ্ঠু, সুনির্দিষ্ট ও সঠিক ধরনের পরিমাপক যন্ত্র শিক্ষা গবেষণার ক্ষেত্রে নেই। শিক্ষা গবেষণায় মানুষের আচরণ পরিমাপ করা হয়। মানুষের আচরণ জটিল এবং বৈচিত্রপূর্ণ। যার জন্যে পরিমাপক যন্ত্রগুলোও জটিল। অতীতে মানুষের আচরণ পরিমাপ করার জন্য যে সকল পরিমাপক যন্ত্র প্রবর্তন হত সেগুলোর মধ্যে সব অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলী বিদ্যমান ছিল না। সেগুলো ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং ফলাফল নির্ভরযোগ্য ছিল না। আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষায় বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান থাকার জন্য এগুলোকে নির্ভরযোগ্য পরিমাপক যন্ত্র বলা যায়।

মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার প্রকারভেদ :

মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার প্রকার ভেদ বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন ভাবে করে থাকেন। মোটামুটি ভাবে এই সকল অভীক্ষা নিম্নরূপঃ—

১. বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence Test)
২. কৃতিত্বের বা সফলতার অভীক্ষা (Achievement Test)
৩. দক্ষতা বা প্রবণতার অভীক্ষা (Aptitude Test)

৪. ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তি সত্তার অভীক্ষা (Personality Test)
৫. আগ্রহের অভীক্ষা (Interest Test)
৬. মনোভাবের অভীক্ষা (Attitude Test)

১. বুদ্ধির অভীক্ষা :

মনোবিজ্ঞান সম্মত পরিমাপের ক্ষেত্রে বুদ্ধির অভীক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বুদ্ধির প্রকৃতি নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে নানা মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন বুদ্ধি মানুষের জন্মগত গুণ আবার অনেকের ধারণা শিশু জন্মানোর পর তার পরিবেশ থেকে ধীরে ধীরে সে যে সকল গুণাবলী অর্জন করে সেটাই বুদ্ধি। যে ব্যক্তি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে সুন্দর ভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে তাকেও বুদ্ধিমান বলা হয়।

আলফ্রেড বিনে (Alfred Binet) নামক একজন ফরাসী মনোবৈজ্ঞানিক সর্বপ্রথম বুদ্ধির অভীক্ষা উদ্ভাবন করেন। প্রথমে এবং প্রকৃত পক্ষে অভীক্ষাটি পিছিয়ে পড়া শিশুদের খুঁজে বের করার জন্য তৈরী করা হয়েছিল এবং উপযোগী শিক্ষা দিয়ে তাদের কর্মক্ষম করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়।

পরবর্তী কালে বিনের অভীক্ষাটি অনুকরণ করে টারমেন ও মেরিল প্রতিভাবানদের খুঁজে বের করার জন যে অভীক্ষা তৈরী করেন তার নাম স্ট্যানফোর্ড বিনে স্কেল। বিনে বুদ্ধির স্বরূপ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন যে বুদ্ধি হল একটি সামগ্রিক প্রাকৃতিক শক্তি। এর পরিমাপ করতে হলে কতগুলো বিশেষ প্রকৃতির মানসিক কাজ সম্পাদন করে নয়, বিভিন্ন মানসিক কাজের সমষ্টিগত সম্পাদন প্রয়োজন। অনেক গবেষণার পর বিনে বুদ্ধি পরিমাপের অভীক্ষাটি উদ্ভাবন করলেন। বর্তমানে এর নাম 'বিনে সাইমন স্কেল'। এটি উদ্ভাবনে সাইমন ছিলেন বিনের সহকারী। বিনে—সাইমন স্কেলের অনেকগুলো সংস্করণ হয়েছে। তার মধ্যে আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টারম্যানের সংস্করণটি উল্লেখযোগ্য (১৯১৬)। পরবর্তী কালে (১৯৩৭) অধ্যাপক ম্যারিলের সহায়তায় আর একটি সংস্করণ প্রকাশ করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়। বর্তমানে এই সংস্করণটি 'ষ্ট্যানফোর্ড বিনে স্কেল' নামে বহুল ব্যবহৃত একটি বুদ্ধির অভীক্ষা।

পরবর্তী কালে বিনে-সাইমন-স্কেলের দুইটি অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমটি, বুদ্ধির পরিমাপ সঠিকভাবে করা যায় না আর দ্বিতীয়টি, অত্যন্ত ভাষা নির্ভর। ওয়েকসলার–বেলিভিউ বুদ্ধির স্কেলের (Wechsler-Bellevue-Intelligence Scale) সাহায্যে বিনে সাইমন স্কেলের দু'টি অসুবিধা দূর করার চেষ্টা করা হয়। এই স্কেলের দু'টো দিক আছে। একটি শিশুদের জন্য যার নাম শিশুদের ওয়েকসলার বুদ্ধির স্কেল (WISC Or Wechsler Intelligence Scale for Children), অপরটি বয়স্কদের জন্য যার নাম ওয়েকসলার বয়স্ক বুদ্ধির স্কেল (WAIS Or Wechsler Adult Intelligence Scale).

২. কৃতিত্বের বা সফলতার অভীক্ষা.

এই অভীক্ষার সাহায্যে একজন শিক্ষার্থী কোন একটি বিশেষ বিষয়ে কতটা জ্ঞান অর্জন করল তা পরিমাপ করা হয়। বর্তমানে অর্জিত জ্ঞান ও কৌশলের পরিমাপ করা হয়ে থাকে। কোন একটি বিশেষ বিষয়ের উপর এই অভীক্ষা প্রণয়ন করা যেতে পারে আবার সামগ্রিক ভাবে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয়ের উপরও প্রণয়ন করা যেতে পারে। সফলতা পরিমাপ করার জন্য রচনাধর্মী ও নৈর্ব্যক্তিক উভয় প্রকার অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। স্কুলের বেশীর ভাগ পরীক্ষা মূলতঃ কৃতিত্বের অভীক্ষা।

৩. দক্ষতা বা প্রবণতার অভীক্ষা :

ব্যক্তির মধ্যে বর্তমান কতগুলো বৈশিষ্ট্যের সমষ্টিকে দক্ষতা বলা যায়। এটি এক প্রকারের শক্তি বা সামর্থ্য যার সাহায্যে ব্যক্তি কোন বিশেষ কৌশল বা জ্ঞান অর্জন করতে পারে। উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে এই বৈশিষ্ট্যগুলো বিশেষ কৌশল বা জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে থাকে। দক্ষতার দু'টি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান : যেমন, দক্ষতা এক-প্রকার শক্তি বিশেষ, এবং উপযুক্ত শিক্ষার উপর এটি নির্ভরশীল। কোন এক ব্যক্তির কাঠের কাজে দক্ষতা আছে না চামড়ার কাজে আছে

তা এই অভীক্ষার সাহায্যে নির্ধারণ করা যায়। তবে এই দক্ষতার উৎকর্ষ সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার উপর নির্ভর করে। দক্ষতা থাকলেও শিক্ষা ছাড়া সে দক্ষতা সুষ্ঠভাবে প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়।

মনোবিজ্ঞান সম্মত অভীক্ষাগুলোর সাহায্যে সামগ্রিক ভাবে ব্যক্তির মানসিক শক্তি পরিমাপ করা যায়। মানসিক শক্তির দিক দিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যের ধরন জানা যায়। ঠিক তেমনি দক্ষতার দিক দিয়ে একজন অপর জন থেকে কতটা পৃথক তাও জানা প্রয়োজন। বিভিন্ন বৃত্তিমূলক গুণাবলী পরিমাপের জন্য দক্ষতা বা প্রবণতার অভীক্ষা অত্যধিক প্রয়োজনীয়। এই অভীক্ষাগুলোর দ্বারা সামগ্রিক ভাবে মানসিক শক্তি পরিমাপ না করে সীমিত পরিধির মধ্যে বিশেষ কোন দক্ষতাটি ব্যক্তির মধ্যে বর্তমান কি পরিমাণে বিদ্যমান তা জানা যায়। বৃত্তিমূলক নির্বাচন, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রয়োগ করা হয়। দক্ষতার অভীক্ষার সাহায্যে বিশেষ কোন কাজ, আচরণ, শক্তি বা বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষতা আয়ত্ব করার সামর্থের পরিমাপ করা যায়। দক্ষতাকে প্রকৃতপক্ষে আংশিক সহজাত এবং আংশিক অর্জিত গুণাবলী বলে গণ্য করা যায়। কৌশল বা উৎকর্ষ হল অর্জিত বৈশিষ্ট্য, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফল। সেগুলোর অভীক্ষা প্রকৃতপক্ষে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের অভীক্ষা। বিশেষ বিশেষ ধরনের কাজের জন্য বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্যের অভীক্ষা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে থার্স্টোনের PMA অভীক্ষাটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

৪. ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিসত্তার অভীক্ষা :

ব্যক্তিত্বের পরিমাপ প্রধানতঃ পর্যবেক্ষণ এবং সংব্যাখ্যানের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তির কাজকর্ম আচরণ, কথাবার্তা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এবং সেগুলোর সঠিক ব্যাখ্যাদানের সাহায্যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। অতীতে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বিজ্ঞান সম্মত ছিল না, ফলে সংগৃহীত তথ্য নির্ভুল ও নির্ভর যোগ্য হত না। আধুনিক কালে পরিসংখ্যান পদ্ধতির প্রভূত উন্নতি সাধিত হওয়ায় ব্যক্তিত্ব পরিমাপ অধিকতর নির্ভর যোগ্য হয়ে উঠেছে। প্রতিফলনমূলক অভীক্ষার সাহায্যে সাধারণতঃ ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করা হয়ে থাকে। মানসিক রোগ, বিভিন্ন প্রকার অপরাধ এবং চিকিৎসার

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের অভীক্ষাগুলোর ব্যাপক প্রচলন রয়েছে।

৫. আগ্রহের অভীক্ষা ঃ

কোন কাজ সম্পন্ন করার জন্য ব্যক্তির যে তৃপ্তি ও আনন্দের অনুভূতি জাগ্রত হয় তাকে আগ্রহ বলা যায়। একজন শিক্ষার্থীকে সুশিক্ষা ও সুনির্দেশনা দানের জন্য তার আগ্রহ জানা দরকার। বিশেষতঃ শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক কাজের জন্য ব্যক্তির আগ্রহের মাত্রা জানা একান্ত দরকার। যে বিষয়ে তার আগ্রহ থাকে সে বিষয়ে শিক্ষালাভ সহজে হয়, যদিও সকল প্রকারের শিক্ষা আগ্রহ ও সহজাত শক্তির নিরপেক্ষে অর্জন করা যায়। আগ্রহ পরিমাপের জন্য নানা প্রকার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। কিন্তু অনেক সময় সোজাসুজি প্রশ্নের ক্ষেত্রে সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। সাম্প্রতিক কালে পরোক্ষভাবে আগ্রহ পরিমাপ করার বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। কার্নেগী ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী প্রথম আগ্রহের অভীক্ষার প্রচলন করে (১৯২০ সালে)। এই অভীক্ষার সাহায্যে ব্যক্তির পছন্দ বা অপছন্দ জানা যায় এবং বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আগ্রহের মিল পরিলক্ষিত হয়। আগ্রহ অভীক্ষার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অভীক্ষাটির নাম হল ভোকেসনাল ইনটারেষ্ট ব্লাঙ্ক (Strong's Vocational Interest Blank or VIB)। ই, কে, স্ট্রং (E. K. Strong) এর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে। এতে মোট চারশ'টি প্রশ্ন আছে এবং আটটি ভাগে বিভক্ত। নির্ভরশীলতা ও বথার্থতার দিক দিয়ে এই অভীক্ষা উন্নত মানের বলে গণ্য করা হয়। কুদের প্রেফারেন্স রেকর্ড (Kuder Preference Record) আগ্রহ পরিমাপের আর একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। একটি বিশেষ ক্ষেত্র বা ব্যক্তিতে আগ্রহ পরিমাপ না করে ব্যাপকভাবে আগ্রহ পরিমাপ করা হয়। এই অভীক্ষাটি বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপযোগী তিনটি বিভিন্ন আকারে গঠিত। যেমন, বৃত্তিমূলক, ব্যক্তিগত ও বৃত্তিকর্মমূলক।

৬. মনোভাবের অভীক্ষা ঃ

মনোভাব বলতে এমন একটি মানসিক সংগঠনকে বুঝায় যার

দ্বারা বিশেষ কোন অবস্থা, প্রথা বা গোষ্ঠী সম্বন্ধে ব্যক্তি বিশেষ ধরনের আচরণ সম্পন্ন করে থাকে। মনোভাব ব্যক্তির আচরণ থেকে অনুমান করা যেতে পারে, প্রত্যক্ষভাবে পরিমাপ করে নয়।

মনোভাব পরিমাপক উপকরণগুলোকে এ্যাটিটিউড স্কেল (Attitude Scale) বলা হয়। এই স্কেলে ব্যক্তির সমর্থন বিভিন্ন মাত্রায় নির্দেশ করা হয়ে থাকে এবং এতে অনেকগুলো প্রশ্ন থাকে। এই প্রশ্নগুলোর সামগ্রিক উত্তরের ভিত্তিতে মনোভাব পরিমাপ করা হয়। মনোভাব পরিমাপের জন্য থার্স্টোন পদ্ধতি এবং লিকার্ট পদ্ধতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। লিকার্টের পদ্ধতির অনুসরণে গঠিত মিনেসোটা টিচার এ্যাটিটিউড ইনভেন্টরির দ্বারা শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্কের পরিমাপ করা হয়।

মনোবিজ্ঞান সম্মত অভীক্ষার আর একটি সাধারণ শ্রেণী বিভাগঃ

১. সম্পাদনী অভীক্ষা ঃ

এটি এক প্রকার ভাষা বর্জিত অভীক্ষা। পরীক্ষার্থী কোন মূর্ত বস্তু নাড়াচাড়া করে প্রদত্ত সমস্যার সমাধান করে থাকে এবং পর্যবেক্ষক তা নিরীক্ষণ করে লিপিবদ্ধ করেন। এই অভীক্ষাগুলোর সাহায্যে বুদ্ধির পরিমাপ করা যায় কিনা এই বিষয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বুদ্ধির অভীক্ষার ন্যায় নির্ভরযোগ্য না হলেও এগুলোর যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ও চিকিৎসাগারে মানসিক রোগীদের বুদ্ধির পরিমাপ করার জন্য সম্পাদনী অভীক্ষার প্রচুর গুরুত্ব রয়েছে। সম্পাদনী অভীক্ষাগুলোর মধ্যে সিম্যান্টিক টেষ্ট অব ইনটেলিজেন্স বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২. কাগজ-কলম-নির্ভর অভীক্ষা ঃ

এটিও একটি ভাষা বর্জিত অভীক্ষা। কাগজে আঁকা নকশা, ছবি, টিক চিহ্ন, ক্রস্‌চিহ্ন ইত্যাদির সাহায্যে সমস্যার সমাধান করতে হয়। সচরাচর দলে প্রয়োগ করা হয়। এধরনের অভীক্ষার মধ্যে আর্মি বিটা অভীক্ষাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩. শক্তি বনাম সময় অভীক্ষা ঃ

শক্তি অভীক্ষার জন্য কোন সময় সীমা বরাদ্দ করা থাকে না।

Dhaka University Institutional Repository

পরীক্ষার্থী সোজা প্রশ্ন থেকে ধীরে ধীরে কঠিন প্রশ্নের দিকে এগিয়ে যায় এবং যে পর্যন্ত সে সঠিকভাবে উত্তরদান করতে পারে সে পর্যন্ত অগ্রসর হয়। অপরদিকে সময় বা গতি অভীক্ষার ক্ষেত্রে সময়সীমা বরাদ্দ করা থাকে। অভীক্ষার্থীকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদত্ত সমস্যার সমাধান করতে হবে।

৪. অ-আদর্শায়িত অভীক্ষা :

সচরাচর শিক্ষকগণ যে সকল অভীক্ষা প্রণয়ন করেন এবং শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ করে থাকেন সেগুলো অ-আদর্শায়িত অভীক্ষা। একটি দলের শিক্ষার্থীদের উপর প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

৫. আদর্শায়িত অভীক্ষা :

এই অভীক্ষা ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়। আদর্শায়নের দু'টি স্তর আছে। প্রথম প্রয়োগ পদ্ধতি ও স্কোরিং এর মধ্যে সমতা আনায়ন করা দ্বিতীয়, নর্ম নির্ণয় করা।

একটি সু-অভীক্ষার কতিপয় বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। বৈশিষ্ট্যগুলোর অভাব থাকলে অভীক্ষাটিকে নির্ভরযোগ্য বলা যায় না। একটি নির্ভরযোগ্য অভীক্ষা ও অন্যান্য পরিমাপক যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও আবশ্যকীয় গুণাবলী নিম্নরূপ—

১. নির্ভরযোগ্যতা (Reliability)
২. যথার্থতা বা উদ্দেশ্য নিষ্ঠা (Validity)
৩. ব্যবহারযোগ্যতা (Usability)
৪. নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity)
৫. পরিমিততা (Economy)
৬. প্রয়োগশীলতা (Administrability)
৭. আদর্শায়ন (Standardisation)
৮. সম্পূর্ণতা বা পর্যাপ্ত (Adequacy)
৯. সংব্যাখ্যান ও তুলনীয়তা (Interpretation and Comparability)

১. নির্ভরযোগ্যতা : Reliability

আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল এর

উন্নতমানের নির্ভরশীলতা। অভীক্ষার নির্ভরশীলতা বলতে বুঝায় অভীক্ষাটি কতটা নির্ভরশীল, নির্ভুল ও সঠিক। নিম্নলিখিত উপায়ে নির্ভরশীলতা পরিমাপ করা হয়ে থাকে—

১. অভীক্ষণ—পুণরভীক্ষণ পদ্ধতি (Test-Retest Method)
২. সমান্তরাল বা সদৃশ পদ্ধতি (Method of parallel forms)
৩. খন্ডিতার্ধ নির্ভরশীলতা (Split Half Reliability)

অভীক্ষণ—পুণরিভীক্ষণ পদ্ধতি :

এই পদ্ধতিতে একটি অভীক্ষা একই দল শিক্ষার্থীর উপর কিছু সময়ের ব্যবধানে পর পর দু'বার প্রয়োগ করার পর যদি দেখা যায় দু'বারে ফলাফলের মধ্যে বিশেষ কোন তারতম্য নেই তাহলে অভীক্ষাটিকে নির্ভরযোগ্য বলা যায়। এই দু'বারের ফলাফলের মধ্যকার সম্পর্ক সহ পরিবর্তনের মানাঙ্ক (Co-efficient of Correlation) নির্ণয়ের দ্বারা পরিমাপ করা হয়। পারিবেশিক পরিবেশ; শিক্ষার্থীর মানসিক ও দৈহিক অবস্থার বৈষম্য ইত্যাদি কারণে পরিমাপের ক্ষেত্রে বিষমতার ভুল (variable error) দেখা দেয়। এই ভুল থেকে অভীক্ষাকে মুক্ত করাই হল অভীক্ষাটিকে নির্ভরশীল করে তোলা।

২. সমান্তরাল বা সদৃশ্য পদ্ধতি :

এই পদ্ধতিতে দ্বিতীয়বার ঐ একই অভীক্ষাটি প্রয়োগ না করে তার একটি সমান্তরাল বা সদৃশ্য রূপ প্রয়োগ করা হয়। অভীক্ষার সমান্তরাল রূপ হল উদ্দেশ্য, আকৃতি, প্রকার, পদ্ধতি ইত্যাদি দিক দিয়ে অভীক্ষাটি প্রথম অভীক্ষার মতই হবে তবে পদগুলো হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

৩. খন্ডিতার্ধ নির্ভরশীলতা :

এই পদ্ধতিতে একটি অভীক্ষাকে দু'টি সমান অংশে ভাগ করে নিয়ে সে দু'টি অর্ধখন্ডিত অংশের মধ্যে নির্ভরশীলতার মান নির্ণয়

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে প্রয়োগকৃত একই অভীক্ষার প্রত্যেকটি অংশের জন্য একটি করে স্কোর পাওয়া যায়। অর্থাৎ মোট দু'টি স্কোর। এই দু'টি স্কোরগুচ্ছের মধ্যে সহ-পরিবর্তনের মান নির্ণয় করে অভীক্ষাটির নির্ভরশীলতা পরিমাপ করা হয়। এই পদ্ধতিতে নির্ভরশীলতার যে পরিমাপ পাওয়া যায় সেটা পূর্ণ নির্ভরশীলতা নয়। $r_{,,}=2r_{,,}^{'}/1+r_{,,}^{'}$

এই সূত্রটি ব্যবহার করে পূর্ণ অভিক্ষাটির নির্ভরশীলতা পাওয়া যায়।

এখানে $r_{,,}$ = পূর্ণ নির্ভরশীলতা
$r_{,,}^{'}$ = খন্ডিতার্ধ নির্ভরশীলতা

২. যথার্থতা বা উদ্দেশ্যনিষ্ঠা—

যে উদ্দেশ্যে অভীক্ষাটি প্রণয়ন করা হয়েছে, সে উদ্দেশ্য কতদূর সার্থক করছে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। যদি কোন অভীক্ষা কাঙ্খিত উদ্দেশ্য সার্থক করে এবং তার সংগঠনগত ও বিষয়বস্তুগত ত্রুটিমুক্ত করা যায় তাহলে বলা যায় অভীক্ষাটির যথার্থতা এই গুণাবলী রয়েছে। অভীক্ষার যথার্থতা বলতে বুঝায়, যে বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার জন্য অভীক্ষাটি প্রণয়ন করা হয়েছে অভীক্ষাটি কি ঠিক সেই গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করছে না অন্য কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করছে। যথার্থতা পরিমাপ করার নিয়ম হল—অভীক্ষাটি প্রস্তুত করার পর এর ফলাফলকে নির্ণায়ক বা criterion এর সম্পন্ন ও সুপ্রতিষ্ঠিত অভীক্ষার ফলাফল। সাধারণতঃ অভীক্ষা দু'টিকে একই দল শিক্ষার্থীর উপর প্রয়োগ করে প্রাপ্ত দুই দলের ফলাফলের মধ্যে সহ-পরিবর্তনের মান নির্ণয় করা হয়। এই সহপরিবর্তনের মান যদি বেশ উন্নত হয় তাহলে ধরা যায় নতুন অভীক্ষাটির যথার্থতা গুণাবলী বিদ্যমান।

৩. ব্যবহারযোগ্যতা—

কম সময়, কম শক্তি ও কম অর্থ ব্যয় করে যদি কোন অভীক্ষা ব্যবহার করা যায় তাহলে বলা যেতে পারে অভীক্ষাটির ব্যবহার যোগ্যতা এই গুণাবলী আছে। কোন অভীক্ষা নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ হলেও সব সময় এবং সব ক্ষেত্রে ব্যবহার যোগ্য নাও হতে

পারে। এটা প্রমাণিত সত্য যে, কোন অভীক্ষার দৈর্ঘ যত বেশী হবে তার নির্ভরশীলতাও তত বাড়বে কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যবহার যোগ্য নাও হতে পারে।

৪. নৈর্ব্যক্তিকতা—

যে অভীক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিষয় নির্ভর, ব্যক্তি নির্ভর নয় এবং যেখানে অভীক্ষকের কোনরূপ প্রভাব থাকে না তাকে অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা বলা হয়। ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে তার পরিমাপের মধ্যে কিছু ভুল দেখা যায়। এই ভুলগুলো থেকে অভীক্ষাটিকে মুক্ত করাকে অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা বলা হয়। সচরাচর রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর মূল্যায়ণ করার সময় অভীক্ষকের ইচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ, মেজাজ, পরিবেশ ইত্যাদি প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এই ব্যক্তিকতা দূর করার উদ্দেশ্যে আধুনিক অভীক্ষা নৈর্ব্যক্তিক ধর্মী হয়ে থাকে। অর্থাৎ, অভীক্ষাটি সুনির্দিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত আকারে মাত্র একটি সঠিক উত্তর নির্দেশ করে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে।

৫. পরিমিততা— Economy

যে অভীক্ষা প্রণয়ন, মূল্যায়ণ ও প্রয়োগ করা কম অর্থ, কম সময় ও কম পরিশ্রম সাপেক্ষ হয় সে অভীক্ষার পরিমিততা বিদ্যমান। ব্যবহার যোগ্যতা ও পরিমিততার মধ্যে পার্থক্য খুব কম। রচনাধর্মী অভীক্ষা প্রণয়ন ও প্রয়োগের জন্য বেশী সময় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না কিন্তু উত্তরপত্র মূল্যায়ণ করার ক্ষেত্রে প্রচুর সময় ও শ্রম লাগে। অন্যদিকে, নৈর্ব্যক্তিক ধর্মী অভীক্ষা প্রণয়ন করা ও প্রয়োগ করার জন্য যথেষ্ট সময় ও শ্রম লাগে কিন্তু উত্তরপত্র মূল্যায়ণ করা সহজ সাধ্য হয়।

৬. প্রয়োগশীলতা— ADMINISTRABILITY

যে অভীক্ষা বিনা আয়াসে ও সহজে অভীক্ষার্থীদের উপর প্রয়োগ করা যায়, সে অভীক্ষাটির প্রয়োগশীলতা বিদ্যমান। কোন অভীক্ষার অন্যান্য গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও যদি প্রয়োগ পদ্ধতি জটিল হয়, তবে তার উপযোগিতা ক্ষুন্ন হয়। প্রয়োগ পদ্ধতির গুরুত্ব অত্যধিক। প্রয়োগ পদ্ধতির উপর অভীক্ষার ফলাফল অনেকটা নির্ভর করে।

Dhaka University Institutional Repository

METROPOLITAN TEACHERS' TRAINING COLLEGE ✱ DHAKA
DATE........

আদর্শায়ন— Standardisation.

আধুনিক অভীক্ষার উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য হল এগুলো আদর্শায়িত। আদর্শায়ন দু'টি প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষ প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়া দু'টি হল—

ক. অভীক্ষাটির প্রয়োগ পদ্ধতি ও স্কোরিং পদ্ধতির মধ্যে যতদূর পারা যায় সমতা রক্ষা করা।

খ. অভীক্ষাটির একটি নির্ভরযোগ্য মান বা Norm নির্ধারণ করা।

ক. প্রয়োগ পদ্ধতি ও স্কোরিং পদ্ধতির মধ্যে সমতা আনয়ন—

একটি অভীক্ষা যে পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা হয়, বিভিন্ন সময়ে বা বিভিন্ন অবস্থায় সে পরিস্থিতির যেন পরিবর্তন না ঘটে। কোন অভীক্ষা বিভিন্ন সময়ে একই দল শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রয়োগ করার পর বাহ্যিক কারণের জন্য যদি ফলাফলের মধ্যে তারতম্য দেখা দেয় তাহলে ধরে নিতে হবে অভীক্ষাটির প্রয়োগবিধির মধ্যে সমতা নেই। পরিস্থিতির সমতা সৃষ্টির জন্য যে সব বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন, সেগুলো হল—প্রশ্নের উত্তরদানের পদ্ধতি, প্রয়োগকালীন লিখিত বা মৌখিক নিয়মাবলী, সময়সীমা, প্রয়োগের পরিবেশ এবং অভীক্ষার ব্যবহারের প্রয়োজনীয় উপকরণ। এই সকল বিষয়ে সচেতন না থাকলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভীক্ষাটি প্রয়োগের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য হবে এবং লব্ধ ফলাফলের মধ্যে সমতা থাকবে না।

খ. মান নির্ণয় করা—

একটি অভীক্ষার আদর্শায়নের দ্বিতীয় পর্যায় হল অভীক্ষাটির মান নির্ণয় করা। এই মান বিজ্ঞান সম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একজন অভীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে অপর একজন অভীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করা এবং অভীক্ষাটির ফলাফলের সঠিক ব্যাখ্যা দানের জন্য এই মানের প্রয়োজন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রচলিত অভীক্ষাগুলোর সাধারণতঃ বিজ্ঞান সম্মত কোন মান নেই। ফলে অভীক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানের সঠিক মূল্যায়ণ হয় না। মান নির্ণয় করার সাধারণ পদ্ধতি হল কোন পরীক্ষার সকল পরীক্ষার্থীদের

প্রাপ্ত নম্বরের সমষ্টিকে পরীক্ষার্থীদের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা। কিন্তু একটি বিশেষ শ্রেণীর সকল পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে মান নির্ণয় করা সব সময় সম্ভবপর নাও হতে পারে। এজন্য যে শ্রেণী ও যে বিষয়ের জন্য অভীক্ষা তৈরী করা হবে সেই শ্রেণীর অভীক্ষার্থীদের মধ্য থেকে একটি নমুনাদল গঠন করা। এই নমুনাদলটি সমগ্র দলের প্রতিনিধিত্বমূলক হতে হবে। এই বাছাই করা নমুনা দলের প্রাপ্ত নম্বর থেকেই সচরাচর মান নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

৮. সম্পূর্ণতা—

কোন অভীক্ষা প্রণয়ন করার পর এর প্রয়োজনীয় সংখ্যা নির্ধারণ করা দরকার। অভীক্ষাপত্রটির সংখ্যা এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে সকল অভীক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত হয়, আবার অযথা বেশী বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত না হয়—

৯. সংব্যাখ্যান ও তুলনীয়তা—

কোন অভীক্ষা প্রয়োগের ফলে যে নম্বরগুলো পাওয়া যায় তার ব্যাখ্যা এবং সেগুলোর পরস্পরের মধ্যে নির্ভরযোগ্যতার তুলনা করাকে অভীক্ষার সংব্যাখ্যান ও তুলনীয়তা বলা হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্যে এই দু'টি গুণ নেই বললে চলে। অভীক্ষার মধ্যে এই দু'টি গুণাবলী সংযোজন করার জন্য একটি মান নির্ণয় করা প্রয়োজন। এই মান পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে নির্ণয় করা হয়। আধুনিক অভীক্ষার এমন একটি মান নির্ণয় করা হয়-যা সার্বজনীনভাবে প্রয়োগ করা যায় এবং যার সঙ্গে বিশেষ কোন অভীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করা চলে।

আলোচ্য সব কয়টি গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি অভীক্ষা শিক্ষা গবেষণার জন্য পাওয়া মুস্কিল। অন্ততঃ নির্ভরযোগ্যতা যথার্থতা এবং ব্যবহারযোগ্যতা এই তিনগুণ সম্পন্ন একটি অভীক্ষার সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। কোন অভীক্ষা প্রয়োগ করার পূর্বে এই তিনটি গুণাবলী অভীক্ষাটিতে বিদ্যমান কিনা সে সম্পর্কে গবেষককে নিশ্চিত হতে হবে। প্রয়োজন বোধে গবেষণা করে এই তিনগুণ সম্পন্ন অভীক্ষা প্রণয়ন করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ অধ্যায়
পরিসংখ্যান, পরিমাপ ও মূল্যায়ন

এই অধ্যায়টি শিক্ষা গবেষণার জন্যে প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান বিজ্ঞান, পরিমাপ ও মূল্যায়নের কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। স্কুলের জন্য নির্ধারিত গণিত বিদ্যার সীমিত জ্ঞান নিয়ে এই বিষয়ের ভিত্তিমূলক ধারণাগুলো অনুধাবন করা যায়।

পরিসংখ্যান বলতে কি বুঝায় ?

পরিসংখ্যান মূলতঃ একটি ফলিত বিজ্ঞান। সমস্যা সমাধানেই এই সার্থকতা যাচাই করা হয়। এই বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে প্রকৃত প্রাপ্ত তথ্যালোকে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। পরিসংখ্যান বলতে কখনও কখনও মনে করা হয়, সংখ্যামূলক তথ্য যা সংগৃহীত হয়েছে তাদের বর্ণনা করা, কিছু কিছু স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণ করে তা থেকে একটা গোষ্ঠির সাধারণ ধারণা লাভ করা। পরিসংখ্যান বিজ্ঞান তথ্য বিশ্লেষণে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ।

পরিসংখ্যান প্রয়োগক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে—

১. কোন্ ঘটনার জন্যে কোন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে ?

২. সমস্যার সমাধানে কিভাবে তথ্যের সংগ্রহ, বিন্যাস এবং বিশ্লেষণ করা হবে ?

৩. পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগে কোন কোন ধারণাগুলো অনুমিত হয় ?

৪. তথ্য বিশ্লেষণের ফলে যুক্তিগত ভাবে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় ?

বর্ণনামূলক তথ্য বিশ্লেষণ—

শিক্ষা গবেষণা ক্ষেত্রে দুই ধরনের পরিসংখ্যান তথ্য প্রয়োগ বিধি আছে—

১. বর্ণনামূলক ২. সিদ্ধান্তমূলক।

১. বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান তথ্য বিশ্লেষণ—

একটিমাত্র নির্দিষ্ট দলের জন্য সংখ্যাগত বর্ণনা দিয়ে বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। শিক্ষা গবেষণায় সরল বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। ফলে নির্দিষ্ট দলের জন্য অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

২. সিদ্ধান্তমূলক তথ্য বিশ্লেষণ—

বড় একটি দলের অংশ বিশেষকে নমুনা হিসাবে গ্রহণ করার পদ্ধতি এইখানে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব পূর্ণ। বড় অংশকে তথ্য বিশ্ব বলা হয়। পরিমাণ নিরূপণের জন্য নমুনার উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয়। নমুনার উপর ভিত্তি করে তথ্য বিশ্বের বৈশিষ্ট্য স্বরূপনে কিছুটা ভুলের প্রান্তিক মান শতকরা হিসাবে স্বীকার করে নিতে হয়। গবেষককে এই বিষয়ে সাবধান হতে হবে যে, নমুনা-চয়ণ তত্ত্ব ভিত্তিক না হলে তা থেকে প্রাপ্ত ফল ঐ জাতীয় বিশ্বের উপর প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

গবেষণায় পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা

১. গবেষণার প্রধান হাতিয়ার হল অনুমিত সিদ্ধান্ত গঠন করা, যা কোন তত্ত্ব বা অতীত গবেষণা থেকে গৃহীত হয়। এই অনুমান বা সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে পুরো গবেষণা কার্য পরিচালনা করা হয়ে থাকে। পরিসংখ্যানও সম্ভাবনা তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই পরি-সংখ্যান বিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান গবেষণার জন্য অপরিহার্য। সংগৃহীত তথ্যাদির বিন্যাস, বিশ্লেষণ ও ফলাফল সুষ্ঠভাবে প্রকাশ করার জন্য পরিসংখ্যান-মূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

২. গবেষণার আর একটি মূল হাতিয়ার হল পরিসংখ্যান। সংগৃহীত তথ্যকে পরিমাণে প্রকাশ করা গবেষণার জন্য অতি প্রয়োজনীয়। পরিসংখ্যানমূলক বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে তথ্যাদি পরিমাণে বা সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। পদ্ধতিগুলোর মধ্যে শতকরা, ফ্রিকোয়েন্সী বন্টন, গড়, ঘটন সংখ্যা, বিস্তৃতি, সমষ্টি, শ্রেণী ব্যবধান ইত্যাদি অত্যধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৩. সারণী, মানচিত্র, ছক, তালিকা, রেখাচিত্র, ইত্যাদির

Dhaka University Institutional Repository

সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য তথ্যে পরিণত করা যায়। এসবের ব্যবহারে তথ্যকে অধিক আকর্ষণীয়ও করে তোলা যায়। শিক্ষা গবেষণায় সারণী বা ছকের গুরুত্ব অত্যধিক এবং এর প্রয়োগও ব্যাপক। একটি সারণীতে সংগৃহীত তথ্যাদি ধারাবাহিকভাবে ও শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বিন্যস্ত করা হয়—যা দেখে একটি বিষয় সম্পর্কে সহজেই মোটামুটি ধারণা করা যায়। দুইটি বিষয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক বা তুলনামূলক আলোচনার জন্যও সারণী প্রস্তুত করা যেতে পারে। আবার দুইয়ের অধিক বিষয় নিয়েও জটিল সারণী প্রস্তুত করা হয়।

৪. পরিসংখ্যানের সাহায্যে তথ্যমালার সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত বিন্যাস সাধন করা সম্ভব পর। ফলে তথ্যাদির সঠিক বিশ্লেষণ ও ফলাফল প্রকাশ সহজ সাধ্য হয়।

৫. পরিসংখ্যানমূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে গবেষণালব্ধ তথ্যাদি সংক্ষিপ্তকরণ এবং প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সার্বিকীকরণ সম্ভবপর।

৬. গবেষণার ক্ষেত্র যদি বড় হয় তাহলে নমুনায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে এই বড় ক্ষেত্রটি থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক একটি নমুনাদল গঠন করা হয়। বড় ক্ষেত্রটি হল তথ্যবিশ্ব। নমুনা দল থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির বিশ্লেষণের ভিত্তিতে যে ফলাফল পাওয়া গেল তা বড় ক্ষেত্রটিতে প্রয়োগ করা যায়। পরিসংখ্যানের একটি প্রধান কাজ হল এই প্রকারে নমুনাদল গঠন করে তথ্যসার নির্ণয় করা এবং যে তথ্য বিশ্ব থেকে নমুনাদল গঠন করা হয়েছে সেই তথ্যবিশ্বের গুণাবলী সম্পর্কে গণিতের তত্ত্ব অনুযায়ী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

৭. পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গবেষণার জন্য কোন ব্যক্তি সম্পর্কে যে সব তথ্য সংগ্রহ করা হয় পরিসংখ্যানের সাহায্যে সেগুলো বিশ্লেষণ করে ব্যক্তির ভবিষ্যৎ কাজের কিছুটা নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য গণনা করা সম্ভবপর হয়। পর্যবেক্ষণ লব্ধ তথ্যাদি অনেক সময় এত বিশৃঙ্খল ও বিভিন্নধর্মী হয় যে সেগুলোর সাহায্যে অর্থপূর্ণ সিদ্ধান্ত গঠন করা সম্ভবপর নয়। পরিসংখ্যানের সাহায্যে তথ্যাদি সংক্ষিপ্তকরণ ও সুবিন্যস্তকরণ এবং যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গঠন করা সহজ সাধ্য।

৮. শিক্ষা গবেষণার প্রথম অবস্থায় প্রাপ্ত স্কোরগুলো অবিন্যস্ত

থাকে। অবিন্যস্ত স্কোর ব্যবহারের অনুপযোগী এবং এগুলো বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। পরিসংখ্যানের সাহায্যে এইসব স্কোরের সঠিক বিন্যাস ও প্রায়োগিক রূপদান সম্ভবপর।

৯. গবেষণা এবং সকল প্রকার বিজ্ঞানে পরিসংখ্যানের প্রয়োগ অপরিহার্য। এর সাহায্যে কোন একটি ঘটনার প্রধান কারণ নির্ণয় করা যায়। তবে ঘটনার একের অধিক কারণ থাকতে পারে, সেখান থেকে প্রধান কারণ নির্ণয় করা কঠিন। কোন ঘটনার একটি পূর্বগামী কারণকে অপরিবর্তিত রেখে, অন্য কারণগুলোকে পরিবর্তন করা হয়। এরপরও যদি ঘটনাটি ঘটে তাহলে অপরিবর্তিত কারণটিকে ঘটনার প্রধান কারণ বলে গণ্য করা যায়। আর যদি ঘটনা না ঘটে তাহলে আর একটি পূর্বগামী কারণকে অপরিবর্তিত রেখে দেখা হয় ঘটনাটি ঘটছে কিনা।

শিক্ষা গবেষণায় মানুষের আচার আচরণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এক্ষেত্রে পূর্বগামী ঘটনাগুলো নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর নয়। এ ধরনের পরীক্ষণ কার্যে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রধান কারণ নির্ণয় করা যায় এবং পরীক্ষণ পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা দূর করা সম্ভবপর।

১০. অতি সম্প্রতিকালে উদ্ভাবিত উপাদান বিশ্লেষণ পদ্ধতির (factor analysis) সাহায্যে, একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুষ যে বিশেষ ভাবে আচরণ করে থাকে, তার পিছনে কি ধরনের মানসিক উপাদানগুলো কাজ করে, সেগুলোর স্বরূপ, ব্যাখ্যা ও সংখ্যা নির্ধারণ করা যায়।

১১. গবেষণায় তথ্য গ্রহণকারী পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহৃত এবং শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপক হিসাবে ব্যবহৃত অভীক্ষাগুলোর দোষত্রুটি পরিসংখ্যানের সাহায্যে অনেকাংশে দূর করা সম্ভবপর হয়েছে।

তথ্য সাজানো পদ্ধতি—

নামের আদি বর্ণের ক্রম অনুসারে সাজানো, যেমন, নিম্নে কিছু ছাত্র ছাত্রীর ৫০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর সাজানো অবস্থায় দেখানো হল—

Dhaka University Institutional Repository

ক—২১
খ—২০
গ—২৪
ঘ—১৫
ঙ—২২

ফালি (Array)

প্রাপ্ত নম্বরের মানের ক্রম অনুসারে সাজানো—

গ—২৪
ঙ—২২
ক—২১
খ—২০
ঘ—১৫

এই পদ্ধতিতে সাজালে পরিক্ষেপ (Range) অর্থাৎ উচ্চমান—নিম্নমান এবং মধ্যমান নির্ণয় করা সহজ হয়।

নিম্নে শ্রেণীবিন্যহীন অবস্থায় তথ্যের উদাহরণ দেওয়া হল—

তালিকা—১

শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশলের 'ক' শাখার ছাত্র ছাত্রীদের (১৯৮৬ সালে) প্রাপ্ত নম্বর :—

৭৩	৯১	৮৫	৯০	৮৬	৯০	৮৪
৮৬	৬৮	৮৩	৮৬	৭৬	৮৬	৯০
৭১	৯০	৯১	৭২	৬৮	৮৫	৮২
৬৮	৭৩	৮৩	৭০	৯৪	৮২	৮১
৯০	৮৬					

শ্রেণীবদ্ধ তথ্য :

তথ্যগুলোকে সহজে বিশ্লেষণ করার জন্যে শ্রেণীগত পৌণঃপুনি বণ্টন পদ্ধতিতে সাজানো যায়।

তথ্যগুলোকে ঘটন সংখ্যা তালিকায় বিভিন্ন শ্রেণী ব্যবধানে সাজানো যায়। শ্রেণীব্যবধানের পরিমান বা বিস্তৃতি এবং সংখ্যা, প্রাপ্ত নম্বরের সংখ্যা ও নম্বরের পরিক্ষেপের উপর নির্ভর করে।

তালিকা—২

শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল বিষয়ে 'ক' শাখার ছাত্র ছাত্রীদের (১৯৮৬ সালে) প্রাপ্ত নম্বর—

নম্বরের ব্যবধান	টালি	ঘটন সংখ্যা
৯২—৯৪	/	১
৮৯—৯১	~~////~~//	৭
৮৬—৮৮	~~////~~/	৬
৮৩—৮৫	////	৪
৮০—৮২	///	৩
৭৭—৭৯		০
৭৪—৭৬	/	১
৭১—৭৩	////	৪
৬৮—৭০	////	৪
		N=৩০

এইখানে প্রত্যেক শ্রেণী ব্যবধানে ৩টি নম্বর নেওয়া হয়।
N=মোট নম্বরের সংখ্যা।

তালিকা—৩

শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল বিষয়ে 'ক' শাখার ছাত্র ছাত্রীদের (১৯৮৬ সালে) প্রাপ্ত নম্বর—

নম্বরের ব্যবধান	টালি	ঘটন সংখ্যা
৯৩—৯৭	/	১
৮৮—৯২	~~////~~//	৭
৮৩—৮৭	~~////~~~~////~~	১০
৭৮—৮২	///	৩
৭৩—৭৭	///	৩
৬৮—৭২	~~////~~/	৬
		N=৩০

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি শ্রেণী ব্যবধানে ৫টি নম্বর নেওয়া হয়।

N=মোট নম্বরের সংখ্যা

শ্রেণী ব্যবধান নির্বাচন (Class Interval) ঃ

পরিক্ষেপকে (সর্বোচ্চ নম্বর–সর্বনিম্ন নম্বর) ১৫ দ্বারা ভাগ করে মোটামুটি ভাবে শ্রেণীসংখ্যা, সংখ্যা ও শ্রেণী ব্যবধানের বিস্তৃতি নির্ণয় করা যায়।

সর্বোচ্চ নম্বর	সর্বনিম্ন নম্বর	পরিক্ষেপ	পরিক্ষেপ ÷ ১৫	প্রস্তাবিত বিস্তৃতি	ব্যবধান সংখ্যা
৯২	৭৩	১৯	১·৩	২	১০
৯৭	৩৮	৫৫	৩·৩	৪	১৪

মধ্যবিন্দু পূর্ণসংখ্যা হিসাবে পেতে হলে শ্রেণী-ব্যবধানে বিজোড় সংখ্যার একক থাকা বাঞ্ছনীয়।

জোড় সংখ্যার একক নিয়ে '৪' এর ব্যবধানে—

৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১— মধ্যবিন্দু ৬৯.৫০

বিজোড় সংখ্যার একক নিয়ে '৫' এর ব্যবধানে—

৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২— মধ্যবিন্দু ৭০

যদিও শ্রেণী ব্যবধান নির্ণয়ে নির্দিষ্ট নিয়ম ব্যবহৃত হয় না, তথাপি মোটামুটি ভাবে উপরে উল্লেখিত নীতিটি নিম্নলিখিত ভাবে অনুসরন করা যায়।

১. পরিক্ষেপ (Range) নির্ণয় করা (সর্বোচ্চ নম্বর—সর্বনিম্ন নম্বর)।

২. পরিক্ষেপকে ১৫ দ্বারা ভাগ করণ।

৩. শ্রেণীব্যবধানে মোটামুটি ভাবে বিজোড় এককের সংখ্যা নেওয়া।

৪. সর্বোচ্চ নম্বর যেন শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দুতে পড়ে।

তালিকা ১ অনুসরণ করা হলো ঃ

সর্বোচ্চ নম্বর ৯৪

সর্বনিম্ন নম্বর ৬৮

পরিক্ষেপ ২৬

$\frac{২৬}{১৫}=১\frac{১১}{১৫}$— তিন এককের ব্যবধান নির্বাচন

সর্বোচ্চ নম্বর ৯৪

সর্বোচ্চ ব্যবধান— ৯৩—৯৫

তিন সংখ্যার নিম্ন নম্বর সংখ্যার জন্য এক এককের শ্রেণী ব্যবধান যথেষ্ট।

বর্ণনামূলক পরিমাপঃ

এইখানে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় আলোচ্য হবে।

১. কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ
২. বিস্তারের পরিমাপ
৩. আপেক্ষিক অবস্থানের পরিমাপ
৪. সম্পর্কের পরিমাপ

১. কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ (Measure of Central Tendency) ঃ

এই পরিমাপে তথ্যগুলোর গড় নির্ণয় করা হয়। তথ্যগুলোর বৈশিষ্ট্য, বন্টনের মধ্যবর্তী স্থানের কাছাকাছি পরিমাপের দ্বারা বুঝা যায়। সাধারণতঃ যোজিত গড় (Mean), মধ্যক (Median) ও প্রচুরক (Mode) দিয়ে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ করা হয়।

যোজিত গড় (M)

পাটি গণিতের গড়কে বুঝায়। সব মান যোগ করে তাকে তথ্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে এটা পাওয়া যায়।

$$\text{যোজিত গড় } M = \frac{\text{সব মানের যোগফল } (\Sigma X)}{\text{তথ্য সংখ্যা } (N)}$$

উদাহরণঃ —

৭৩ সবমানের যোগফল = ৩৯১ ÷ ৫ (তথ্যসংখ্যা)
৯০ = যোজিত গড় = ৭৮.৮০
৮০
৬৮
৮০

৩৯১ ÷ ৫

Dhaka University Institutional Repository

দলবদ্ধ তথ্যের ক্ষেত্রে সূত্রঃ—

$$\text{যোজিত গড় } (M) = \frac{\{\text{প্রত্যেক ব্যবধানে ঘটন সংখ্যা } (f) \times \text{প্রত্যেক ব্যবধানের মধ্য-বিন্দুমান } (x)\} \text{ এর যোগফল}}{\text{মোট তথ্যের সংখ্যা}}$$

$$M = \frac{\Sigma fx}{N}$$

এইখানে এমন অনুমান করা হয় যে, প্রত্যেক মান প্রত্যেক ব্যবধানের মধ্যবিন্দুতে হবে।

নিম্নে দলবদ্ধহীন ও দলবদ্ধ অবস্থায় তথ্যের যোজিত গড় নির্ণয়ের উদাহরণ দেওয়া হল ঃ—

দলবদ্ধহীন অবস্থায় তথ্যের যোজিত গড়ের পদ্ধতি

৭৩
৯১
৮৫
৯০
৮৬
৯০
৮৪
৮৬
৬৮
৮৬
৮৬
৭৬
৮৬
৯০
৭১
৯০
৯১

দলবদ্ধ অবস্থায় যোজিত গড়
(প্রত্যেক ব্যবধানে ৩ একক)

শ্রেণী	f	মধ্যবিন্দু x	fx
৯২—৯৪	১	৯৩	৯৩
৮৯—৯১	৭	৯০	৬৩০
৮৬—৮৮	৬	৮৭	৫২২
৮৩—৮৫	৪	৮৪	৩৩৬
৮০—৮২	৩	৮১	২৪৩
৭৭—৭৯	০	৭৮	০
৭৪—৭৬	১	৭৫	৭৫
৭১—৭৩	৪	৭২	২৮৮
৬৮—৭০	৪	৬৯	২৭৬
	$N=৩০$		২৪৬৩

$$M = \frac{\Sigma(f)N}{N}$$

$$= \frac{২৪৬৩}{৩০}$$

$$= ৮২.১০$$

৭২
৬৮
৮৫
৮২
৬৮
৭৩
৮৩
৭০
৯৪
৮২
৮১
৯০
৮৬

$N=৩০$, $\therefore M = \frac{\Sigma x}{N}$

$= ৮২.১৬$

দলবদ্ধহীন ও দলবদ্ধ অবস্থায় তথ্যের যোজিত গড়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যেতে পারে।

কল্পনা ভিত্তিক যোজিত গড়ের সাহায্যে যোজিত গড় নির্ণয়ঃ

যোজিত গড় (M) = কল্পনা ভিত্তিক যোজিত গড় (Assumed Mean) (AM) + (c) (i)

দলবদ্ধ তথ্যের বন্টনের মাঝামাঝি কোন শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দুকে কল্পনাভিত্তিক যোজিত গড় ধরা হয়। পরে ঐ গড় হতে ক্রমান্বয়ে উপরের শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যবিন্দুগুলোর দূরত্ব '+১; +২; +৩; + - - - - - ; এইভাবে ধরা হয়। অনুরূপভাবে ক্রমশঃ নীচে শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দুগুলোর দূরত্ব কল্পনাভিত্তিক যোজিত গড় হতে '—১; —২; —৩; - - - - -' এইভাবে ধরা হয়। পরে প্রত্যেক শ্রেণী-ব্যবধানের ঘটন সংখ্যাকে অনুরূপ দূরত্ব দিয়ে গুণ করা হয়। এরপর সবগুলোকে যোগ করা হয়। অর্থাৎ {f (প্রত্যেক শ্রেণীতে ঘটন সংখ্যা) × (x') (প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্য-

Dhaka University Institutional Repository

বিন্দুর দূরত্ব)} এর যোগফল। এই যোগ ফলকে তথ্য সংখ্যা (N) দ্বারা ভাগ করলে, C এর মান পাওয়া যাবে।

$$C=\frac{\Sigma fx(x')}{N}$$

প্রত্যেক শ্রেণী ব্যবধানকে i ধরা হয়েছে।

c i কে সংশোধনীমানও বলা যায়। এই পদ্ধতিতে কম সময়ে যোজিত গড় সহজে নির্ণয় করা যায়।

উদাহরণ ঃ—

দলবদ্ধ শ্রেণী—	f	x'	fx'	i
৯২—৯৪	১	৪	৪	৩
৮৯—৯১	৭	৩	২১	
৮৬—৮৮	৬	২	১২	
৮৩—৮৫	৪	১	৪+৪১	
৮০—৮২	৩	০	০	
৭৭—৭৯	০	−১	০	
৭৪—৭৬	১	−২	−২	
৭১—৭৩	৪	−৩	−১২	
৬৮—৭০	৪	−৪	−১৬−৩০	
	N=৩০		$\Sigma fx'$= + ১১	

কল্পনাভিত্তিক গড়

ব্যবধান= ৮০—৮২

মধ্যবিন্দু= ৮১

$C=+\frac{১১}{৩০}=০.৩৭$

∴ যোজিত গড় (M) = কল্পনাভিত্তিক গড় (AM) + C × i

= ৮১ + (+০.৩৭) × ৩

= ৮১ + ১.১

= ৮২.১০

মধ্যক (Median) ঃ

মধ্যক এমন একটি বিন্দু যা একটি মধ্য তথ্যের মান অনুসারে ফালিতে সাজানো হয়। এটি অবস্থান ভিত্তিক অর্থাৎ নির্দিষ্ট তথ্যের অবস্থানের মোট তথ্য সংখ্যার অর্ধেক উপরে ও অর্ধেক নীচে তথ্যগুলো মানের ক্রমানুসারে থাকবে। কেবল সাধারণ দৃষ্টিতেও তা নির্ণয় করা যায়।

উদাহরণ—১

৯৪

৯০ ৩টি তথ্য উপরে

৮৬

৭৩ >মধ্যক (৭৩)

৭২

৭১ ৩টি তথ্য নীচে

৬৮

উদাহরণ—২

৯৪

৯০ ৪টি তথ্য উপরে

৮৬

৭৩

>মধ্যক (৭২.৫) অর্থাৎ (৭৩+৭২)÷২

৭২

৭১

৭০ ৪টি তথ্য নীচে

৬৮

ঘ দলবদ্ধহীন অবস্থায় তথ্য মানের মধ্যক নির্ণয় ঃ

১. প্রথমে মানের ক্রমঅনুসারে তথ্যগুলোকে সাজাতে হবে।

২. যদি তথ্য সংখ্যা বিজোড় সংখ্যা হয় তবে মধ্য তথ্যটির মানই মধ্যক।

Dhaka University Institutional Repository

৩. যদি তথ্য সংখ্যা জোড় সংখ্যা হয় তবে মধ্যের দুইটি তথ্য মানের গাণিতিক গড় হবে মধ্যক।

মধ্যক কেবলমাত্র মানের ক্রমানুসারে তথ্যের অবস্থানের উপরই নির্ভরশীল মান।

দলবদ্ধ অবস্থায় তথ্যমানের মধ্যক নির্ণয় :—

প্রথমে কতগুলো বিষয়ে ধারণা নিতে হবে।

ক্রমসঞ্চিত ঘটন সংখ্যা হল, নীচের ব্যবধানের ঘটন সংখ্যা থেকে ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে প্রত্যেক ব্যবধানের জন্য ঘটন সংখ্যার যোগফল।

যেমন পূর্ব উদাহরণে পাই—

(৪), (৪+৪), (৪+৪+১), (৪+৪+১+০), (৪+৪+১+০+৩), (৪+৪+১+০+৩+৪), (৪+৪+১+০+৩+৪+৬), (৪+৪+১+০+৩+৪+৬+৭), (৪+৪+১+০+৩+৪+৬+৭+১), অর্থাৎ ৪, ৮, ৯, ৯, ১২, ১৬, ২২, ২৯ ও ৩০ হল নীচ হতে প্রত্যেক ব্যবধানের জন্য ক্রমসঞ্চিত ঘটন সংখ্যা।

মধ্যক এমন একটি মান যার নীচে তথ্যের অর্ধেক সংখ্যা থাকবে। পূর্ব উদাহরণে $\frac{৩০}{২} = ১৫$, ক্রম সঞ্চিত ঘটন সংখ্যা ৪৩—৮৫ ব্যবধানের শ্রেণীতে আছে। একে মধ্যক ব্যবধান বলা যায়।

ব্যবধানের প্রকৃত সীমা পূর্ব কথিত সীমা থেকে পৃথক। যেমন, ব্যবধান ৮৩—৮৫ এর স্থলে প্রকৃত ব্যবধান হবে ৮২·৫—৮৫·৫।

এটি অনুমিত হয় যে, প্রত্যেক ব্যবধানে তথ্যগুলো সমদূরত্বে নীচ সীমা হতে উপর সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত।

$$\text{শ্রেণীব্যবধান } (i) = \left[\frac{\text{তথ্য সংখ্যা } (N)}{২} - \begin{matrix}\text{মধ্যক ব্যবধানের নীচের}\\ \text{ব্যবধানে ক্রমসঞ্চিত}\\ \text{ঘনট সংখ্যা } (F)\end{matrix}\right]$$

$$\text{মধ্যক} = \text{মধ্যক ব্যবধানের নীচসীমা } L + \frac{}{\text{মধ্যক ব্যবধানের ঘটন সংখ্যা}}$$

এ প্রসঙ্গে পূর্বের উদাহরণটি দেওয়া গেল।—

দেওয়া সীমা (limit)	প্রকৃত সীমা (true limit)	f	F
৯২—৯৪	৯১·৫—৯৪·৫	১	৩০
৮৯—৯১	৮৮·৫—৯১·৫	৭	২৯
৮৬—৮৮	৮৫·৫—৮৮·৫	৬	২২
৮৩—৮৫	৮২·৫—৮৫·৫	৪**	১৬
৮০—৮২	৭৯·৫—৮২·৫	৩	১২*
৭৭—৭৯	৭৬·৫—৭৯·৫	০	৯
৭৪—৭৬	৭৩·৫—৭৬·৫	১	৯
৭১—৭৩	৭০·৫—৭৩·৫	৪	৮
৬৮—৭০	৬৭·৫—৭০·৫	৪	৪
		N=৩০	

N= ৩০

L= ৮২·৫ (যে ব্যবধানে মধ্যক অবস্থিত সেই ব্যবধানের নীচ সীমা)

* F= ১২ (ক্রমসঞ্চিত ঘটন সংখ্যা যা মধ্যক অবস্থিত ব্যবধানের নীচে, অর্থাৎ মধ্যক যে শ্রেণী ব্যবধানে অবস্থিত ঐ শ্রেণী ব্যবধানের নীচে যতগুলো ঘটন সংখ্যা আছে।)

** f=৪ (মধ্যক অবস্থিত ব্যবধান শ্রেণীর ঘটন সংখ্যা)

i = শ্রেণী ব্যবধান

$$\therefore \text{মধ্যক} = L + \frac{\left(\frac{N}{২} - F\right) \times i}{f}$$

$$= ৮২·৫ + \frac{\left(\frac{৩০}{২} - ১২\right) \times ৩}{৪}$$

$$= ৮২·৫ + \frac{(১৫ - ১২) \times ৩}{৪}$$

$$= ৮২·৫ - ২·২৫$$

$$= ৮৪·৭৫$$

প্রচুরক (Mode) :

প্রচুরক হল তথ্যের মান বন্টনের মধ্যে এমন একটি মান যেখানে

Dhaka University Institutional Repository

সবচাইতে বেশী সংখ্যক তথ্যের মান পাওয়া যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে, দুই বা ততোধিক স্থানে সমান সংখ্যক তথ্যের মান দেখা যায়। যেমন,

৬৮, ৭৩, ৬৮, ৮৬, ৮৬, ৯০, ৮৬ এর এক প্রচুরক ৮৬

৬৮, ৭৩, ৬৮, ৮৬, ৮৬, ৯০, ৮৬, ৬৮ এর দুই প্রচুরক ৮৬ ও ৬৮

আবার দলবদ্ধ অবস্থায় তথ্যের প্রচুরক বের করা যায়। এইক্ষেত্রে প্রচুরক = ৩ মধ্যক — ২ যোজিত গড়

উপরের উদাহরণে—

প্রচুরক = ৩ × ৮৪·৭৫ − ২ × ৮২·১০

= ২৫৪·২৫ − ১৬৪·২০

= ৯০·০৫

তবে যে ব্যবধানে ঘটন সংখ্যা সবচাইতে বেশী, সেই ব্যবধানের মধ্য বিন্দুকেও প্রচুরক হিসাবে নেওয়া যায়।

একটি উদাহরণে প্রচুরক = ৯০

ব্যবধান (৮৯—৯১)

পরিমিত বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রচুরক একটি হয় এবং তা বন্টনের মধ্যবিন্দুতে অবস্থিত। অপরিমিত বিন্যাসের প্রচুরক একাধিক হতে পারে। এমন কি, একটি প্রচুরক হলেও তা মধ্যবিন্দু থেকে অনেক দূরে অবস্থিত হতে পারে।

বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপের ব্যবহার—

যোজিত গড়ঃ—এটি অন্যগুলো অপেক্ষা অধিক যথার্থ পরিমাপক। পরিসংখ্যানের গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণে এর ব্যবহার বহুল।

মধ্যকঃ— কোন বন্টনের প্রকৃত মধ্যবিন্দু অর্থাৎ উক্ত বন্টনের উপরে কতজন ও নীচে কতজন আছে তা মধ্যকের মাধ্যমে জানা সম্ভব। কোন বন্টনের উপরের বা নীচের কিছু তথ্য না থাকলেও কেন্দ্রীয় প্রবণতার মান মধ্যকের মাধ্যমে জানা যায়। বন্টনে চূড়ান্ত স্কোর থাকলে তখন মধ্যকই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পরিমাপ।

প্রচুরকঃ—যেই মানে ঘটন সংখ্যা বেশী তা খুব দ্রুত নির্ণয় করা

যায়। বিশেষ কোন মান নির্ণয়ের জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

আপেক্ষিক অবস্থানের পরিমাপ
(Measurement of Relative Position)

একটি ফালিতে কোন একটি তথ্যমানের অন্যান্য তথ্যের অবস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত অবস্থা বর্ণনা করার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। শতাংশ স্থান, (percentile rank) ফালিতে এমন একটি বিন্দু যার নীচে প্রদত্ত শতকরা তথ্যমানগুলো থাকে। যেমন, আশি শতাংশ স্থানীয় মানের পরিমান ৬৮। ইহার অর্থ এই যে শতকরা আশি ভাগ মান ৬৮ এর নীচে। তদ্রূপ মধ্যককে বলা যায় যে এমন একটি মান যার নীচে শতকরা ৫০ ভাগ তথ্যমান আছে।

শতাংশ অবস্থানের উপর নির্ভর করে কোন ছাত্র ছাত্রীর কৃতিত্ব সম্পর্কে ধারণা করা যায়। যদি মনে হয় কোন ছাত্র বা ছাত্রীর শতাংশ অবস্থান ৯৮ তম তখন বোঝা যাবে যে, পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শতকরা ৯৮ ভাগ ছাত্রছাত্রী অপেক্ষা তার কৃতিত্ব উপরে এবং সমস্ত দলের মধ্যে প্রথম দুই শতাংশের মধ্যে তার কৃতিত্বের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করে। বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ প্রাপ্ত নম্বরের উপর ভিত্তি করে অবস্থান নির্ণয় করে। এই অবস্থানকে শতাংশ অবস্থানে পরিণত করে আরো অর্থবহ করা যায়।

সূত্রঃ— শতাংশ অবস্থান $= ১০০ - \frac{(১০০RK - ৫০)}{N}$

RK হল সর্বোচ্চ অবস্থান থেকে কোন অবস্থানে আছে। ধর যাক 'ক' ১৫০ জন ছাত্রের মধ্যে ৫০ তম অবস্থানে আছে। অর্থাৎ ক এর নীচে ১০০টি অবস্থান আছে।

অতএব শতাংশ অবস্থান $= ১০০ - \frac{(১০০ \times ৫০ - ৫০)}{১৫০}$

$= ১০০ - ৩৩$

$= ৬৭$

শতাংশ নম্বর (Percentile score) শতাংশ অবস্থান জানা থাকলে শতাংশ নম্বর একটি বন্টন থেকে নির্ণয় করা যায়।

পদ্ধতি—

১. মোট তথ্য সংখ্যাকে দেওয়া শতাংশ অবস্থান দ্বারা গুণ

Dhaka University Institutional Repository

করতে হবে।

২. ফালিতে দেওয়া নীচের তথ্য থেকে উপরের দিকে এই তথ্যের সংখ্যা খুঁজতে হবে।

৩. যেখানে পৌঁছান গেল উহাই শতাংশ তথ্য।

দলগত তথ্য থেকে শতাংশ তথ্য নির্ণয়

(Computing percentile score from grouped data)

এই পদ্ধতি অনেকটা মধ্যক নির্ণয়ের মতো। অথ্যগুলোকে জোড় ভাবে প্রত্যেক ব্যবধানে বন্টিত ধরা হয়।

মধ্যক $= L + \frac{i(\frac{N}{2} - f)}{F}$

এই পদ্ধতিতে pth শতাংশ অবস্থান

$$P = L + \frac{i(\frac{PN}{100} - f)}{F}$$

দলবদ্ধ শ্রেণী	ঠিক সীমা	f	F
৯২–৯৪	৯১·৫–৯৪·৫	১	৩০
৮৯–৯১	৮৮·৫–৯১·৫	৭	২৯
৮৬–৮৮	৮৫·৫–৮৮·৫	৬	২২
৮৩–৮৫	৮২·৫–৮৫·৫	৪	১৬
৮০–৮২	৭৯·৫–৮২·৫	৩	১২
৭৭–৭৯	৭৬·৫–৭৯·৫	০	৯
৭৪–৭৬	৭৩·৫–৭৬·৫	১	৯
৭১–৭৩	৭০·৫–৭৩·৫	৪ f	৮
৬৮–৭০	৬৭·৫–৭০·৫	৪	৪ F
		N = ৩০	

$R_R = \frac{25}{100}$ = নীচ থেকে ২৫ তম তথ্য

২৫ তম শতাংশ অবস্থান (Percentile rank)

L = ৭০·৫ (ব্যবধানের নীচ সীমা)

F = ৪ (২৫ শতাংশ ব্যবধানের নীচে বন্টন সংখ্যা)

$\therefore P_{২৫} = ৭০·৫ + \frac{৩(২৫(৩০)-৪)}{৪}$

$= ৭০·৫ + \frac{৩ \times ৩·৫}{৪}$

$= ৭০·৫ + ২·৪$ f = কোন শ্রেণীতে ঘটন সংখ্যা

$= ৭০·৫ + ২·৪$ F = সংখ্যায়িত ঘটন সংখ্যা

$= ৭২·৯$ (প্রায়)

কতকগুলো শতাংশ খুবই প্রয়োজনীয়। ২৫ তম শতাংশকে ১ম এক চতুর্থাংশক (Q_1) বলে আখ্যায়িত করা হয়। শত করা ২৫ ভাগ তথ্য এর নীচে। ৫০ তম শতাংশককে মধ্যক বা দ্বিতীয় চতুর্থাংশ (Q_2) বলে আখ্যায়িত করা হয়। ৭৫ তম শতাংশককে তৃতীয় চতুর্থাংশ (Q_3) বলে আখ্যায়িত করা হয়। একইভাবে ১০ তম, ২০ তম, ৩০ তম, ৪০ তম, শতাংশককে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি দশমাংশক বলে আখ্যায়িত করা হয়।

বিস্তৃতি পরিমাপ (Dispersion) ঃ

কেন্দ্রীয় প্রবণতার মান ছাড়াও অন্য একপ্রকার পরিমাপ আছে। যখন দুই দলের মধ্যে প্রত্যেকটির যোজিত গড় (mean), মধ্যক (median) এবং প্রচুরক (mode) একই থাকে তখন পরীক্ষা করে দেখা হয়, কোন দলে তথ্যগুলোর মানের বিস্তৃতি বেশী। ইহাকে বিস্তৃতির পরিমাপ বলে।

পরিক্ষেপ (Range) ঃ

পরিক্ষেপ হল সব চাইতে সহজে নির্ণীত পরিমিত বিস্তার পরিমাপ।

পরিক্ষেপ = সর্বোচ্চ মান – সর্বনিম্ন মান.

যেমন, ঃ— ১ নং তালিকায়

পরিক্ষেপ = ৯৪ – ৬৮

= ২৬

যোজিত গড় মান থেকে মানের বিচ্যুতি (Deviation from the mean)

প্রণালীঃ—প্রত্যেকটি মান থেকে যোজিত গড়ের মান বিয়োগ করে, বিয়োগফলগুলোকে প্রত্যেকটি ধনাত্মক ধরে যোগ করতে হবে,

Dhaka University Institutional Repository

যোগফলের গড় নির্ণয় করলে তা যোজিত গড় মান থেকে মানের বিচ্যুতি পরিমাপ হবে।

যেমন, ৫, ১০, ১৫ এর বেলায়

যোজিত গড়=১০

যোজিত গড় মান থেকে মানের বিচ্যুতি হবেঃ

$$\frac{(৫-১০)+(১০-১০)+(১৫-১০)}{৩}$$

$$=\frac{৫+০+৫}{৩}=\frac{১০}{৩}=৩'৩৩$$

বিস্তারক (Variance) ঃ

$$S^2=\frac{\Sigma(\text{তথ্যমান}-\text{যোজিত গড়মান})^2}{\text{তথ্য সংখ্যা}-১}=\frac{\Sigma(x-M)^2}{N-1}$$

পরিমিত বিস্তার

$$S=\sqrt{\frac{\Sigma(x-M)^2}{N-1}}$$

যেমন ৫, ১০, ১৫ এর ক্ষেত্রে

বিস্তারক $S^2=\frac{(৫-১০)^2+(১০-১০)^2+(১৫-১০)^2}{৩-১}$

$$=\frac{(-৫)^2\times(০)^2+(৫)^2}{২}$$

$$=\frac{২৫+২৫}{২}=\frac{৫০}{২}=২৫$$

পরিমিত বিস্তার S= ৫ হবে।

তথ্য সংখ্যা বেশী হলে নীচের সূত্র প্রয়োগ করা সুবিধাজনক ঃ

$$S=\sqrt{\frac{N\Sigma x^2-(\Sigma x)^2}{N(N-1)}}$$

যেমন, উপরের উদাহরণে—

x	x^2
৫	২৫
১০	১০০
১৫	২২৫
$\Sigma x=৩০$	$\Sigma x^2=৩৫০$

$N=৩$

$$\therefore S=\sqrt{\frac{৩\times৩৫০-(৩০)^2}{৩(৩-১)}}$$

$$=\sqrt{\frac{১০৫০-৯০০}{৬}}$$

$$=\sqrt{\frac{১৫০}{৬}}=\sqrt{২৫}$$

$=৫$

তবে, স্মরণ রাখা দরকার যে, উপরের S^2 বা S এর মানগুলো অপক্ষপাতি (unbiased)।

পক্ষপাতির ক্ষেত্রে s বা s^2 নির্ণয়ে (N—1) এর পরিবর্তে N হবে।

কল্পনা ভিত্তিক যোজিত গড়ের পদ্ধতিতে পরিমিত বিস্তার (Standard deviation) নির্ণয় ঃ—

দলবদ্ধ শ্রেণী	f	x′ (ব্যবধান বিচ্যুতি)	fx′	fx'^2
৯২—৯৪	১	+৪	+৪	১৬
৮৯—৯১	৭	+৩	+২১	৬৩
৮৬—৮৮	৬	+২	+১২	২৪
৮৩—৮৫	৪	+১	+৪	৪
			৪১	
* ৮০—৮২	৩	০	০	০
৭৭—৭৯	০	−১	০	০
৭৪—৭৬	১	−২	−২	৪
৭১—৭৩	৪	−৩	−১২	৩৬
৬৮—৭০	৪	−৪	−১৬	৪৬
			−৩০	১৯৩
	N=৩০		১১	

ধরা যাক, যোজিত গড়মান (৮০—৮২) ব্যবধানের মধ্যে, সুতরাং মধ্যবিন্দু ৮১

ব্যবধান i=৩

Dhaka University Institutional Repository

$C = \frac{\Sigma fx'}{N} = \frac{১১}{৩০} = ·৩৭$ C কে সংশোধন রাশি বলে।

$C^2 = (·৩৭)^2 = ·১৪$

$S = i\sqrt{\frac{\Sigma fx'^2}{N} - C^2}$

$= ৩\sqrt{\frac{১৯৩}{৩০} - ·১৪}$

$= ৩\sqrt{৬·৪৩ - ·১৪}$

$= ৩\sqrt{৬·২৯}$

$= ৩ \times ২·৫$

$= ৭·৫$

আপেক্ষিক বিস্তার (Co-efficient of Variations) :

যোজিত গড়ের সঙ্গে পরিমিত বিস্তারের সম্পর্কযুক্ত একটি পরিমাপকের সাহায্যে বিভিন্ন দলের তথ্যগুলোর বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হয়। একে Cv দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

$Cv = \frac{S}{\bar{x}} \times ১০০$, অর্থাৎ $\frac{\text{পরিমিত বিস্তার}}{\text{যোজিত গড়}} \times ১০০$

উপরের উদাহরণে যোজিত গড় পাওয়া যাবে ৮২·১ এবং পরিমিত বিস্তার ৭·৫

$\therefore Cv = \frac{৭·৫}{৮২·১} \times ১০০ = \frac{৭৫০}{৮২·১} = ৯·১$

সম্পর্ক পরিমাপ (Measure of Relationship):

সংশ্লেষণ (Correlation) :

একটি ঘটনা অন্য একটি ঘটনার উপর নির্ভরশীল হলে দুই ঘটনার তথ্যগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়। যেমন ধরা যাক, দেহের উচ্চতার সঙ্গে দেহের ওজনের সম্পর্ক। সম্পর্ক তিন রকমের হয় যথা—ধনাত্মক সম্পর্ক, সম্পর্কহীনতা ও ঋণাত্মক সম্পর্ক। ধনাত্মক সম্পর্ক যেমন, বয়সের সঙ্গে দেহের ওজনের সম্পর্ক। একটির বৃদ্ধি অপরটির বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সম্পর্কহীনতা যেমন, পায়ের জুতার সাইজের সঙ্গে আয়ের পরিমাণ। এখানে কোনটির বৃদ্ধি অন্য কোনটির উপর কোন ধরনের প্রভাব ফেলায় না।

ঋনাত্মক সম্পর্ক, যেমন, খরচ বৃদ্ধি হলে, টাকা জমানোর পরিমাণ হ্রাস পাবে। এখানে একটির বৃদ্ধি অন্যটির হ্রাস পাওয়ার কারণ। যে কোন ধরণের সম্পর্কই হোক না কেন তা নির্ণয়ের জন্য দুইটি ভিন্ন ধর্মের তথ্য দলের মধ্যে সংশ্লেষাঙ্ক ব্যবহার করা হয়। ধনাত্মক সম্পর্কের বেলায় r এর মান সর্বোচ্চ, ধনাত্মক মান +1 হয়। সম্পর্কহীনতার বেলায় r এর মান ০ হয় এবং ঋনাত্মক সম্পর্কের বেলায় r এর মান সর্বনিম্ন −1 হয়। অর্থাৎ r এর বিস্তৃতি −1 থেকে +1 এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

সাধারণ সংশ্লেষাঙ্ক (Co-efficient of Correlation) নির্ণয় :

ইহা সহজে নির্ণয়ের সূত্র—

$$r = \frac{\Sigma xy - \frac{\Sigma x \Sigma y}{n}}{\sqrt{\left\{\Sigma x^2 - \frac{(\Sigma x)^2}{N}\right\}\left\{\Sigma y^2 - \frac{(\Sigma y)^2}{N}\right\}}}$$

যখন সংশ্লেষাঙ্ক = r
তথ্য মান = x, y
মোট জোড়া সংখ্যা = n

উদাহরণ :—

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে ১৯৮৬ সালে শিক্ষাগবেষণা বিষয়ে ১০ জন ছাত্রছাত্রী দু'টো পরীক্ষায় নীচের নম্বরগুলো পেল। তাদের এই নম্বর পাবার জন্যে দু'টো পরীক্ষার মধ্যে কতটুকু সংযোগ আছে ?

ছাত্র/ছাত্রী	১ম পরীক্ষার নম্বর x	২য় পরীক্ষার নম্বর y	xy	x^2	y^2
ক—	১৩	২৬	৩৩৮	১৬৯	৬৭৬
খ—	১০	২৯	২৯০	১০০	৮৪১
গ—	১৮	৩১	৫৫৮	৩২৪	৯৬১
ঘ—	১৪	২৪	৩৩৬	১৯৬	৫৭৬
ঙ—	২৫	৩৮	৯৫০	৬২৫	১৪৪৪
চ—	১৭	২৮	৪৭৬	২৮৯	৭৮৪

Dhaka University Institutional Repository

METROPOLITON TEACHERS TRAINING COLLEGE DHAKA DATE........

ছ—	২৫	২৯	৭২৫	৬২৫	৮৪১
জ—	২২	৩৩	৭২৬	৪৮৪	১০৮৯
ঝ—	১৮	৩২	৫৭৬	৩২৪	১০২৪
ঞ—	২০	৩০	৬০০	৪০০	৯০০
	X এর যোগফল	y এর যোগফল			

$\Sigma x = ১৮২,\ \Sigma y = ৩০০,\ \Sigma xy = ৫৫৭৫,\ \Sigma x^2 = ৩৫৩৬,\ \Sigma y^2 = ৯১৩৬$

ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা $n = ১০$

$$\therefore r = \frac{৫৫৭৫ - \frac{১৮২ \times ৩০০}{১০}}{\sqrt{\left\{৩৫৩৬ - \frac{(১৮২)^2}{১০}\right\}\left\{৯১৩৬ - \frac{(৩০০)^2}{১০}\right\}}}$$

$$= \frac{৫৫৭৫ - ৫৪৬০}{\sqrt{(৩৫৩৬ - ৩৩১২.৪)(৯১৩৬ - ৯০০০)}} = \frac{১১৫}{\sqrt{২২৩.৬ \times ১৩৬}}$$

$$= \frac{১১৫}{১৭৪.৩৮} = ০.৬৫৯ \approx ০.৬৬ \approx ০.৭$$

সুতরাং, দুই পরীক্ষার নম্বরের মধ্যে একটা ধনাত্মক সংযোগ আছে।

তবে এই r টা যথার্থ কিনা তা যাচাই করার জন্য r এর যথার্থ তালিকা দেখতে হবে। এখানে x ও y এর মধ্যে একটাকে অনির্ভরশীল বিভিন্নক অবশ্যই ধরতে হবে। একের অধিক বিভিন্নক থাকলে, একটা ছাড়া অন্যগুলো অনির্ভরশীল বিভিন্নক। সংশ্লেষাংক তালিকা থেকে ০.০৫ সম্ভাবনা স্তরে এবং স্বাধীনতার মাত্রা= (n−২) বা (১০−২) বা ৮ পর্যায়ে r এর মান ০.৬৩২। আবার একই ভাবে .০১ সম্ভাবনা স্তরে r এর মান ০.৭৬৫। যেহেতু, প্রাপ্ত r এর মান একমাত্র .০৫ সম্ভাবনা স্তরের বেশী, সুতরাং বলা যায় যে, উপরোক্ত উদাহরণে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষাগুলোর মধ্যে সম্পর্ক .০৫ সম্ভাবনা স্তরে যথার্থ।

অন্যভাবেও r এর যথার্থতা যাচাই করা যায়।

$$t = \sqrt{\frac{r^2(n-2)}{(১-r^2)}} = \frac{(.৬৬)^2(১০-২)}{\{১-(.৬৬)^2\}} = \sqrt{\frac{০.৪৬৫৬ \times ৮}{১-০.৪৮৫৬}}$$

$$= \frac{৩.৪৮৪৮}{০.৫৬৪৪} = \sqrt{৬.১৭} = ২.৪৮$$

$$\therefore |t| = ২.৪৮$$

একই ভাবে t তালিকা থেকে (১০−২) বা ৮ স্বাধীনতা মাত্রায় r এর যথার্থ মান .০৫ সম্ভাবনা স্তরে ১.৮৬০ এবং .০১ সম্ভাবনা স্তরে ২.৮৯৬। সুতরাং ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষাগুলোর মধ্যে সম্পর্ক .০৫ সম্ভাবনা স্তরে যথার্থ।

উপরোক্ত উদাহরণের সাহায্যে তথ্যগুলো বিভিন্ন বিভাগে সাজিয়ে r এর মান বের করা যায়। অনেক তথ্যের বেলায় এই পদ্ধতি r এর মান নির্ণয়ে সহজতর।

x ↓ \ y →	−১ ২০-২৪	০ ২৫-২৯	১ ৩০-৩৪	২ ৩৫-৩৯	f	fx	fx²	fxy	y(Σfx)
−২ ১০−১৪	'(১)	''(২)			৩	−৬	১২	−১	২
−১ ১৫−১৯		'(১)	''(২)		৩	−৩	৩	২	−২
০ ২০−২৪			''(২)		২	০	০	২	০
১ ২৫−২৯		'(১)		'(১)	২	২	২	২	২
f	১	৪	৪	১	১০	−৭	১৭	৫	২
fy	−১	০	৪	২	৫				
fy²	১	০	৪	৪	৯				
Σfyx	−২	−৪	−২	১	−৭				
y(Σfyx)	২	০	−২	২	২				

এইখানে $n = ১০$

$\Sigma x = -৭$

$\Sigma y = ৫$

$\Sigma xy = ২$

$\Sigma x^2 = ১৭$

$\Sigma y^2 = ৯$

$$\therefore r = \frac{\Sigma xy - \frac{\Sigma x \Sigma y}{N}}{\sqrt{\left\{\Sigma x^2 - \frac{(\Sigma x)^2}{N}\right\}\left\{\Sigma y^2 - \frac{(\Sigma y)^2}{N}\right\}}}$$

$$= \frac{২ - \frac{(-৭)\times(৫)}{১০}}{\sqrt{\left\{১৭ - \frac{(-৭)^2}{১০}\right\}\left\{৯ - \frac{(৫)^2}{১০}\right\}}}$$

Dhaka University Institutional Repository

$$= \frac{২+৩·৫০}{\sqrt{১২·১ \times ৬·৫}} = \frac{৫·৫০}{\sqrt{৭৮·৬৫}} = \frac{৫·৫০}{৮·৮৭} = ০·৬২ \cong ০·৬$$

বিভাগকৃত তথ্যে r এর মানের সামান্য পার্থক্য হয়। এই পদ্ধতিতে r এর যথার্থতা যাচাই পূর্ববৎ হবে।

অনুক্রমিক সংশ্লেষাংক (Co-efficient of Rank Correlation) :

তথ্যকে অনুক্রমভিত্তিক সাজিয়ে এই সংশ্লেষাংক নির্ণয় করা হয়।

সূত্র :— $r = ১ - \frac{৬\Sigma d^2}{n(n^2-১)}$, d = অনুক্রমের পার্থক্য, n = জোড়ার সংখ্যা

পূর্বের উদাহরণের সাহায্যে এর নির্ণয় পদ্ধতি দেওয়া গেল।

১ম পরীক্ষার নম্বর X	২য় পরীক্ষার নম্বর Y	১ম পরীক্ষার মান অনুসারে ক্রম. x	২য় পরীক্ষার মান অনুসারে ক্রম y	অনুক্রমের পার্থক্য (d)	d^2
ক. ১৩	২৬	৭	৮	−১	১
খ. ১০	২৯	৮	৬	২	৪
গ. ১৮	৩১	৪	৪	০	০
ঘ. ১৪	২৪	৬	৯	−৩	৯
ঙ. ২৫	৩৮	১	১	০	০
চ. ১৭	২৮	৫	৭	−২	৪
ছ. ২৫	২৯	১	৬	−৫	২৫
জ. ২২	৩৩	২	২	০	০
ঝ. ১৮	৩২	৪	৩	১	১
ঞ. ২০	৩০	৩	৫	−২	৪
					$\Sigma d^2 = ৪৮$

$$\therefore r = ১ - \frac{৬ \times ৪৮}{১০(১০^2-১)} = ১ - \frac{৬ \times ৪৮}{৯৯০} = ১ - \frac{২৮৮}{৯৯০}$$

$$= ১ - ০·২৯ = ০·৭১, \cong ০·৭$$

অর্থাৎ দুই পরীক্ষার মধ্যে একটা ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান

আছে। r এর মানের যথার্থতা নির্ণয় পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

যাচাই করণ [Test] :

পরিসংখ্যানে প্রাপ্তফলের মান যাচাইয়ের জন্যে বিভিন্ন ক্ষেত্র বিশেষে নীচের যাচাইগুলো করা হয়।

ক. পরিমিত বন্টনের যাচাই (Normal Tests)

খ. t যাচাই (t-tests)

গ. কাইবর্গ যাচাই (x^2 – tests)

ঘ. F যাচাই (F-tests)

ক, পরিমিত বন্টনের যাচাই :

প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে আদর্শ বিন্যাসে পরিবর্তন করতে হলে, প্রত্যেক রূপান্তরিত তথ্য হবে :

$$\frac{\text{প্রাপ্ত তথ্য(Scorc) – তথ্যগুলোর যোজিত গড় (mean)}}{\text{পরিমিত বিস্তার (SD)}}$$

রূপান্তরিত তথ্যগুলোর যোজিত গড় হবে ১ এবং পরিমিত বিস্তার হবে ০। খুব বড় তথ্যবিশ্ব থেকে বড় নমুনা চয়ন করে ও প্রাপ্ত নমুনার যাচাই করণ করে ঐ তথ্যবিশ্ব সম্পর্কে ধারণা নেওয়া হয়।

খ, t যাচাই :

খুবই কম সংখ্যক বিশিষ্ট নমুনা নিলে (n, ৩০ থেকে কম), এই জাতীয় যাচাই করতে হয়। বেশী সংখ্যক বিশিষ্ট নমুনা হলে তখন এটা আদর্শ বিন্যাসের অনুরূপে যাচাই করতে হয়।

গ, কাইবর্গ যাচাই :

বিভিন্নকগুলোর মধ্যে বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক কেমন আছে তা দেখার জন্য এ জাতীয় যাচাই করা হয়।

ঘ, F যাচাই :

দুটো তথ্যবিশ্বের মধ্যে বিদ্যমান আদর্শ বিস্তারের পার্থক্য

Dhaka University Institutional Repository

যাচাই করতে এই F– যাচাই ব্যবহৃত হয়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গিয়ে যাচাই করণ দরকারী যাচাই করণে নীচের বিষয়গুলো স্মরণ রাখতে হবে।

১. সমতা কল্পনা (null hypothesis) ও অসমতা কল্পনা (alternative hypothesis)।

২. যথার্থতার স্তর বা সম্ভাবনার স্তর (level of Significance) ও স্বাধীনতার মাত্রা (degree of freedom) ভিত্তিক অথবা কল্পনা অগ্রাহ্য অঞ্চল (Critical region)

৩. তথ্যবিশ্ব থেকে নমুনা চয়ন

৪. উদ্দেশ্যাভিত্তিক z, t_b, x^2, ও F যাচাই করণ

৫. হিসাবকৃত মান ও তালিকা ভুক্ত মানের মধ্যে তুলনা

(৬) যখন হিসাবকৃত মান তালিকা ভুক্ত মান থেকে বেশী হয় তখন সমতা কল্পনা অগ্রাহ্য করা হয় অর্থাৎ অসমতা কল্পনা নেওয়া হয়।

ক. নমুনা থেকে প্রাপ্ত গড় তথ্যবিশ্বের গড়ের সাথে তুলনা : যখন নমুনা ৩০ অপেক্ষা বড় তখন z যাচাইয়ের ক্ষেত্রে :—

উদাহরণ : - মনে করা হলো শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল বিষয়ে শতাধিক ছাত্র ছাত্রীর প্রাপ্ত নম্বরের গড়মান (৫০ নম্বরের মধ্যে) ৩০। এটা যাচাইয়ের জন্যে ৫০ জন ছাত্র ছাত্রীর মান নেওয়া গেল। যোজিত গড় ৩৫ এবং পরিমিত বিস্তার ৬ পাওয়া গেল। এটা কি প্রকৃতপক্ষে ধরে নেওয়া যায় যে, সমস্ত ছাত্রছাত্রীর প্রাপ্ত নম্বরের গড় ৩০ হবে ?

সমাধান : সমতা কল্পনা $H_o : \mu = \mu_0 = 30$

অসমতা কল্পনা $H_i : \mu \neq \mu_0$

অথবা $H_i : \mu > \mu_0$ বা $H_i : \mu < \mu_0$

Z যাচাই হবে —(যেহেতু ৩০ জন ছাত্র ছাত্রীর নমুনা)

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{\text{(নমুনার গড়) — (পরামানের গড়)}}{\frac{\text{নিরূপিত পরামানের পরিমিত বিস্তার}}{\sqrt{\text{নমুনার আকার}}}}$$

$$= \frac{৩৫ - ৩০}{\frac{৬}{\sqrt{৫০}}} = ৫ \times \frac{৭.০৭}{৬} = ৫.৮৯$$

∴ |Z| = ৫.৮৯ (অর্থাৎ + বা — চিহ্ন উপেক্ষা করে বা ধনাত্মক বা ঋনাত্মক)

এটা দুই প্রান্ত ভিত্তিক যাচাই (Two tailed test)

তালিকা যাচাই এর মান ৫% যথার্থতার স্তরে ১.৯৬০ এবং ১০% যথার্থতার স্তরে ২.৫৭৬। অতএব, হিসাবকৃত মান ১% যথার্থস্তরে যথার্থ এবং অগ্রাহ্য। ধরে নেওয়া যায় যে, সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রাপ্ত নম্বরের গড় ৩০। যখন নমুনার আকার ৩০ বা তার নীচে তখন t যাচাইয়ের ক্ষেত্রে :— উদাহরণ :—

মনে করা হল শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল বিষয়ে শতাধিক ছাত্রছাত্রীর প্রাপ্ত নম্বরের গড়মান (৫০ নম্বরের মধ্যে) ৩০। এটা যাচাইয়ের জন্য ৩০ জন ছাত্রছাত্রীর মান নেওয়া গেল। যোজিত গড় ১৮; এবং পরিমিত বিস্তার ৪ পাওয়া গেল। এটা কি প্রকৃতই ধরে নেওয়া যায় যে, সমস্ত ছাত্রছাত্রীর প্রাপ্ত নম্বরের গড় ৩০ হবে ?

সমাধান :— সমতা কল্পনা $H_o : \mu = \mu_0 = 30$

অসমতা কল্পনা $H_i : \mu \neq \mu_0$

অথবা $H_i : \mu > \mu_0$ বা $H_i : \mu < \mu_0$

t যাচাই হবে (যেহেতু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩০)

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{\text{(নমুনার গড়)} - \text{(পরমানের গড়)}}{\frac{\text{নমুনার পরিমিত বিস্তার}}{\sqrt{\text{নমুনার আকার}}}}$$

$$= \frac{১৮ - ৩০}{\frac{৪}{\sqrt{৩০}}} = -১২ \times \frac{৫.৪৮}{৪}$$

$$= -১৬.৪৪$$

$$|t| = ১৬.৪৪$$

ইহাও দুই প্রান্তভিত্তিক যাচাই।

তালিকাভুক্ত t এর মান ১% ও ৫% যথার্থতায় স্তরে (নমুনার

Dhaka University Institutional Repository

আকার—১) অর্থাৎ ২৯ স্বাধীনতার মাত্রায় যথাক্রমে ২·৭৫৬ ও ২·০৪৫ এইক্ষেত্রে ১% যথার্থতার স্তরে হিসাবকৃত মান অগ্রাহ্য। অতএব, ধরে নেওয়া যায় যে, সমস্ত ছাত্রছাত্রীর প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে যোজিত গড় নম্বর হবে ৩০।

খ· দু'টো ভিন্ন তথ্যবিশ্বের গড়মানের তুলনা।

ধরে নেওয়া গেল দু'টো তথ্যবিশ্ব থেকে দু'টো নমুনার আকার n_1 এবং n_2 স্বাধীন ভাবে নেওয়া গেল; তথ্যবিশ্বগুলো পরিমিত বিন্যাসকৃত [normally distributed] এর পরামানের গড় যথাক্রমে μ_1 এবং μ_2 ও পরিমিত বিস্তার যথাক্রমে σ_1 এবং σ_2 ,

পরীক্ষার জন্যে সমতার অনুমান

$Ho : \mu_1 = \mu_2$.

$Hi : \mu_1 \neq \mu_2$ অর্থাৎ $\mu_1 < \mu_2$ নতুবা $\mu_1 < \mu_2$

১ম পর্যায় :—

যখন তথ্যবিশ্বগুলোর পরিমিত বিস্তার σ_1 ও σ_2 [সিগমা] জানা যাবে অথবা নমুনার আকার ৩০ এর বেশী ও শেষের ক্ষেত্রে পরামানের বিস্তার-নমুনার বিস্তার দ্বারা প্রদর্শিত হবে।

উদাহরণ :— ধরা যাক শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল বিষয়ে শতাধিক ছাত্রছাত্রী আছে। শুধু ৪০ জন ও ৪৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে যথাক্রমে দুই পদ্ধতিতে একই বিষয়ে পড়ানোর পর যাচাই করা দরকার দুই পদ্ধতিতে পড়ানোর মধ্যে কার্যকারিতার কোন তফাৎ পরিলক্ষিত হয় কিনা।

তথ্যগুলো নীচে দেওয়া হল—

পদ্ধতি 'ক'		পদ্ধতি 'খ'	
ছাত্রছাত্রী সংখ্যা	$n_1 = ৪০$	ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	$n_2 = ৪৫$
নমুনার গড়	$\bar{x}_1 = ৩২$	নমুনার গড়	$\bar{x}_2 = ৩০$
পরিমিত বিস্তার σ_1	$= S_1 = ৬$	পরিমিত বিস্তার σ_2	$= S_2 = ২$

এই ক্ষেত্রে

$$Z = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \qquad S_1 = \sqrt{\frac{\Sigma(X_1 - \bar{X}_1)^2}{n_1 - 1}} = \sqrt{\frac{\Sigma(\text{১ম নমুনার প্রত্যেকমান—১ম নমুনার গড়})^2}{(\text{১ম নমুনার আকার}-১)}}$$

$$= \frac{৩২-৩০}{\sqrt{\frac{৬^2}{৪০} + \frac{২^2}{৪৫}}} \qquad S_2 = \sqrt{\frac{\Sigma(X_2 - \bar{X}_2)^2}{n_2 - 1}} = \sqrt{\frac{(\text{২য় নমুনার প্রত্যেকমান}-\text{২য় নমুনার গড়})}{\text{২য় নমুনার আকার}-১}}$$

$$= \frac{২}{\sqrt{০·৯+০·০৮৮}} = \frac{২}{\sqrt{০·৯০৮}} = \frac{২}{০·৯৯৪} = ২·০১২,$$

এটা দুই প্রান্ত ভিত্তিক যাচাই

∴ $|Z| = ২·০১$, এইমান ১% যথার্থতার স্তরে ২·৫৭৬ থেকে বেশী; কাজেই অগ্রাহ্য। অর্থাৎ দু'টো পদ্ধতির কার্যকারিতার তফাৎ আছে।

ঘ· দুইটি বিষয়ের মধ্যে বৈষম্যতা (Variability) দেয়ার জন্যে F —যাচাই ব্যবহৃত হয়।

এখানে, সমতার অনুমান —$Ho : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$

বিকল্প অনুমান —$H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$ বা $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$

দুই ক্ষেত্রে নমুনার আকার যথাক্রমে n_1 এবং n_2 ; স্বাধীনতার মাত্রা $v_1 = (n_1 - 1)$ ও $v_2 = (n_2 - 1)$ এবং বর্গাকৃতি বিস্তার যথাক্রমে σ_1^2 এবং σ_2^2 ।

$$\therefore F \text{ যাচাই} = \frac{S_1^2 \; (v_1)}{S_2^2 \; (v_2)}$$

S_1 এবং S_2 যথাক্রমে σ_1 এবং σ_2 এর নমুনা থেকে পরিমাণকৃত পরিমিত বিস্তারের মান। (estimated value)

উদাহরণ :—ধরা যাক, শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল বিষয়ে ৩০ জন ছাত্রছাত্রী সম্বলিত দুই শাখায় একই বিষয়ে পড়ানো হল। দেখা গেল যে, ঐ দুই শাখার ছাত্রছাত্রীদের পরিমিত বিস্তারের মান যথাক্রমে ৩·৮ ও ২·০৪। এ থেকে কি করে বলা যায় যে, দুই শাখার প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে কোন বৈষম্যতা আছে !

Dhaka University Institutional Repository

$$F=\frac{(৩\cdot৮)^২}{(২\cdot০৪)^২}=\frac{১৪\cdot৪৪}{৪\cdot১৬}=৩\cdot৪৭$$

স্বাধীনতার মাত্রা ১ম ক্ষেত্রে $(\nu_১)=n_১-১, =৩০-১=২৯$

২য় ক্ষেত্রে $(\nu_২)=n_২-১, =৩০-১=২৯$

এটা দুই প্রান্ত ভিত্তিক যাচাই

এখন F তালিকায় সারির দিকে $(\nu_১)=২৯$ এবং কলামের দিকে $(\nu_২)=২৯$ ধরে ও ১০% যথার্থতার মাত্রায় তালিকা থেকে প্রাপ্তমান হিসাবকৃত মান থেকে বেশী।

কাজেই, এক্ষেত্রে বলা যায় যে, সমতার অনুমান অগ্রাহ্য অর্থাৎ দু'টো শাখার প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে বৈষম্যতা আছে।

এখানে অনুমান হল পিতার শিক্ষার মাত্রার সাথে পুত্রের উচ্চ-শিক্ষার মাত্রার সম্পর্ক নির্ণয়—

কাইবর্গ যাচাই ঃ

$$\lambda^২=\sum\frac{\left\{\begin{matrix}\text{কোন ঘরে উহার পর্যবেক্ষিত ঘটন সংখ্যা (oi)}\\ \text{—ঐ ঘরে প্রত্যাশিত ঘটন সংখ্যা (Ei)}^২\end{matrix}\right\}}{\{\text{ঐ ঘরে প্রত্যাশিত ঘটন সংখ্যা (Ei)}\}}$$

$$=\sum\frac{(Oi-Ei)^২}{Ei}$$

$$=\frac{(১০-৭\cdot১)^২}{৭\cdot১}+\frac{(৭-৮\cdot৫)^২}{৮\cdot৫}+\frac{(৬-৭\cdot৪)^২}{৭\cdot৪}$$

$$+\frac{(৫-৬\cdot২)^২}{৬\cdot২}+\frac{(৮-৭\cdot৪)^২}{৭\cdot৪}+\frac{(৭-৬\cdot৫)^২}{৬\cdot৫}$$

$$+\frac{(৫-৬\cdot৭)^২}{৬\cdot৭}+\frac{৯-৮\cdot১)^২}{০৮\cdot১}+\frac{(৮-৭\cdot১)^২}{৭\cdot১}$$

$=১\cdot১৮+০\cdot২৭+০\cdot২৭+০\cdot২৩+০\cdot০৫+০\cdot০৪+০\cdot৪৩+০\cdot১৫+$
$০\cdot১১ \quad =২\cdot৭৩$

এখন স্বাধীনতার মাত্রা $=(৩-১)\ [৩-১]$ অর্থাৎ $(৩-১)$ $(৩-১)$ বা ৪। ৪ স্বাধীনতার মাত্রায় ও ৫% যথার্থতার স্তরে হিসাবকৃত মান তালিকা মান থেকে কম। এ ক্ষেত্রে সমতার অনুমান অগ্রাহ্য নহে।

এখানে বলা যায় যে, পিতার উচ্চ শিক্ষার মাত্রার উপর পুত্রের উচ্চশিক্ষার মাত্রা নির্ভর করে না।

(গ) নির্ভরশীলতা পরীক্ষা করার জন্য কাই বর্গ যাচাই করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি মনে করা হয়, পিতাদের শিক্ষার মানের উপর তাদের ছেলেদের শিক্ষার মান নির্ভর করে কিনা, তখন কাই-বর্গ যাচাই করতে হবে। একদিকে পিতার শিক্ষার মাত্রা (ধরা যাক সারির দিকে), অন্যদিকে ছেলেদের শিক্ষার মাত্রা (ধরা যাক কলমের দিকে) রাখা হয়। মোট সারির সংখ্যা r এবং কলাম সংখ্যা c হলে মোট r×c ঘর তথ্যের দরকার হবে। তবে কোন ক্ষেত্রেই কোন ঘরে ঘটনসংখ্যা ৫ এর কম হলে চলবে না।

উদাহরণ ঃ—

ধরা যাক, পিতার উচ্চ শিক্ষার মাত্রার উপর পুত্রের উচ্চশিক্ষার মাত্রা নির্ভর করে কিনা জানার জন্য একটা সামঞ্জস্যতা তালিকা (Contingency table) তৈরী করা হল।

ছেলের শিক্ষার মাত্রা / পিতার শিক্ষার মাত্রা	এস.এস.সি ম্যাট্রিক	স্নাতক ডিগ্রী	স্নাতকোত্তর ডিগ্রী	মোট
এস.এস.সি ম্যাট্রিক	১০ $\frac{২০\times২৩}{৬৫}=৭\cdot১$	৭ $\frac{২৪\times২৩}{৬৫}=৮\cdot৫$	৬ $\frac{২১\times২৩}{৬৫}=৭\cdot৪$	২৩
স্নাতক ডিগ্রী	৫ $\frac{২০\times২০}{৬৫}=৬\cdot২$	৮ $\frac{২৪\times২০}{৬৫}=৭\cdot৪$	৭ $\frac{২১\times২০}{৬৫}=৬\cdot৫$	২০
স্নাতকোত্তর ডিগ্রী	৫ $\frac{২০\times২২}{৬৫}=৬\cdot৭$	২ $\frac{২৪\times২২}{৬৫}=৮\cdot১$	৮ $\frac{২১\times২২}{৬৫}=৭\cdot১$	২২
মোট	২০	২৪	২১	৬৫

Dhaka University Institutional Repository

$$= \frac{-১২}{২৬ \times ·২৬}$$

$$= \frac{-১২}{৬·৭৬}$$

$$= -১·৭৮$$

$$|t| = ১·৭৮$$

ইহা দুই প্রান্তভিত্তিক যাচাই।

এই মান ৫% যথার্থতার স্তরে ও (৩০+৩০−২) বা ৫৮ স্বাধীনতার মাত্রার তালিকা মান থেকে কম। কাজেই সমতার অনুমান অগ্রাহ্য নয়। অর্থাৎ, দুই পদ্ধতিতে পড়ানোর মধ্যে কার্যকারিতার কোন তফাৎ নেই।

পরিমাপ ও মূল্যায়ণ

অতি সম্প্রতি শিক্ষাকে বিজ্ঞানরূপে অভিহিত করা হয়। তবে শিক্ষার একটি প্রয়োগমুখী দিকও আছে। শিক্ষার বিজ্ঞানমূলক ও প্রয়োগমূলক এই দুই প্রকারের অর্জিত জ্ঞান পরিমাপ করা দরকার। গতানুগতিক 'পরিমাপ পদ্ধতির' পরিবর্তে 'মূল্যায়ণ পদ্ধতি' এই কথাটির ব্যবহার অধিক যুক্তি সঙ্গত বলে পরিসংখ্যানবিদরা মনে করেন।

পরিমাপ এবং মূল্যায়ণ এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে উদ্দেশ্যগত বা প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য নেই। দুই প্রক্রিয়ার সাহায্যেই শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান পরিমাপ করা হয়। পার্থক্যটি প্রধানতঃ পরিধিগত ও পদ্ধতিগত। মূল্যায়ণ অধিকতর ব্যাপক এবং গভীর। পরিমাপ সীমাবদ্ধ প্রকৃতির এবং সীমিত আকারের। পরিমাপের সাহায্যে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান বা বিশেষ কোন ক্ষেত্রে দক্ষতা মাপা হয়। যেমন, কোন শিক্ষার্থী বাংলা বা ইংরেজীতে কতটা জ্ঞান অর্জন করল, ভাষা বা সঙ্গীতে তার কতটা দক্ষতা আছে, এ ধরনের কোন জ্ঞান, যোগ্যতা বা দক্ষতা পরিমাপের সাহায্যে নির্ণয় করা হয়। অভীক্ষার সাহায্যে এসবের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। অন্যদিকে মূল্যায়ণের কাজ সুদূর প্রসারী এবং গভীর। শিক্ষা মানুষের মনোবৃত্তি এবং ব্যক্তি

উপরের তালিকার প্রত্যেক ঘরে ঘটনসংখ্যাগুলোকে পর্যবেক্ষিত ঘটন সংখ্যা বলে। এখন তাদের প্রত্যাশিত ঘটন সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে। প্রত্যেক পর্যবেক্ষিত ঘটন সংখ্যার জন্য এর সারির প্রান্তে মোট ঘটন সংখ্যাকে উহার কলাম প্রান্তে মোট ঘটন সংখ্যা দিয়ে গুণ করে পরে গুণফলকে সর্বমোট ঘটন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে, প্রত্যাশিত ঘটন সংখ্যা পাওয়া যাবে ও প্রত্যেকটা ঘরে তা দেখানো হয়েছে।

২য় পর্যায় ঃ—

যখন তথ্যবিশ্বগুলোর পরিমিত বিস্তার অজানা এবং সমান মনে করা হয় ও নমুনা ৩০ অপেক্ষা কম।

উদাহরণ ঃ—

ধরা যাক, শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল বিষয়ে শতাধিক ছাত্রছাত্রী আছে। প্রতিবারে ৩০ জন ছাত্রছাত্রীর একই দলকে দুই পদ্ধতিতে একই বিষয়ে পড়ানো হল। দুই পদ্ধতিতে পড়ানোর কার্যকারিতায় কোন তফাৎ আছে কিনা যাচাই করা দরকার।

তথ্যগুলো নীচে দেওয়া গেল—

পদ্ধতি 'ক'	পদ্ধতি 'খ'
ছাত্রছাত্রী সংখ্যা $n_১ = ৩০$	ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা $n_২ = ৩০$
নমুনার গড় $\bar{X}_১ = ১৮$	নমুনার গড় $\bar{X}_২ = ৩০$
নমুনার পরিমিত বিস্তার $S_১ = ৪$	নমুনার পরিমিত বিস্তার $S_২ = ৬$

যেহেতু নমুনা সংখ্যা অনধিক ৩০, ইহা t যাচাইয়ের মধ্যে হবে।

$$t = \frac{\bar{X}_১ - \bar{X}_২}{s\sqrt{\frac{১}{n_১} + \frac{১}{n_২}}}$$

যখন $s = \frac{(n_২ - ১)s_১^২ + (n_১ - ১)s_২^২}{n_১ + n_২ - ২}$

$$= \frac{(৩০-১)৪^২ + (৩০-১)৬^২}{৩০+৩০-২}$$

$$= \frac{২৯ \times ১৬ + ২৯ \times ৩৬}{৫৮}$$

$$= \frac{২৯ \times ৫২}{৫৮} = ২৬$$

$$= \frac{১৮-৩০}{২৬\sqrt{\frac{১}{৩০} + \frac{১}{৩০}}}$$

$$= \frac{-১২}{২৬\sqrt{·০৭}}$$

Dhaka University Institutional Repository

সত্তার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করে। এইসব পরিবর্তনের মাত্রা, স্বরূপ এবং শিক্ষামূলক কর্মসূচীর নির্ধারিত উদ্দেশ্যমালা কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে তা মূল্যায়ণের সাহায্যে জানা যায়। সাধারণ পরিমাপের চেয়ে মূল্যায়ণের উদ্দেশ্য এবং ক্ষেত্র অনেক ব্যাপকতর। মূল্যায়ণে পরিমাপ প্রক্রিয়াটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মূল্যায়ণের সাহায্যে শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক গুণাবলী বিকাশের অন্যান্য দিকগুলোর পরিমাপ করা হয়।

মনরোর (Monroe) মতে মূল্যায়ণ হল পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য এবং স্বরূপ নির্ণয় করা। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তা বিকাশ পরিমাপের জন্য অভীক্ষা প্রণয়ন করা এবং শিক্ষার্থীর যে ধরনের আচরণের সাহায্যে পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে তার সংজ্ঞা নির্ণয় করা।

গবেষণা ধারাবাহিকতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এমনভাবে পরিচালিত হতে হবে যাতে এর ঘটনা, উদ্দেশ্য সবকিছু বোধগম্য এবং পরিমাপযোগ্য হয়। সহজে বোধগম্যতার জন্য গবেষণার পরিমাপ সংখ্যাসূচক ভাবে প্রকাশ করা হয়। এই সংখ্যাসূচক পরিমাপে চার প্রকার পরিমাপক স্কেল ব্যবহার করা হয়। যথা :—

১। সাধারণ স্কেল বা Nominal Scale
২। পূরণবাচক স্কেল বা Ordinal Scale
৩। বিরাম স্কেল বা Interval Scale
৪। অনুপাত সূচক স্কেল বা Ratio Scale

১। সাধারণ স্কেল :

এই পরিমাপক স্কেলে ব্যক্তি বা বস্তুকে বিভিন্ন শ্রেণী বা Category অনুযায়ী বিভক্ত করে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়। তাতে প্রত্যেক শ্রেণীতে ব্যক্তি বা বস্তুকে সংখ্যা বা শতকরা হারে দেখান হয়। গবেষক শ্রেণী বা category অনুযায়ী ভাগ করে পর্যবেক্ষণ করেন, যেমন, কলেজ শিক্ষকগণকে প্রফেসর, এসোসিয়েট প্রফেসার, এসিস্টেন্ট প্রফেসার, লেকচারার, ইনস্ট্রাক্টর ইত্যাদি শ্রেণীতে ভাগ করে বা পুরুষ মহিলা শ্রেণীতে ভাগ করে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

এই ধরনের পরিমাপের ক্রমবিন্যাস সম্ভব নয়। ক্রমবিন্যাস সম্ভব না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণে এই সংখ্যাসূচক পরিমাপই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

২। পূরণবাচক স্কেল :

অনেক সময় বস্তুর মধ্যে বৈশিষ্ট্যে এমন কিছু পরিমাণগত পার্থক্য দেখা যায় যার ফলে তাকে পৃথক শ্রেণীর বস্তু এটাও বলা যায় না আবার তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই তাও বলা যায় না। এমতাবস্থায় বৈশিষ্ট্যের পরিমাণে কিছু কম বা কিছু বেশী ধরে যে পরিমাপ করা হয় তাই পূরণ বাচক স্কেলে দেখান হয়। এতে একই দলের বা category এর বস্তুর পার্থক্যকে ১ম, ২য়, ৩য় ইত্যাদি আপেক্ষিক মানে প্রকাশ করা হয়। এরূপ পরিমাপে পার্থক্যের পরিমাপ কখনও সমান হতে পারে, আবার কখনও সমান নাও হতে পারে।

৩। বিরাম স্কেল :

সমান এককের ব্যবধানের বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতিতে কতটা কম বা বেশী হয় তা এই স্কেলে পরিমাপ করা হয়। এই স্কেলে সমান এককের ব্যবধানে পার্থক্যের পরিবর্তনকে সমান ধরে নেওয়া হয়। যেমন ৯০—৯১ এর ব্যবধানে পার্থক্যের পরিবর্তনকে এবং ৫০ থেকে ৫১ এর ব্যবধানে পার্থক্যের পরিবর্তনকে একই সমান ধরে নেওয়া হয়। বিরাম স্কেলের পরিমাপে একটির সঙ্গে অপরটির যোগ বা বিয়োগ করা যায় কিন্তু একটির সঙ্গে অপরটির পরিপূরক বা আনুপাতিক কোন সম্পর্ক নেই।

৪। অনুপাত সূচক স্কেল :

বিরাম স্কেলের বৈশিষ্ট্যসহ আরও ২টি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই স্কেল গঠিত। অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য ২টি নিম্নরূপ :—

ক, এই স্কেলে শূন্যের একটি কাল্পনিক মান এবং সত্যতা আছে। সাধারণতঃ 'শূন্য' কোন বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিকে বুঝায়। সেন্টিমিটার স্কেলে 'শূন্য' উচ্চতার অনুপস্থিতিকে নির্দেশ

Dhaka University Institutional Repository

করে। কিন্তু ফারেনহাইট স্কেলে 'শূন্য' তাপমাত্রার অনুপস্থিতিকে নির্দেশ করে না। এই স্কেলে শূন্যের একটা ঐচ্ছিক কল্পিত মান আছে।

খ, অনুপাতিক স্কেলের পরিমাপে সংখ্যা সমূহের প্রকৃত সংখ্যা গুণ রয়েছে। তাই এই স্কেলের পরিমাপ সংখ্যারযোগ, বিয়োগ গুণ ভাগ করা যায়। যেমন, ১৫ গ্রাম ৫ গ্রামের চেয়ে দশগ্রাম বেশী, এতে যেমন পরিমাপ সংখ্যার মধ্যে যোগ বিয়োগ করা যায়, তেমনি ১৫ গ্রাম ৫ গ্রামের ৩ গুণ এতে পরিমাপ সংখ্যার মধ্যে গুণ ভাগ করা যায়।

(তথ্য সংগ্রাহক উপকরণ অধ্যায়টি দেখুন)

দ্বাদশ অধ্যায়
গবেষণার গঠন ও আকৃতি

গবেষণার কৌশলগত আকৃতিতে তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে যেমন—প্রাথমিক পর্যায় বা ভূমিকা, গবেষণার মূল বিষয় এবং সহায়ক বিষয়াদি। এইসব বিষয়গুলি নিম্নলিখিত ভাবে সাজানো হয়ঃ

১। প্রাথমিক পর্যায়ঃ

ক. নাম করণ পৃষ্ঠা।
খ. অনুমোদিত পত্র।
গ. ভূমিকা (Preface) এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার (যদি থাকে)।
ঘ. বিষয় বস্তুর তালিকা (যদি থাকে)।
ঙ. সূচীপত্র।
চ. আকৃতির তালিকা (যদি থাকে)।

২। গবেষণার পুস্তকঃ

ক. পরিচিতি অধ্যায় বা অধ্যায় সমূহ।
খ. পাঠ্য বিষয়ের প্রতিবেদন, অধ্যায় সমূহের যথার্থ শ্রেণী বিভাগ। এবং অধ্যায় সমূহের সারাংশ।

৩। সহায়ক উপকরণসমূহঃ

ক. গ্রন্থপঞ্জী (কোন কোন গবেষণায় পরিশিষ্ট গ্রন্থপঞ্জীর আগে থাকে)।
খ. পরিশিষ্ট বা পরিশিষ্টসমূহ (যদি থাকে)।
গ. সূচীপত্র (যদি থাকে)।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা পত্রের ক্রমিক সংখ্যা ঃ

গবেষণা পত্রের প্রতিটি পাতায় ক্রমিক সংখ্যা থাকবে। অবশ্য প্রতিটি পাতাতেই যে নম্বর থাকবে তা নয়। পৃষ্ঠার নম্বরের দুটো পৃথক ধরন বা অনুক্রম থাকবে। প্রথম হল—ছোট রোমান সংখ্যা যা শুরু হবে নামকরণ পৃষ্ঠা থেকে এবং শেষ হবে প্রথম অধ্যায়ের পূর্ব পৃষ্ঠা পর্যন্ত। দ্বিতীয় অনুক্রম আরবীয় সংখ্যায় শুরু হবে—প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাতা থেকে এবং শেষ হবে গ্রন্থপঞ্জী এবং পরিশিষ্ট পর্যন্ত।

গবেষণার যে কোন বড় অংশের প্রথম দিকের পাতা যেমন—নাম করণ পৃষ্ঠা, সূচীপত্রের তালিকার প্রথম পৃষ্ঠা এবং যে কোন অধ্যায়ের প্রথম পাতায় কোন পৃষ্ঠা নম্বর দেওয়া যাবে না। তবে পৃষ্ঠার নম্বর সংখ্যা অনুক্রমে দেওয়া বা রাখা যাবে। উদাহরণ স্বরূপ--প্রথম অধ্যায়ের শেষ পৃষ্ঠা নম্বর হল ১৯ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাতার নম্বর ২০ কিন্তু এ দুটো পাতায় আদৌ কোন পৃষ্ঠা নম্বর থাকবে না। কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাতায় নম্বর দিতে হবে ২১। নম্বরগুলো সাধারণতঃ মার্জিনে ডানদিকে লেখা হয়।

গবেষণার প্রারম্ভিক পর্যায় ঃ

নামকরণ পৃষ্ঠা ঃ

গবেষণা পত্রে প্রথম পাতাই হবে নামকরণ পৃষ্ঠা। যদিও বই বাধাঁনোর সময় এই নামকরণ পৃষ্ঠা এবং মলাটের মাঝখানে একটা সাদা পৃষ্ঠা দেওয়া হয়। কিন্তু প্রথম মুদ্রণ পৃষ্ঠায় থাকে এই নাম করণ পাতা। নামকরণ পৃষ্ঠার ধরন সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের বুলেটিন দ্বারা নির্দেশিত থাকে। এতে গবেষণার নাম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও মর্যাদা—যেখানে গবেষণা পত্রটি জমা দেওয়া হয়েছে। যে ডিগ্রীর জন্য গবেষণাটি করা হয়েছে তার নাম, যিনি গবেষণাটি করেছেন তার পুরো নাম, যে মাসে এবং বছরে ডিগ্রীটি প্রদান করা হয়েছে তার সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত হবে।

নামকরণটা সংক্ষিপ্ত, সঠিক এবং বোধগম্য হতে হবে। এর শব্দগুলো এমন হবে যাতে গবেষণার বিষয়টাকে বোঝা যায়। এতে

যেন কোন আলোচনা বা অনুসন্ধানের অবকাশ না থাকে। এক্ষেত্রে একটি ভালো পদ্ধতি হলো—নামকরণের মধ্যে যে সব শব্দ এবং শব্দগুচ্ছ অন্তর্ভুক্ত থাকবে সেগুলি পরিশিষ্ট পর্যায়ে সন্নিবেশিত করলে অন্যান্য গবেষকরা সহজেই সেই শব্দের বা উপকরণ সমূহের অর্থ বা উৎস খুঁজে পাবেন। সার্থক নামকরণ সাধারণতঃ তিন বা চারটি প্রধান শব্দ বা শব্দসমূহ সমন্বয়ে গঠিত হয়। নাম করণ এমন স্বচ্ছ ও পরিস্কার হওয়া দরকার যাতে প্রথম দৃষ্টিতেই অর্থটা বোঝা যায়। তাছাড়া নামকরণে অসামঞ্জস্য শব্দ পরিহার করে শ্রুতিমধুর শব্দ সংযোজন করা বাঞ্ছনীয়। বিবৃতির ভাষাই নির্দেশ করে কাকে এবং কি ডিগ্রী প্রদান করা হয়েছে। গবেষণার নামটি পৃষ্ঠার মাঝামাঝি জায়গায় থাকবে। লেখকের নাম, মাস, বছর অর্থাৎ (যে সনে ডিগ্রীটা সাধারণতঃ দেওয়া হয়েছে) নাম করণ পৃষ্ঠার নীচের দিকে থাকবে।

অনুমোদিত পত্র ঃ

বিভাগীয় অনুষদ, স্নাতক পরিষদ এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত সার্টিফিকেট ফর্মের উল্লেখ ও নামকরণ পৃষ্ঠায় উল্লেক্ষিত থাকবে। প্রথাগত ভাবে এই গবেষণা পত্রের আকার হবে (৮½×১১ ইঞ্চি) অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই কাজের জন্য মুদ্রিত ফর্ম থাকে। এবং বিভাগীয় সচিব কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়। অনেক সময় অনুমোদিত স্বাক্ষরটি নাম করণ পৃষ্ঠাতেই করার রীতি দেখা যায়। অবশ্য প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী এটা হয়ে থাকে।

সূচনা ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

সূচনা, কৃতজ্ঞতা স্বীকার এবং ভূমিকা সাধারণতঃ গবেষণা পত্রের ক্ষেত্রে সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই ধরনের প্রাথমিক পর্যায়ে বিবৃতির পরিধি, লক্ষ্য এবং সাধারণ বৈশিষ্টগুলি খুবই সংক্ষিপ্তভাবে লেখা হয় এবং তার উপর ভিত্তি করে প্রতিবেদনটি তৈরী হয়। কৃতজ্ঞতা স্বীকারটা কোর্স প্রতিবেদনের পর্যায়ে, স্নাতোকোত্তর পর্যায়ে, আবার একে বাদও দেওয়া যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকারে জানা যায় গবেষক কার কাছে তার কাজের জন্য ঋনী এবং কার কার কাছে বিভিন্ন কাজের জন্য কৃতজ্ঞ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই কৃতজ্ঞতা স্বীকার অতিরঞ্জিত হয়ে যায়। তবে এই কাজটা সাধারণতঃ চতুরতার সাথে করা উচিৎ।

বিষয়সূচী ঃ

বিষয় বস্তুর বিশ্লেষণমূলক তালিকা পরবর্তী পৃথক পরিচ্ছেদে লেখা হয়। বিষয়সূচীর তালিকাতে অধ্যায় উল্লেখ করতে হবে —অর্থাৎ যে কয়টি অধ্যায়ে গবেষণাপত্রটি বিভক্ত। প্রত্যেকটিতে উপরে শিরোনাম ও শ্রেণী বিভাগ এবং পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখিত থাকবে। যাতে পাঠকের বিষয়টি পড়তে সুবিধা হয়।

বিভাগ এবং উপবিভাগের মধ্যে সম্পর্ক খুব পরিস্কার হতে হবে। শিরোনামগুলিও যথার্থ হতে হবে।

সূচী তালিকার শিরোনাম অধ্যায়ের নামকরণ হিসেবে বড় বড় অক্ষরে লিখতে হবে। এর শেষে কোন বিরাম চিহ্ন থাকবে না এবং ধারাবাহিক ভাবে রোমান সংখ্যা বসাতে হবে। শিরোনাম যদি একে লাইনের বেশী হয় তাহলে দ্বিতীয় লাইনটি প্রথম লাইনের প্রথম দুটো অক্ষর বাদ রেখে লিখতে হবে।

প্রধান শিরোনাম ছাড়াও যদি অতিরিক্ত শিরোনাম থাকে তাহলেও প্রধান শিরোনামের প্রথম লাইনের প্রথম দুটি অক্ষরের জায়গা বাদ দিয়ে লিখতে হবে। প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষর এবং সকল বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ক্রিয়া বড় অক্ষরে লিখতে হবে। শিরোনামের প্রতিটি লাইন দ্বিগুণ জায়গা নিয়ে লিখতে হবে। এক্ষেত্রে পৃষ্ঠার নম্বর ডানদিকে থাকবে।

তালিকা সূচী ঃ

সূচীপত্রের তালিকার পর আর একটি পৃথক বিভাগ শুরু হবে। মুদ্রিত পৃষ্ঠা সমূহের তালিকা। প্রত্যেক তালিকায় তালিকা নম্বর, যথাযথ শিরোনাম এবং পান্ডুলিপির পৃষ্ঠা নম্বর থাকবে। গুরুত্বপূর্ণ শব্দের প্রথম অক্ষর বড় অক্ষর হবে।

তালিকা নম্বর সমূহ ধারাবাহিকভাবে বড় রোমান সংখ্যায় লিখতে হবে। এখানেও কোন বিরামচিহ্ন প্রান্ত চিহ্ন (Terminal punctuation) থাকবে না।

চিত্র সূচী ঃ

যদি চিত্র বা গ্রাফ ব্যবহার করা হয় তার জন্য পৃথক সেকশন করতে হবে। এটাও পূর্ববর্তী নিয়মেই করতে হবে। তবে এর নম্বরীকরণ হবে আরবী সংখ্যায়। দশ বা তার বেশী যদি চিত্রসূচী থাকে তাহলে পৃথক ভাবে তালিকা করা ভালো। এমনি যদি ১২টি মানচিত্র, ৭টি লেখচিত্র, দুটি আলোকচিত্র এবং তিনটা ডায়াগ্রাম থাকে তাহলে মানচিত্রের জন্য একটি এবং অন্যান্য গুলির জন্য একত্রে একটি তালিকা করা যায়। মার্জিনের সাথে বড় অক্ষরে চিত্রসূচী, প্লেট বা পাতা ইত্যাদি শিরোনাম হিসাবে বলতে হবে।

গবেষণার মূল বচন ঃ

গবেষণার মূলবচন মূলতঃ প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাতা থেকেই শুরু হয়। এর আগের বিষয়গুলি ছিল প্রাথমিক। অধিকাংশ গবেষণার অধ্যায়গুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত থাকে। সূচনা অধ্যায়, গবেষণার মূল বিষয়, অধ্যায়ের যৌক্তিক বিভাজন এবং সারসংক্ষিপ্ত অধ্যায়। বিষয়বস্তুর সংগঠন এবং শ্রেণী বিন্যাস এমনভাবে করা উচিৎ যাতে প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব থাকে।

সূচনা অধ্যায় ঃ

প্রথম অধ্যায়ে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ থাকবে।

১) অনুসন্ধানকৃত সমস্যার সম্পূর্ণ এবং পরিস্কার বর্ণনা বা গবেষণার উদ্দেশ্য।

২) সমস্যার যথার্থতা বা গুণবিচার—

যার আলোচনার মাধ্যমে কারণ ও গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। এক্ষেত্রে নানা কারণে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। যেমন, শব্দের একক

Dhaka University Institutional Repository

সংজ্ঞা, শব্দ ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা, তথ্য অনুসন্ধানের সময় পাওয়া অপ্রীতিকর ব্যবহার।

৩) গবেষণার অনুমোদিত খসড়া থাকা আবশ্যক। যা দেখে পাঠক সহজেই গবেষণার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে পারবে।

৪) ইতিহাসের পুনরালোচনার মাধ্যমে বর্তমান সমস্যার প্রেক্ষিতে নূতন তথ্য আবিস্কার করা।

গবেষণার বিবরণ ঃ

গবেষণার সংগঠন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া সম্ভব না। কারণ, বিস্তৃত বিষয়ের অনুসন্ধান, বিভিন্ন কৌশল এবং বিভিন্ন ধরনের প্রাপ্ত তথ্যের সবকিছু সন্নিবেশ করা হয়। বলা হয়ে থাকে গবেষণার এই অংশটিই হল মূল গবেষণা (study) এটা হল শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের অবদান। সেইজন্য, গবেষকদের অত্যন্ত যত্নের এবং সতর্কতার সাথে তাদের কার্যাবলীর বিবরণ লিখতে হয়।

চূড়ান্ত অধ্যায় ঃ

এই অধ্যায়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে বর্ণিত বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকবে। অর্থাৎ এটি হবে বস্তু সংক্ষেপ। এখানে লেখক অনুল্লেখিত বিষয়ের বা প্রশ্নোত্তরের কিছুটা উল্লেখ করতে পারেন।

সাধারণ উদ্দেশ্য ঃ

প্রত্যেক অধ্যায়েই কিছু কিছু সূচনা থাকবে। এবং সর্বশেষ অধ্যায়ে একটি বা দুটি অনুচ্ছেদ থাকে।

ক. অধ্যায়টি সমস্যার যে অধ্যায়ের জন্য নির্দিষ্ট সেই অংশের বর্ণনা।

খ. উপকরণ ও গৃহীত পদ্ধতির বর্ণনা।

[illegible] উপসংহারে পুরো অধ্যায়ের [illegible]

সংক্ষেপ থাকে। যা উক্ত অধ্যায়ের অবদান [illegible] আলোকপাত করতে পারে।

অধ্যায়ের নামকরণের জন্য তিনটি একক পদ্ধতি রয়েছে। অধ্যায়ের নাম সাধারণতঃ বড় অক্ষরে বিষয়ের উপরের দিকে কেন্দ্রে লেখা হয়। যদি এই নাম এক লাইনের বেশী হয় তাহলে পূর্বে উল্লেখিত পদ্ধতিতে লিখতে হবে। নামকরণ পরিস্কার হতে হবে যাতে নাম দেখেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা করা যায়। শিক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া দরকার। যখন তারা তাদের বিষয়কে কার্যকরী বা সার্থকভাবে উপস্থাপন করবে তখনই তাদের উপশিরোনাম দেওয়া উচিৎ। তাদের কখনও অপর্যাপ্ত সংগঠনের ক্ষেত্রে খণ্ডিত উপশিরোনাম ব্যবহার করা উচিৎ না। মূলবচনের সম্পূর্ণতার জন্য প্রকৃতপক্ষে সকল উপশিরোনামেরই অপসারন করা যায়। মূলবচনের সম্পূর্ণতা পর্যাপ্ত তথ্যের যোগানের উপর নির্ভরশীল। এক কথায় সব কিছুরই পূর্ণাঙ্গতা থাকতে হবে।

নির্দেশিত উপকরণসমূহ ঃ

গবেষণা মূলক প্রবন্ধে ব্যবহৃত উপকরণাদিতে গ্রন্থপঞ্জী, সূচক এবং পরিশিষ্ট অন্তর্ভুক্ত থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

গবেষণামূলক প্রবন্ধে গ্রন্থপঞ্জীর পৃথক একটি পরিচ্ছেদ থাকে। এরজন্য পৃথক পৃষ্ঠা থাকবে। এটি বড় অক্ষরে লিখতে হবে। এবং মূল বচনের সাথে একইভাবে আরবীয় সংখ্যায় পৃষ্ঠা নম্বর দিতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জী শব্দটি সূচীপত্রের উপরে মার্জিনের বাঁ দিকে বড় অক্ষরে লিখতে হবে। অনেক সময় ছোট প্রতিবেদনে সমস্যা হয়। সেক্ষেত্রে কিছু তালিকা গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লেখ করা হয়। কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গবেষকদের বিষয়বস্তু শুরু করার আগেই গ্রন্থপঞ্জী উল্লেখ করার অনুমতি দান করে। অনুমোদিত থিসিস অনুশীলনে গ্রন্থপঞ্জী মূলবচনের শেষেই উল্লেখিত থাকে যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ঃ

খুব লম্বা উদ্ধৃতি, সমর্থিত সঠিক সিদ্ধান্ত অথবা আইন, যথাযথ নমুনা (document) যা পাঠকদের জানা সম্ভব না—সেগুলো পরিশিষ্টে উল্লেখ করতে হবে। অতিরিক্ত বিস্তৃত উপকরণ ফর্মের মত করে তথ্য বা নমুনার আকারে পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পরিশিষ্টের মাধ্যমে থিসিসের তথ্য সমূহের যথার্থতা বোঝা যায়। এখানেও উপকরণের বৈশিষ্ট অনুযায়ী উপ বিভাগ করা যেতে পারে।

সূচক ঃ

অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে Declared Candidate তাদের গবেষণার বিষয়কে বস্তুসংক্ষেপাকারে আলাদাভাবে তৈরী করে জমা দিতে হয়। বিষয় সংক্ষেপে থাকবে ঃ—

১. সমস্যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।
২. তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও কার্য্যধারার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।
৩. গবেষণার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম।

এখানে অবশ্য গ্রন্থপঞ্জী উল্লেখের প্রয়োজন নেই। স্থানীয় রীতি অনুযায়ী সাধারণতঃ বস্তুসংক্ষেপের পরিধি (Length) এবং গবেষণার কপি সংখ্যার উপর নির্ভর করে থিসিস কমিটি বা বিভাগীয় সচিব ঠিক করে দেন এটা কিভাবে লেখা হবে। এতেও থিসিসের মত নামকরণ পৃষ্ঠা থাকে। তবে ব্যাতিক্রম হল এই যে এখানে লিখতে হবে 'থিসিসের বিকল্প (Substitute) থিসিসের বস্তুসংক্ষেপ'।

টার্ম পেপার বা সেমিনার রিপোর্ট পদ্ধতি ঃ

টার্ম বা সেমিনার পেপারকে ছোট থিসিস (Baby thesis) মনে করা হয়। এতেও থিসিসের মত সব কিছুই থাকে। যেমন—কৃতজ্ঞতা স্বীকার, পরিশিষ্ট, সূচক ইত্যাদি।

যদি বর্ণনাটি [illegible] জটিল হয় তাহলে সূচীপত্র পাঠককে বিষয় [illegible] করতে সাহায্য করবে [illegible]

যাচ্ছে। টার্ম পেপারের যথাযথ শ্রেণী বিভাগ পাঠককে থিসিসের ধরন সম্বন্ধে একটা ধারণা দিতে পারে।

টার্ম পেপার, সেমিনার রিপোর্ট, থিসিসে একই ধরনের নিয়ম ও রীতি বর্তমান। এই বইটিকে মূল নির্দেশক হিসাবে ধরে প্রতিটি শ্রেণী শিক্ষকের উচিৎ এই ধরনের প্রবন্ধের প্রকৃত ধরন কেমন হওয়া দরকার তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া।

সারণী

সংগৃহীত তথ্যকে সংক্ষিপ্ত আকারে অর্থবহ করে প্রকাশ করার প্রক্রিয়াকে সারণীকরণ বলা হয়। সংক্ষিপ্ত আকারে সাজানো তথ্যমালাকে সারণী বলে। সাধারণতঃ বিষয়ধর্মী তথ্য অত্যন্ত দীর্ঘ হয় এবং এর থেকে কোন নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসুবিধাজনক। এই সমস্ত অসুবিধার জন্য বিবরণ ধর্মী তথ্য ছকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ছকের মাধ্যমে তথ্য পরিবেশনের এই পদ্ধতিকে ছক বিন্যাস বলে। 'ছক' বিবরণ অপেক্ষা অনেক সংক্ষিপ্ত এবং সারীকরণের ফলে বিবরণীর বৈশিষ্ট্য অনেক ক্ষেত্রেই স্বপ্রকাশিত হয়। এইজন্য ছককে সারণী নামেও অভিহিত করা হয়। তথ্যের পরিমাণ প্রকৃতি ও বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যের উপরে ছকের আকৃতি নির্ভর করে। তবে যে কোন ছক বা সারণী প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে কয়েকটি পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত।

১. যেকোন ছকের শুরুতে একটি ছকশীর্ষ (title) থাকবে, যার দ্বারা অত্যন্ত সংক্ষেপে বিবরণীর স্থান, কাল, বিষয় ইত্যাদি প্রকাশ করা যায়।

২. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কোন বিষয় ব্যাখ্যাকারী মন্তব্য ছকের মূল অংশের নীচে থাকবে।

৩. এর দ্বারা বিবরণীর সংখ্যা ভিত্তিক বৈশিষ্ট্যগুলো জানা যায়। সেজন্য এটিই হল ছকের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা সহজে বোধগম্য এবং আত্মব্যাখ্যাবহ।

গবেষণা হল পান্ডিত্যপূর্ণ বিবরণী এবং এর [illegible] সারণীর মাধ্যমে এমন সুন্দর ভাবে [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

পড়ে তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে। যখন সহজ, সরল বিবরণী বোঝার পক্ষে যথেষ্ট, তখন চিত্র বা সারণীর প্রয়োজন হয় না। অনেক সময় একটি সারণীতে অনেক গুলো তথ্য দেওয়ার চেয়ে বিভিন্ন সারণী ব্যবহার করা শ্রেয়। সারণী যদি অর্ধপৃষ্ঠার চেয়ে বড় হয় তবে আলাদা পৃষ্ঠায় দিতে হবে, এবং সতর্কতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উপস্থাপন করতে হবে। যদি ছোট হয় অর্থাৎ অর্ধ পৃষ্ঠার কম হয় তবে একে বস্তুর উপকরণের পৃষ্ঠায় যদি স্থান থাকে তবে স্থাপন করতে হবে নতুবা পরের পৃষ্ঠায়। —বিষয়বস্তুর আলোচনা যেখানে শেষ হবে তার নীচেই এ সম্পর্কিত সারণী স্থাপন করতে হবে। বিষয় বস্তুর পৃষ্ঠায় স্থান থাকা সত্ত্বেও সারণীর আকারের অসুবিধার জন্য পরের পৃষ্ঠায় সারণী স্থাপন করা যায়। বিষয় বস্তুর প্রসঙ্গ সনাক্ত করতে হবে নম্বর যুক্ত সারণী দ্বারা। 'উপরোক্ত সারণী' বা 'নিম্নের সারণী' এভাবে প্রকাশ করা যাবে না। যেমন, নিম্নের সারনীতে দেখানো যাচ্ছে যে এটা বলার চেয়ে ১ নং সারণীতে দেখানো যাচ্ছে যে—এটা বলা অনেক সহজ, উপরন্তু এটা অনেক সঠিক।

সারণী পান্ডুলিপির পৃষ্ঠার আকারের চেয়ে বড় না হওয়া শ্রেয়। বড় আকারের সারণী ফোল্ড (ভাঁজ) করে রাখতে হবে এবং যাতে সহজে ভাঁজের পর ভাঁজ হয়ে না যায় এবং স্থানান্তরিত না হয় সে বিষয়ে সচেতন হতে হবে। বড় সারণী বিশেষ পদ্ধতিতে পান্ডুলিপির পৃষ্ঠার আকারে রূপান্তরিত করাই বিধেয়। সারণীর আকার সংকোচনে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তথ্যগুলো অপাঠ্য না হয়। একটি সারণীর মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে। অর্থাৎ, একই ধরনের তথ্য একটি সারণীতে উপস্থাপন করতে হবে। একটি সারণীতে যে বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত থাকে তা পরিস্কার ভাবে বোঝার জন্য বইতে এর আলোচনা ও ব্যাখ্যা দেওয়া থাকে। কাজেই সারণীটি আলোচিত অংশের খুব কাছাকাছি কোথাও থাকবে। কোন অবস্থাতেই একটি সারণী কোন বিষয়ের আলোচনার পূর্বে যাবে না। যদি সারণীটি ছোট হয় এবং প্রথম পৃষ্ঠার যেখানে বিষয়ের আলোচনা হয়েছে, সেখানে স্থান না পায় তাহলে এটা পরের পৃষ্ঠায় প্রথম অনুচ্ছেদের পর স্থান পাবে। পৃষ্ঠার শুরুতেই ছোট সারণী ভাল দেখা যায় না।

সারণীর শিরোনাম :

থিসিসে সারণী সম্পর্কে উল্লেখ করার পর পরই সারণী দিতে হবে। 'সারণী' শব্দটি পৃষ্ঠার মার্জিনের মাঝখানে রেখে টাইপ করতে হবে এবং এর সঙ্গে সারণীর ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে। পরিশিষ্টে যে সমস্ত সারণী দেওয়া হয় সেগুলোর বেলায়ও একই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। প্রতিটি সারণীর একটি সংক্ষিপ্ত এবং সারণীর বিষয়বস্তু সহজে বোধগম্য হয় এইভাবে শিরোনাম দিতে হবে। শিরোনাম স্পষ্ট অক্ষরে, কোন একটি পৃষ্ঠায় বর্ণিত বিষয়-বস্তুর ঠিক মাঝামাঝি এবং 'সারণী' শব্দটির দু'লাইন বাদ দিয়ে লিখতে হবে। যদি শিরোনামের জন্য দুই বা ততোধিক লাইনের প্রয়োজন হয় তাহলে শিরোনাম উল্টানো পিরামিড 'inverted pyramid, বা 'B—Form' আকারে লিখতে হবে। অর্থাৎ শিরোনামের প্রথম লাইনটি অধিকতর দীর্ঘ হবে এবং পরের লাইনগুলো প্রথম লাইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসবে। প্রধান শিরোনাম হবে সংক্ষিপ্ত যা স্বভাবতই উপস্থাপিত তথ্যের প্রকৃতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেবে। সংক্ষিপ্ত প্রধান শিরোনামের পরিপূরক হিসাবে মাঝে মাঝে উপ শিরোনাম ব্যবহার করা যায়। এখানে তথ্যের উৎস হিসাবে কিছু অতিরিক্ত নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে।

উলম্ব রেখার মধ্যবর্তী স্থানের শিরোনাম :

উলম্ব রেখার মধ্যবর্তী স্থানে সঠিক তথ্য সম্বলিত সংক্ষিপ্ত আকারের একটি শিরোনাম দিতে হবে। কোন সারণীতে যদি অনেক-গুলো উলম্ব রেখা দিতে হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সুষ্ঠু পর্যালোচনার জন্য এবং লেখনীর সুবিধার্থে উলম্বরেখাগুলোকে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা যেতে পারে। সারণী সংখ্যার প্রথম সংখ্যাটি অধ্যায় নির্দেশক এবং দশমিকের পরের সংখ্যাটি একই অধ্যায়ের সারণীর ক্রমিক সংখ্যা নির্দেশক। প্রয়োজন বোধে সারণী সংখ্যার ডানপাশে বা সারণী শিরোনামের ডান পাশে ইংরেজী ছোট হাতের বর্ণদ্বারা অথবা তারকা চিহ্নদ্বারা চিহ্নিত করতে হবে এবং সারণী [illegible] হবার পর ব্যবহৃত বর্ণদ্বারা উৎস উল্লেখ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণীর পাদটীকা :

সারণীর নীচে সারণীর পাকটীকা লিখতে হবে, পৃষ্ঠার নীচে নয়, বিষয়বস্তুর পাদটীকার সঙ্গে। নীচের সারির দ্বিতীয় খালি স্থানে প্রথম টীকা আরম্ভ করতে হবে। প্রতিটি টীকার প্রথম লাইনটি, টীকার মধ্যস্থিত একক খালি স্থান এবং প্রতিটি টীকার মধ্যস্থিত দ্বৈত ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে। কারণ তালিকায় পাদটীকার সূচীসমূহে সাধারণতঃ সংখ্যা অনুসরণ করা হয়। আরবী সংখ্যার চেয়ে ছোট বর্ণমালা ব্যবহার করা উচিৎ। লেখনীটির তালিকা সমূহের একটিরও যদি একটির বেশী পাদটীকা না থাকে, 'a' র পরিবর্তে একটা তারকা চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে।

রুলিংঃ

দুইকলম সম্বলিত সারণী সম্পূর্ণ রুল ছাড়া থাকবে। যেমন, ১নং সারণী দ্রষ্টব্য। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে অন্যকোন 'ডাবল রুল' ব্যবহার করা উচিৎ নয়। 'Box heading' এর চার পার্শ্বে খালি জায়গা রাখতে হব। এক শিরোনামের বরাবর নীচে রুল করা অথবা একটা রুলের বরাবর নীচের লাইনে একটা শিরোনাম আরম্ভ করা অভিপ্রেত নয়। গড় এবং সমষ্টির সংখ্যার উপরের লাইনটা কলামের মধ্য দিয়ে যাবে না। একের অধিক পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ সারণীতে সর্বশেষ পৃষ্ঠা বাদে অন্যসব পৃষ্ঠার নীচের লাইনটি বাদ দিতে হবে।

আনুভূমিক লাইন টানা টাইপ রাইটারের সাহায্যে হয়। লম্বালম্বি (উলম্ব) লাইন হাতে টানা হয়। টাইপ রাইটারে ছাপাতে যদি সারণী পৃষ্ঠা অনেক দূর বিস্তৃত হয় তবে সব লাইনই টাইপ রাইটারে টানা উচিত। লম্বালম্বি লাইন টানার জন্য খুব সাবধানে টাইপ রাইটারের ব্যবহার করতে হবে—যদি কলামগুলি ঠিক থাকে অথবা দুইটি স্থান 'space' দূরে হয়।

স্থান করণ :

বিষয়গুলির প্রতিটি শাখার ক্যাপশন, বক্স হেডিং এবং পাদটীকার জন্য যথাযথ স্থান করণ প্রয়োজন। এর জন্য যে সব বিশেষ নিয়মাবলী পালন করতে হবে তা নিম্নরূপ :—

ক. তিন লাইন সমান খালি জায়গা সারণীর উপরে বাদ দিতে হবে এবং নীচেও তাই।

খ. সারণীর প্রধান অংশ টাইপ করতে এক লাইন সমান অথবা দুই লাইন সমান জায়গায় হতে পারে অথবা অধিক জায়গায়ও হতে পারে এবং সব ক্ষেত্রেই যে একরকম হবে তা নয়।

সারণী—১

বাংলাদেশের প্রথম পাঁচসালা ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ও বৃদ্ধির হার।

সাল স্কুলের সংখ্যা	প্রাথমিক স্তরের জনসংখ্যা (লক্ষ)	অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা (লক্ষ)			জনসংখ্যার তুলনায় অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর হার		
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
১৯৭৩	৩৬,৫৭৩	৫৩	৫০	১০৩	৪০	২০	৬০
১৯৭৮	৪৩,৬৩৪	৬০	৫৮	১১৮	৪৭.৬	২১.৪	৬৮
১৯৮০	৪৩,৯৩৬	৬৩	৬১	১২৪	৪৮	২২	৭০

৭৫.৫ ৪০ ৫৮
৭৯.২ ৩৬.৭ ৫৭.২
৭৬.৬ ৩৬ ৫৬.৫

সূত্র : প্রথম, দ্বিবার্ষিক ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা।

পাদটীকা (Foot note)

পাদটীকা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এটি ব্যবহারের একটি বিশেষ নিয়ম রয়েছে। ক্রমিক নম্বর দিয়ে পৃষ্ঠার নীচে কোন অধ্যায় বা প্রবন্ধের শেষে লিখতে হয়। যদি পাতার নিম্নাংশে লিখতে হয় তাহলে থিসিসের বা লেখনীর মূল অংশ থেকে তাকে প্রায় ১½ ইঞ্চি লম্বা লাইনের দ্বারা পৃথক করা প্রয়োজন। তবে পাদটীকা থিসিস বা লেখনীর যে অংশেই লিখিত হোক না কেন—থিসিস বা লেখনীর যে স্থানে পাদটীকা উল্লেখ করা হয় সে স্থানে লাইনের শেষে একটি শীর্ষ সংখ্যা বা super script দিয়ে চিহ্নিত করা হয়।

পাদটীকা মূল লেখনীতে বা থিসিসে ব্যবহৃত উদ্ধৃতি অথবা

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যের পরিচয় প্রদান করে। কৃতজ্ঞতা স্বীকার, ক্রস রেফারেন্স এবং প্রতিবেদনের মধ্যস্থিত কোন আনুসঙ্গিক লেখনীর ব্যাখ্যা হিসাবেও পাদটীকা ব্যবহৃত হয়। থিসিসে গবেষকের লেখনী যুক্তিপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য করে উপস্থাপন করার জন্য বিভিন্ন লেখক ও বিশেষজ্ঞদের মতামত, বক্তব্য বা কোন বিষয়ে তাদের দেওয়া সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়। উদ্ধৃতিটি উদ্ধৃতি চিহ্ন দ্বারা (quotation mark) চিহ্নিত করে দেওয়া প্রয়োজন। যদি কোন থিসিসে বারবার উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয় এবং বার বার বই ও লেখকের নাম উল্লেখ করা হয় তাহলে থিসিসের প্রতি আকর্ষণ কমে যেতে পারে। পাদটীকায় এই সকল উদ্ধৃতির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়। ব্যবহৃত উদ্ধৃতি ১, ২ নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এই নম্বর উদ্ধৃতি যেখানে শেষ হয় সেখানে দেওয়া হয়।

কোন লেখনী ছোট আকারের হলে লেখনীতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে সকল উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়েছে—সেগুলো ক্রমান্বয়ে ১, ২, ৩ করে নম্বর দিয়ে যেতে হয়। লেখনীর শেষে ঐসকল উদ্ধৃতি সমূহের পাদটীকা উপরোক্ত ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী দেওয়া হয়। বড় আকারের থিসিস হলে প্রতি অধ্যায়ের শেষে পাদটীকা দেওয়া যায়। আবার প্রতি পৃষ্ঠায় ব্যবহৃত উদ্ধৃতির পাদটীকা ঐ পৃষ্ঠার নীচে দেওয়া যায়। প্রতি পৃষ্ঠায় পাদটীকা দেওয়ার প্রয়োজন হলে সে পৃষ্ঠার লেখনী ও পাদটীকার মধ্যে একটি লাইন টেনে দিতে হয়। এই লাইনের নীচে পাদটীকা দিতে হয়। একটি পাদটীকার দুই লাইনের মধ্যে অল্প দূরত্ব বা এক লাইন ফাঁক থাকবে (single space) আর দুটো পাদটীকার মধ্যে দুই লাইন ফাঁক থাকবে। পাদটীকায় বইয়ের পূর্ণ বিবরণ থাকে। প্রথমে লেখকের পুরো নাম, বইয়ের নাম, বইয়ের নামের নীচে লাইন টানতে হয়, প্রকাশকের নাম ও প্রকাশনার তারিখ এবং উদ্ধৃতি যে পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া হয়েছে তার নম্বর।

গ্রন্থপঞ্জী

গ্রন্থপঞ্জী কোন একটি প্রতিবেদনের শেষে লিখিত হয়। প্রতিবেদন রচনা করার সময় লেখক যে সমস্ত বই উল্লেখ করেন সেগুলিকে বর্ণানুক্রমিক ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জীর নমুনা

(লিখনকালে) লাইনের প্রারম্ভে যে ফাঁক রাখা হয়	ঝুলানো অংশ—প্রথম লাইন মার্জিনের সাথে সমতলে হবে, দ্বিতীয় লাইন ৫টি স্থান (spaces) বা অক্ষর ফাঁক রেখে হবে।
নামের ক্রম বা বিন্যাস	শেষ প্রথমে হবে (যখন একের অধিক লেখক হবে তখন প্রথম লেখকের শেষ নাম প্রথমে হবে)।
স্থানকরণ	প্রতিবেদনের শেষে হবে—প্রথম লেখকের নাম আক্ষরিক ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ হবে।
বিরাম চিহ্ন সন্নিবেশ	লেখকের নাম। শিরোনাম। প্রকাশনার স্থান : প্রকাশক, প্রকাশনার তারিখ।
পাতার উল্লেখ	৪১৪ পৃঃ (বই বা প্রবন্ধের মোট পৃষ্ঠার নম্বর)।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, punctuation এর স্থানে লেখকের নাম ইংরেজী হলে বড় অক্ষরে, শেষ নাম প্রথমে দিয়ে কমা (,) ও শিরোনামের নীচে রেখা টানতে হবে।

উপরে উল্লেখিত নিয়ম ছাড়াও অতিরিক্ত অন্যান্য নিয়ম অনুসরণ করা হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. **মিলিত লেখক হলে** (Joint authors)

BARZUN, JACQUES and HENRY F. GRAFF, The Modern Researcher. New York : Harcourt, Brace and World, Inc, 1957. 386 pp.

২। **তিন জনের অধিক লেখক হলে** (More than three Authors)

SELLTIZ, CLAIRE et al. Research Methods in Relations. (Rev. in one VOL.) New York: Holt, Rinehart & Winston, Inc, 1959.

৩। **সম্পাদক লেখক হলে** (Editor as Author)

BUROS, OSCARK., ed. The Sixth Men-

Dhaka University Institutional Repository

tal Measurements Yearbook. Highland Park, N. J.: Gryphon Press, 1965. 1163 pp.

৪। লেখকের নাম না থাকলে (Author not given)

Author's Guide. Englewood cliffs, N. J: Prentice-Hall, Inc., 1955. 121 pp.

৫। কমিটি, সংঘ, সংস্থা বা সমাজ প্রকাশনা হলে: (Publication of an Association, Agency, or Society—

এখানে প্রবন্ধের নাম কিংবা প্রতিষ্ঠানের নাম আগে লিপিবদ্ধ হতে পারে। যেমন:

Modern Philosophies of Education, National Society for the Study of Education, Fifty fourth Yearbook, Part 1. Chicago: The university of Chicago Press, 1955. 374 pp.

অথবা

National Society for the Study of Education. Modern Philosophies of Education. Fifty fourth Yearbook, Part 1 Chicago: The University of Chicago Press, 1955. 374 pp

৬। সিরিজের বা অনুক্রমের অংশ হলে (Part of a Series)

TERMAN, LEWIS M. and MELITAH. ODEN. The Gifted Child Grows up. VOL. IV of the Genetic Studies of Genius Series, ed. Lewis M. Terman, Standford, Standford University Press, 1947. 448 pp.

৭। অনুবাদ হলে (A translation)

BEST, JOHN W. Como Investigar en Educatlon. Gonzalvo Mainer, Translater. Madrid: Morata, 1967, 397 pp.

৮। বিশ্বকোষের প্রবন্ধ হলে (Article in an Encyclopaedia)

BANTA, RICHARDE. "New Harmony," Encyclopaedia Britannica, (1968) 16: p. 30

৯। পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত বা সাময়িক পত্রিকার প্রবন্ধ হলে, (Periodical article)—

প্রবন্ধের নাম কোটেশন (" ") চিহ্নের সাহায্যে এবং প্রকাশনার নামের নীচে রেখা টানতে হয়। যেমন:

WALSH, J. HARTT, "Education in 2000 A. D., Nations Schools, 57: 47—51, April, 1956.

১০। Thesis Dissertation এর অংশ হলে:

BEST, JOHN W. An Analysis of Certain selected Factors Underlying the Choice of Teaching as a Profession. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Wisconsin, Madison, 1948.*

*John W. Best, Research in Education, second Edition, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey. Page 301—306.

Dhaka University Institutional Repository

থিসিস লেখার পদ্ধতি ঃ

থিসিস লেখার পদ্ধতি যে ম্যানুয়ালে লিপিবদ্ধ করা থাকে তাকে থিসিস ম্যানুয়েল বা style manual বলা হয়। গবেষণার প্রতিবেদন নানা প্রকারে লেখা যেতে পারে। এটি লেখার ধরাবাঁধা কোন নিয়ম না থাকলেও থিসিস লেখার একটি বিশেষ প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করা অপরিহার্য। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিভাগে তাদের নিজস্ব ম্যানুয়াল থাকে। শিক্ষার্থীদের এইসব ম্যানুয়াল সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে এবং তাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য কি ধরনের ম্যানুয়াল ব্যবহৃত হয় সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। ম্যানুয়ালে উল্লেখিত লেখার ধরন, থিসিসের আকার ইত্যাদি ধারাবাহিক ভাবে অনুসরণ করে থিসিস লেখা প্রয়োজন। গবেষণার কার্যবিবরণী উপস্থাপন, তথ্য বিশ্লেষণ, ফলাফল, সিদ্ধান্ত ও সুপারিশসমূহ থিসিসে লিপিবদ্ধ করতে হবে। থিসিস ম্যানুয়াল অনুযায়ী গবেষণার প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থাকবে।

প্রথম অধ্যায়—এই অধ্যায়ের শিরোনাম হবে "গবেষণার বিবরণ"। এতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকবে।

ভূমিকা, সমস্যার বিবরণ, অনুমিত সিদ্ধান্ত, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা, ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের সংজ্ঞা, সীমাবদ্ধতা ও অসুবিধা সমূহ।

ভূমিকা—গবেষক কেন এবং কিভাবে তার গবেষণার বিশেষ সমস্যাটি নির্বাচন করলেন, কি প্রকারে এই বিশেষ বিষয়টির প্রতি গবেষকের মনোযোগ আকৃষ্ট হল, বিষয় নির্বাচনে অন্য কারো সহায়তা বা অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকলে বা নিজের কোন অভিজ্ঞতা থেকে তার মনে এই সমস্যার উদ্ভব হলে তা লেখা প্রয়োজন। দরকার হলে সমস্যাটির পটভূমি লেখা যেতে পারে।

সমস্যার বিবরণ—এই বিভাগে গবেষক পরিস্কার ভাবে নির্বাচিত সমস্যাটির বিবরণ দেবেন। সমস্যার বিবরণ বর্ণনাকারে, বা প্রশ্নাকারে লেখা যায়। সমস্যার বর্ণনাকারের প্রধান অংশ বা প্রশ্নাকারের প্রধান অংশকে ছোট ছোট বর্ণনাকারে বা প্রশ্নাকারে সাজানো যেতে পারে।

DHAKA METROPOLITON TEACHERS TRAINING COLLEGE DATE........

অনুমিত সিদ্ধান্তঃ

গবেষণার জন্য চিহ্নিত সমস্যার সমাধান কি হতে পারে গবেষক তা অনুমান করে উল্লেখ করবেন। অনুমিত সিদ্ধান্ত প্রচলিত ঘটনাবলীর সহিত সম্পর্কিত এবং যুক্তিপূর্ণ ও সহজ ভাষায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা—

নির্বাচিত সমস্যার সমাধান দ্বারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে কিনা এবং উহার প্রয়োজনীয়তা কি তা উল্লেখ করতে হবে। এই বিভাগে গবেষণার সার্থকতা এবং গবেষণার ফলাফল প্রয়োগের উল্লেখ থাকবে। শিক্ষার প্রচলিত রীতিনীতি ও শিক্ষাদান ক্ষেত্রে গবেষণাটির কোন অবদান থাকবে কিনা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

সংজ্ঞা—গবেষণায় ব্যবহৃত বিশেষ কোন শব্দ বা বাক্যাংশ কি অর্থে ব্যবহার করা হল তার সংজ্ঞা এবং প্রয়োজন অনুসারে ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

সীমাবদ্ধতা ও অসুবিধাসমূহ—গবেষণা কার্যে গবেষক যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন সেগুলো এবং কি প্রকারে অসুবিধা বা বাধা দূর করলেন তা লিপিবদ্ধ করতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়—এই অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট বই পুস্তক, গবেষণাকার্য, প্রবন্ধ ইত্যাদির পর্যালোচনা করতে হবে। গবেষণার স্বপক্ষে যুক্তি, মতের মিল, অমিল, ঐক্যতা, অনৈক্যতা ইত্যাদি কোথায় রয়েছে প্রকাশ করতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়—এই অধ্যায়ে গবেষণা পদ্ধতির একটি পূর্ণ-বিবরণী থাকবে। গবেষক তাঁর পূর্ণ কার্য বিবরণী এখানে লিপিবদ্ধ করবেন। এই বিবরণীতে গবেষণা পরিকল্পনা, নমুনা দল গঠন, প্রক্রিয়া, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি, সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণের কলা কৌশল এবং ব্যবহৃত পরিসংখ্যান পদ্ধতির বর্ণনা থাকবে।

চতুর্থ অধ্যায়—এই অধ্যায়ে সংগৃহীত তথ্যাদির উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণ থাকবে। সুষ্ঠু উপস্থাপনার লক্ষ্যে সংগৃহীত তথ্যের প্রয়োজন অনুসারে ছকে বিন্যস্ত করে বিশ্লেষণ করা হবে। প্রাপ্ত ফলাফল,

Dhaka University Institutional Repository

ফলাফলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে কোন সুপারিশ করা ইত্যাদির প্রয়োজন হলে, তা এই অধ্যায়ে উল্লেখ করতে হবে। এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়—কোন কোন গবেষণার একটি পঞ্চম অধ্যায়ের প্রয়োজন হতে পারে। ইহা গবেষণার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। এই অধ্যায়ে ফলাফলের সারাংশ, মন্তব্য, এবং সুপারিশসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে থাকবে।

সূচীপত্র নিম্নরূপ হবে :—

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার পৃষ্ঠা
সারাংশ
তালিকাবলী
অধ্যায়—
প্রথম—গবেষণার বিবরণ

ভূমিকা, সমস্যার বিবরণ, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা, অন্তরায় সমূহ।

দ্বিতীয়—সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও লেখনীর পর্যালোচনা
তৃতীয়—গবেষণার পদ্ধতি ও কার্যবিবরণী
চতুর্থ—তথ্য উপস্থাপন, তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল
পঞ্চম—ফলাফলের সারাংশ, উপসংহার ও সুপারিশ
গ্রন্থপঞ্জী—
পরিশিষ্ট—

গ্রন্থপঞ্জী

অরুণ ঘোষ, মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপ ও পরিসংখ্যান। কলিকাতা: এডুকেশনাল এন্টার প্রাইজার্স, ১৯৮৪।

কাজী মোতাহার হোসেন, তথ্য গণিত। ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৬৯।

প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, মনোবিদ্যা (৬ষ্ঠ সংস্করণ)। কলিকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১৯৬৭।

রওশন আলী, আধুনিক মনোবিজ্ঞান। ঢাকা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৭৯।

রশীদুল আলম, সহজ মনোবিজ্ঞান পরিচয় (দ্বিতীয় সংস্করণ) ঢাকা: দিদার পাবলিশিং হাউস।

Anastasi, Anne, *Psychological Testing (3rd ed)*. New york: The Macmillan Company. 1968.

Best, John. W., *Research in Education (1st and 2nd edition)*. New Jersey: Prentice-Hall, INC., Englewood cliffs. 1959 and 1970.

Bernard, Harold W., *Psychology of Learning and Teaching*, New york: MC Graw Hill Book Company, INC., 1954.

Barzun, Jacques, and Henry F. Graff, *The Modern Researcher*. New york: Har court, Brace & World, Inc., 1962.

Barr, A. C., Robert Davis and Palmer D. Johnson, *Educationnal Research and Appraisal*, Chicago: J. P. Lippincott Col., 1955.

Blommers, Paul, and E. F. Lindquist, *Elementary Statistical Methods in Psychology and Education*, Boston: Houghton Mifflin Company, 1960.

Campbell, William Giles, *Form and Style in Thesis Writing*, Boston: Houghton Mifflin Company, 1969.

Dhaka University Institutional Repository

Cook, David R., and N. Kenneth La Fleur, *A Guide to Educational Research (2nd ed)*. Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1975.

Cook, D. T., and Campbell, D. T., Quasi—*Experimentation, Design and analysis Issues for Field Settings*. R and McNelly, 1979.

Dockrell, W. B., and Hamilton, *Rethinking Educational Research*, London : Hoddles, 1980.

Dewey, John, *How we Thirk*, Boston : Raytheon Education Company, 1933.

Dubois, Philip H., *An Introduction to Psychological Statistics*. New york : Harper & Row, Publishers, 1965.

Evans, K. M., *Planning Small Scale Research, a practical guide for researchers and Students*, Windsor : NF-ER Publishing Company, 1978.

Educational research and Training in Asia and the Pacific, Tokyo : National Institute for Educational Research, Japan, 1981.

Entwistle, N. J. and Bisbet, J. D., *Educational Research in Action*, London : University of London Press, 1972.

Edwards, Allen L, and Katherine C. Kenney, "A Comparison of the Thurstone and Lickart Techniques of Attitude Scale Construction," *Journal of Applied Psychology*, (February. 1946).

Fox, David. J., *The Research Process in Education*, New york : Halt Rinehart and Winston, Inc., 1969.

Garrett, Henry E., *Statistics in Psychology and Education*, New york : Longmans, Green and Co, 1957.

Good, C. V, *Introduction to Educational Research*, New york : Appleton, 1959.

Hannicut, C, W., *Research in Three R's*. New york : Harper, 1958.

Hillway, Tyrus, *Introduction to Research*, Boston : Houghton Mifflin Company, 1964.

Kerlinger, F. N., *Foundations of Behavioral Research (2nd edition)*. London : Rinehart, Winston and Halt, 1979.

Monly, G. J., *The Sciences of Educational Research*, New york : American Book, 1963.

Moroe, W. S., (ed). *Encyclopedia of Educational Research*, New york : The Macmillan Company.

Nisbet, J. D, *Educational Research Methods*, London : University Press, London, 1970.

Ross, C. C., and Stanley, J. *Measurement in To days' School*. Englewood Cliffs. N. J., Prentice Hall, Inc., 1965.

Sax, Gilbert, *Empirical Foundations of Educational Research*. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice—Hall, Inc., 1968.

Turabian, Kate L., *A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations*, Chicago : The University of Chicago Press, 1960.

Travers, Robert M. W, *An Introduction to Educational Research*. New york : The Macmillan Company, 1968.

Wise, J. E., *Methods of Research in Education*. Boston : Heath, 1967.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-ক

গবেষণা পরিকল্পনার একটি নমুনা ঃ—

সমস্যার নাম

শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষণের (Perception) উপর মানসিক প্রস্তুতির প্রভাব।

ভূমিকা

শিক্ষা জাতির ভবিষ্যত উন্নতির চাবিকাঠি এবং দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। শিক্ষাই দেশ ও জাতির অগ্রগতির পথকে সুগম করে জাতীয় আশা-আকাংখা ও ভবিষ্যত সমাজ-জীবনকে সার্থকভাবে প্রতিফলিত ও বিকশিত করে। জ্ঞানের প্রসার সাধন, মানবের সার্বিক উন্নয়ন এবং পরিবেশের সঙ্গে অধিকতর ফলপ্রসূভাবে খাপ খাওয়ানোর জন্য গবেষণার প্রয়োজন। গবেষণা পদ্ধতিকে শিক্ষা ও শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ করে শিক্ষার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমস্যাবলী উদঘাটন করা ও সুষ্ঠুভাবে সমাধানের প্রচেষ্টা করা হয়ে থাকে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষণের উপর মানসিক প্রস্তুতির প্রভাব আছে কিনা তা গবেষণা করে সত্যতা যাচাই করার প্রেক্ষিতে এই গবেষণা পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরীর প্রয়াস। পরিক্ষণমূলক গবেষণা দ্বারা পর্যবেক্ষণ করে এর সত্যতা যাচাই করে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই অভিজ্ঞতা একজন শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে শিক্ষণকে সফল করে তুলতে পারেন।

সমস্যার বর্ণনা

প্রত্যক্ষণ হল ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সামগ্রিক উপলব্ধির ফল। সংবেদনকে কেন্দ্র করে যে অভিজ্ঞতা জন্মায় তাকে প্রত্যক্ষণ বলে। অর্থাৎ আমাদের সম্মুখে বর্তমানে উপস্থিত আছে এমন কোন বস্তু বা প্রাণী বা ঘটনা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা। এর মূলে রয়েছে ইন্দ্রিয় উদ্দীপন জনিত সংবেদন এবং এই সংবেদনের ফলে জন্মে কোন কিছু সম্বন্ধে সাক্ষাৎ প্রতীতি। সহজ ভাবে বাইরের জগতের উত্তেজনা গুলো যে সংবেদনের সৃষ্টি করে তার ব্যাখ্যাকে প্রত্যক্ষণ বলা হয়।

প্রত্যক্ষণ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। প্রত্যক্ষণ যে সকল উপাদানের উপর নির্ভর করে তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল মানসিক প্রস্তুতি।

পূর্ব থেকে যদি কোন মনোভাব গ্রহণ করা যায় এবং তদনুযায়ী যদি প্রত্যক্ষকারী নিজের মনকে প্রস্তুত করে, তাহলে প্রত্যক্ষণের উপর উহার প্রভাব পড়ে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

১. প্রত্যক্ষণে মানসিক প্রস্তুতি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা নির্ধারণ করা।

২. শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষণের উপর মানসিক প্রস্তুতির প্রভাব নির্ণয় করা।

৩. কোন একটি বিষয়ে শিক্ষাদান করার সময় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষার্থীর পূর্ব মানসিক প্রস্তুতি যথাযথ শিক্ষণে সহায়ক কিনা তা অনুসন্ধান করা।

৪. নিয়ন্ত্রিতদল ও পরীক্ষণমূলক দলের উপর প্রত্যক্ষণে মানসিক প্রস্তুতির প্রভাব তুলনামূলক ভাবে আলোচনা করে কোন দলের উপর প্রভাব বেশী তা নিরূপন করা।

সমস্যার তাৎপর্য বা গুরুত্ব

শিক্ষাক্ষেত্রে মানসিক প্রস্তুতির প্রভাব সম্পর্কে সচেতন দৃষ্টিপাত রাখতে হবে। শিক্ষক হিসেবে আমাদের মনে রাখতে হবে শিক্ষণের ক্ষেত্রে মানসিক প্রস্তুতির প্রভাব কতটুকু। এবং কোন একটি বিষয় পড়ানোর সময় দেখতে হবে শিক্ষার্থীর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্বমানসিক প্রস্তুতি যথাযথ শিক্ষণে সহায়ক কিনা। কেননা Teaching Learning Situation-এ শিক্ষণের অন্যান্য শর্তের সঙ্গে মানসিক প্রস্তুতি বিষয়টিও প্রভাবিত করে থাকে।

মানসিক প্রস্তুতির কারণে কোন বিষয় যখন শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরা হয় তখন তারা তাদের মানসিক প্রস্তুতির প্রকৃতি অনুসারে তা প্রত্যক্ষণ বা শিক্ষা লাভ করে থাকে। তাই শিক্ষক হিসেবে কোন বিষয় অসম্পূর্ণ অস্পষ্ট ভাবে উপস্থাপন না করে সুষ্ঠু শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা উপস্থাপন করলে যথাযথ কার্যকরী হবে।

সর্বোপরি বলা যায় শিক্ষণের ক্ষেত্রে মানসিক প্রস্তুতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষাক্ষেত্রে একজন শিক্ষকের ভূমিকা হবে এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান এবং সতর্কতার পদক্ষেপ। শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীদের প্রেষণার দ্বারা পাঠ পূর্বে উন্মুখতা ও মানসিক প্রস্তুতি তৈরী করে নেন তবে পাঠ দান হবে অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

Dhaka University Institutional Repository

অনুমিত সিদ্ধান্ত

১. H_0 (Null or negative)

নিয়ন্ত্রিত দল ও পরীক্ষণ দলের প্রত্যক্ষণে মানসিক প্রস্তুতির প্রভাব থাকবে না।

২. H_1 (Positive or literary)

মানসিক প্রস্তুতির কারণে প্রত্যক্ষণে পরীক্ষণ দল নিয়ন্ত্রিত দলের তুলনায় বেশী প্রভাবিত হবে।

বিশিষ্ট শব্দাবলীর ব্যাখ্যা

প্রত্যক্ষণ ঃ সংবেদন ও প্রতিক্রিয়া এ দুয়ের মধ্যবর্তী একটি মানসিক প্রক্রিয়া।

উদ্দীপন ঃ বিবর্ধন, উত্তেজন বা প্রকাশ করা।

প্রেষণা ঃ মানসিক ভাবে নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি আগ্রহ।

ট্যাকিসটোস্কোপ ঃ মেমোরীড্রাম এই যন্ত্রের দ্বারা শব্দ দেখানো হয়।

প্রত্যাভিজ্ঞা ঃ প্রত্যাভিজ্ঞান পূর্ব পরিচয় সম্বন্ধে চেতনা।

নমুনা নির্বাচন

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরী স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর মোট ৪০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে একটি নমুনা দল গঠন করা হবে।

২. এই দলটি নিবিচারে নির্বাচন পদ্ধতির সাহায্যে চয়ন করা হবে।

৩. নির্বাচিত দলের ৪০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২০ জনকে একটি নিয়ন্ত্রিত দল ও অপর ২০ জনকে নিয়ে একটি পরীক্ষণমূলক দল গঠিত হবে। এই দু'টি দল মোটামুটিভাবে সমকক্ষ বলে ধরে নিতে হবে।

৪. শিক্ষার্থীদের বয়স, বুদ্ধিমত্তা, আর্থসামাজিক অবস্থা, অর্জিত জ্ঞানের মান ইত্যাদি বিষয়ে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ করে সমকক্ষ নমুনা দল দু'টি গঠন করা যেতে পারে।

সীমাবদ্ধতা

শিক্ষণে প্রত্যক্ষণের প্রভাব এই মনোবৈজ্ঞানিক বিষয়ের উপর গবেষণা কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সুক্ষ্ম ও গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং প্রেষণার জন্য পরিবেশ তৈরীর প্রয়োজন সে জ্ঞান ও দক্ষতার সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে।

সময়ের সংক্ষিপ্ততার কারণে কয়েকটি বাছাইকৃত স্কুল থেকে শিক্ষার্থী নিয়ে সমকক্ষ দল গঠন করার পরিবর্তে একই স্কুল অর্থাৎ ইউনিভারসিটি ল্যাবরেটরী স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে স্বাধীন দলীয় নকশায় (Independent Group Design) এবং নিবিচারে নির্বাচন পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের দুটো সমকক্ষ দলে ভাগ করতে হবে।

'শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষণের প্রভাব' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। এ গবেষণার জন্য বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সময়ের প্রয়োজন। সময়ের স্বল্পতা হেতু এই সুক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা স্বল্প ক্ষেত্রে ও স্বল্প সময়ে শেষ করতে হবে। মানুষের মন নিয়ত পরিবর্তনশীল তাই পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণার মত এ গবেষণার ফলাফল সকল সময় এক রকম নাও হতে পারে। তাই বার বার এ পরীক্ষণ কার্য চালানো অপরিহার্য হলেও এখানে তা সম্ভবপর হচ্ছে না।

সংশ্লিষ্ট বই পুস্তকের পর্যালোচনা

'প্রত্যক্ষণের উপর মানসিক প্রস্তুতির প্রভাব'-এ বিষয় নিয়েই এ গবেষণা পরিকল্পনার রূপরেখা। মনোযোগ আকর্ষণের নির্ধারক শর্তসমূহের মধ্যে মানসিক প্রস্তুতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান শর্ত। এ পরীক্ষণেও নির্দিষ্ট পথে চালিত করতে সাহায্য করবে, মানসিক প্রস্তুতি যার ফলাফল পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে।

ডক্টর প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়—মনোবিদ্যায় লিখেছেন—মনকে প্রস্তুত করে যদি কোন প্রত্যক্ষণকারী তাহলে প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রের উপর উহার প্রভাব পড়ে। জ্যোতিবিদ পূর্ব হতে এ ধারণা করে নেন যে, মঙ্গল গ্রহের পরিবেশ পৃথিবীর পরিবেশের অনুরূপ, তা হলে তিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মঙ্গল-গ্রহ প্রত্যক্ষণ করার কালে ঐরূপ সাদৃশ্য যেন অধিক দেখিতে পান। গবেষণা পরিকল্পনারও এভাবে ফল পাওয়া যেতে পারে-মানসিক প্রস্তুতি তৈরী করার পর।

ডঃ মীর কফরুজ্জামান তার ব্যবহারের বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা বইয়ে মানসিক প্রস্তুতির কথা প্রসঙ্গে বলেন—আমরা যে কাজে যতটুকু উন্মুখ সে কাজের প্রতি মনোযোগ তত বেশী। তিনি বলেন বর ভর্তি লোকের গণ্ডগোল থামিয়ে বাইরে থেকে ভেসে আসা রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর একজন

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভক্তের মনোযোগ আকৃষ্ট করবে। কোন শিশু যদি পিতার কাছে লজেন্স প্রত্যাশা করে, অফিস থেকে ফিরে আসার সময় হলে পিতার পদধ্বনি শিশুকে উৎকর্ণ করে তুলবে। এখানেও প্রত্যক্ষণের গুরুত্ব প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে।

রশীদুল আলমের সহজ মনোবিজ্ঞানে রয়েছে প্রত্যক্ষণ সম্বন্ধে—সকালের ট্রেনে বন্ধুর আসবার কথা। প্লাটফর্মে গিয়ে দেখি দূরে যেন আমার বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখি যে সে ব্যক্তি আমার বন্ধু নয়। এখানেও প্রত্যক্ষণের গুরুত্ব ও মানসিক প্রস্তুতির প্রভাব যে পড়েছে তা বোঝা যায়।

নীহার রঞ্জন সরকার রচিত মনোবিজ্ঞান ও জীবন বইয়ে বলেছেন—এক-জন চিকিৎসক ও তার পত্নী রাত্রে নিদ্রিত থাকাকালীন অবস্থায় রোগীর টেলি-ফোন এলে ডাক্তার তা খুব সবজেই শুনতে পায়— কিন্তু পত্নীর তাতে ঘুমের ব্যাঘাত হয় না।

মনোবিজ্ঞানের—বিভিন্ন পরীক্ষণে বিশেষ ভাবে 'প্রত্যক্ষণে মানসিক প্রস্তুতির প্রভাব' এর উপর অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার নমুনা পাওয়া যায়। এ গবেষণা কার্যটি পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত হলে অনুরূপ—ফলাফল আশা করা যেতে পারে।

গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি ও উপকরণ

এ গবেষণাটি 'পরীক্ষণমূলক গবেষণা'র ক্লাস রুম রিসার্চ পদ্ধতিতে করা হবে। মানসিক প্রস্তুতির শিক্ষণক্ষেত্রে এই পরীক্ষণমূলক গবেষণার ক্লাসরুম রিসার্চ প্রয়োগ সম্ভব ও ফলপ্রসূ হবে।

এখানে গবেষণা কার্যের বিষয়ী হিসেবে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নেয়া হবে। এবং এদের বয়স, বুদ্ধিমত্তা, আর্থসামাজিক অবস্থা, অর্জিত জ্ঞানের মান এ সকল বিষয়গুলো সকল দিক দিয়ে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ করে দুইটি সমকক্ষ দল নিয়ে করা হবে।

এদের মধ্যে থাকবে ৪০ জন ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে ২০ জন থাকবে নিয়ন্ত্রিত দলে ও ২০ জনকে নিয়ে হবে পরীক্ষণমূলক দল।

পরীক্ষণমূলক এ গবেষণা কার্যে নিরপেক্ষ চল হিসেবে মানসিক প্রস্তুতি এবং নির্ভরশীল চল হিসাবে শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে বিবেচনা করা হবে।

আলোচ্য গবেষণার পরীক্ষণ পরিকল্পনা নক্‌শা করার জন্য সমস্যার প্রকৃতি অনুসারে স্বাধীন দলীয় নক্‌শা (Indipendent Group Design) ব্যবহার করা হবে।

পরিকল্পনার নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুসারে গবেষণার পরীক্ষণ কার্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে।

সংগৃহীত তথ্যের পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণে তথ্য সমূহ বিন্যাস করা হবে। এবং তা গ্রাফে এঁকে প্রকাশ করা হবে।

যাচাই করণ পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য তথ্যগুলো কোন্ প্রকৃতির এবং তা কোন যাচাইয়ের এর অন্তর্ভুক্ত হবে তা নির্ধারণের জন্য দুটো দলের Variance বের করা হবে। এবং দুটো দলের Variance এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তারতম্য আছে কিনা তা জানার জন্য F-test করা হবে।

দুটো দলের তথ্যগুলো প্রকৃতিগতভাবে যদি Parametric Nature এর হয় তবে Two Group Sample এবং Indipendent Group Design এর জন্য Parametric test এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আর এ ক্ষেত্রে তাই—পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ t-test ই যথার্থ বলে বিবেচিত হবে।

এ গবেষণার পরীক্ষণ কার্যে level of significance ·05 এবং Degree of Freedom 48 ধরা হবে।

গবেষণা কার্যে ব্যবহৃত তথ্য সংগ্রাহক উপকরণ

গবেষণায় পরীক্ষণ কার্য পরিচালনার জন্য এক ধরনের শব্দ তালিকা ব্যবহার করা হবে। এই শব্দ তালিকায় থাকবে ভূগোল সম্পৃক্ত ২০টি শব্দ। এই শব্দগুলির প্রতিটিই বানানে থাকবে সূক্ষ্মতম ভুল।

এছাড়া গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হবে সাদা কাগজ, কলম, স্টপ ওয়াচ, ক্যালকুলেটর, মেমোরী ড্রাম ও প্রশ্নমালা।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সংগ্রহের উৎস

আলোচ্য গবেষণাটি প্রত্যক্ষণের উপর মানসিক প্রস্তুতির প্রভাব। এর তথ্য সংগ্রহের জন্য আই, ই, আর সংলগ্ন ইউনিভারসিটি ল্যাবরেটরী স্কুলে পরীক্ষণ কার্যটি পরিচালনা করে তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

গবেষনায় উল্লেখিত সমস্যার গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং কার্যকারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও পাবলিক লাইব্রেরীর বই পুস্তক ব্যবহার করা যেতে পারে।

সময়-সূচী, বাজেট ও গ্রন্থপঞ্জী

এই গবেষণা পরিকল্পনায় উল্লেখিত বিষয়াদি ছাড়াও প্রারম্ভে একটি সূচীপত্র থাকবে এবং এর পরে প্রয়োজন বোধে কৃতজ্ঞতা স্বীকার দেওয়া যেতে পারে। পরিকল্পনাটি শেষ করার পূর্বে সময় সূচী, বাজেট ও গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া আবশ্যক।

পরিশিষ্ট-খ

বর্ণনামূলক গবেষণার প্রশ্নপত্রের একটি নমুনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীজীবিদের সন্তান-সন্ততির বিদ্যালয়ে লেখা পড়ার সুযোগ ও চাহিদা সম্পর্কে প্রশ্নমালা

(বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা বেতন গ্রহন করে থাকেন কেবলমাত্র তাঁদের বেলায় প্রযোজ্য)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীরত ব্যক্তিদের সন্তান সন্ততির লেখাপড়ার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সুযোগ সুবিধা নিরূপণের উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরী স্কুল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা কতখানি মেটাতে সক্ষম তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়েছে। আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

১। আপনার নাম (ঐচ্ছিক) _____

২। পদবী _____

৩। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি কতদিন যাবৎ চাকুরীতে আছেন বছর মাস

৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের বাড়ীতে থাকেন কি ? _____

৫। ক্যাম্পাসের বাইরে থাকলে ঠিক কত দূরে থাকেন ? _____

৬। (ক) আপনার পরিবারের ছেলে-মেয়ের সংখ্যা কত ? _____

(খ) সকল ছেলে-মেয়েদের সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিবরণ দিন।

সন্তান সংখ্যা	ছেলে-মেয়ে	বয়স	কোন শ্রেণীতে পড়ে	যে স্কুলে পড়ে তার নাম
১ম সন্তান				
২য় ,,				
৩য় ,,				
৪র্থ ,,				
৫ম ,,				
৬ষ্ঠ ,,				

অন্য স্কুলে পড়লে কেন পড়ছে ? _____

বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরী স্কুলে পুনরায় আনতে ইচ্ছুক কিনা ? _____

(গ) আপনার সন্তান ছাড়া আপনার উপর নির্ভরশীল ছেলেমেয়ের সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিবরণ দিন।

ছেলে-মেয়ে	বয়স	কোন শ্রেণীতে পড়ে	যে স্কুলে পড়ে তার নাম	আপনার সাথে সম্পর্ক

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) জানুয়ারী ১৯৮৭ঃ আপনার কোন ছেলে বা মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরী স্কুলে ভর্তি করতে ইচ্ছুক ছিলেন কিনা ?
—ইচ্ছুক থাকলে নীচের ঘরগুলি পূরণ করুন।

সন্তান সংখ্যা	কোন ক্লাশে	ভর্তি হয়েছিল কিনা
১ম সন্তান		
২য় ,,		
৩য় ,,		
৪র্থ ,,		

৭। আপনার সন্তানকে কেন বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরী স্কুলে পড়াতে ইচ্ছুক ?
(নীচের কারণগুলির যেগুলি আপনার বিবেচনাধীন সেগুলি দাগ দিন)

১। শিক্ষার মান উচ্চ।

২। লেখাপড়ার খরচ কম।

৩। যাতায়াত সুবিধা।

৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান।

৫। অন্যান্য : (উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়া আপনি যদি আরও কিছু ভেবে থাকেন লিখুন)।

ক.

খ.

গ.

এই প্রশ্নমালার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য অন্য কোন কাজে ব্যবহৃত হবে না। ব্যক্তিগত ভাবে তথ্যাবলীর গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে :

DHAKA METROPOLITAN TRAINING COLLEGE DATE.....

গবেষণা-পরিকল্পনা ফ্লো চার্ট

বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপন

সংকেতঃ

১

২

৩

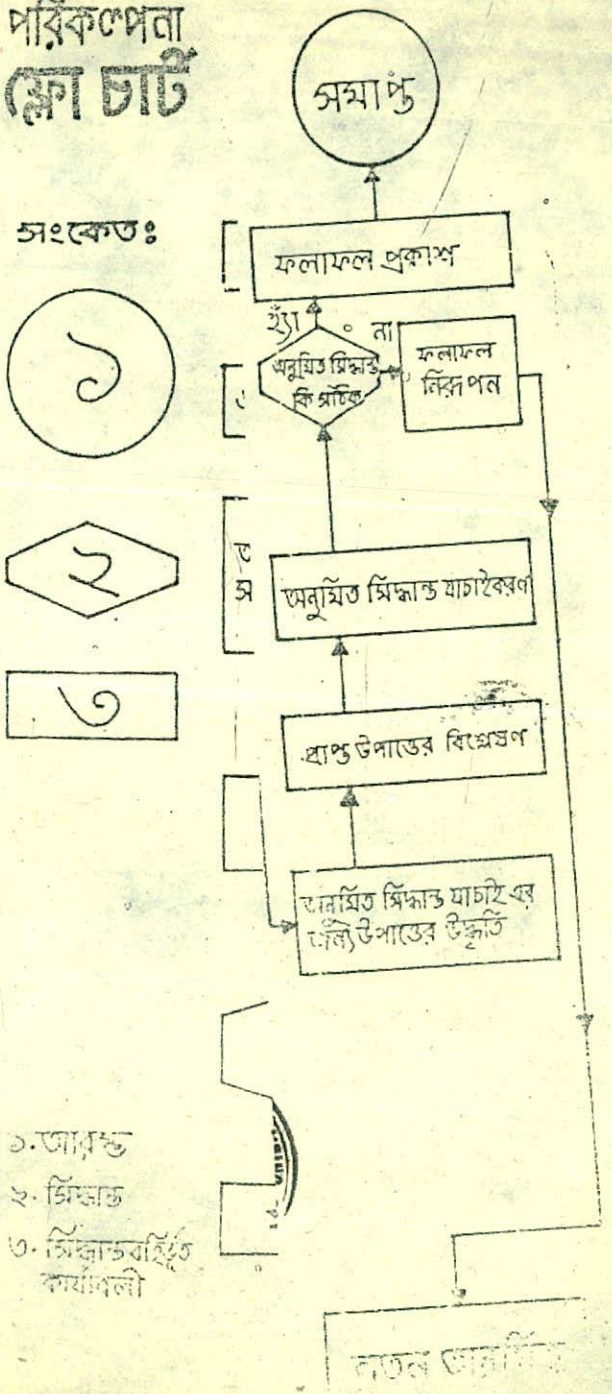

Dhaka University Institutional Repository

য়েকে বিশ্ববিদ্যা-
ছিলেন কিনা ?
য়েছিল কিনা
পড়াতে ইচ্ছুক ?
লি দাগ দিন)
াপনি যদি আরও
াজে ব্যবহৃত হবে
দ্ধতি ও কৌশল